

ତତ୍ତ୍ୱ-ଜିଜ୍ଞାସା ।

✻ ✻

ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୃଷ୍ଣଧନ ।

বাণী ধ্যান

শ্রীমদ্রবিশ্বনাথ শাস্ত্রী

শ্রী ১০৮ বাণীময় বাহ্য-ভাব্য কামোদয় কবিতাময়।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।



স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়,

এম, এ, বি, এল, প্রণীত ।

সম্পাদক

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত ।

লোটার লাইব্রেরী,

৮৮ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ।

প্রথম সংস্করণ ।

১ ৮ ১ ৮

সন ১৩১২ সাল ।

[মূল্য ১/ এক টাকা মাত্র ।



স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ।

সূচীপত্র ।



প্রথম ভাগ ।

| বিষয় । | পত্রাঙ্ক । |
|----------------------------------|-------------|
| ঐশ্বর্য-ভব-সদ্ব্যবহার হইতে বর্ণা | ১ |
| ঐশ্বর্য-সাপাসনা | ৪ |
| সাক্ষ্য ও নিশাক্ষ্য | ২, ১৪ |
| মহাব্যাসের চন্দ্র আদর্শ | ২৫ |
| ঐশ্বর্যের স্বরূপ কি ? | ৩২, ৪৮, ৫০, |
| সাক্ষ্য নিশাক্ষ্য উপাসনা | ৫২ |
| ঐশ্বর্যসাপাসনা ২য় | ৭৮ |
| ঐশ্বর্য প্রীতি | ৮২ |
| ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য . | ৯০ |
| নিষ্কাম কর্ম | ১০৬ |
| ভব-মসি . | ১০১ |
| একমেবাদ্বিতীয়ত | ১১৬ |
| ঐ দ্বিতীয় প্রসঙ্গ .. | ১৪৮ |

দ্বিতীয় ভাগ :

—*0*—

| বিষয় । | পত্রাংক । |
|--|-----------|
| বেদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কথা | ১৫০ |
| ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি | ১৬৪ |
| একটী প্রবন্ধ | ১৭৬ |
| সোণার পাখী | ১৮১ |
| নিরামিষ ভোজন | ১৮৪ |
| নিরামিষ ভোজন (প্রতিবাদের উত্তর) । } | ১৯৫ |
| আমাব মালা গাঁথা | ২০৮ |
| সংসার চক্র | ২২০ |
| প্রশ্ন ও উত্তর | ২২৪ |
| পঞ্চভূত | ২২৬ |
| আর আধখানা কোথায় ? | ২৩০ |
| ভালবাসা | ২৪৭ |
| সতীভেজ | ২৫২ |

ভূমিকা ।

—:•:—

সুভদ্রাব কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন স্বর্গে । সাময়িক পত্রিকার পুণ্যতন সংস্কার মধ্যে তাঁহার যে বহুদূলা প্রবন্ধাবলি বিপর্যস্ত ভাবে লুপ্তাভূত ছিল তাঁহার পুত্রদ্বিগেব যত্নে এই গ্রন্থে তাহার একাংশ সংকলিত হইল । অপবাংশ 'তত্ত্ব-সীমাংসা' নামক গ্রন্থান্তরে লীভ্রত সংকলিত হইবে ।

অযোধ্যা হটবাও আর্মি এত গণ্ডে ভূমিকা লিখিব। বন্ধুক্রুতা সম্পাদন কার্যেছি । এই আকক্ষন কার্যে বন্ধুনাবব জমব আস্থ্যাব ভূপণ হউক ।

বাল্মীকীর ধর্ম-সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হটলও কৃষ্ণধন বাবু সহিত সাধাবণ বাল্মীকী পাঠকেব তাদশ খনিষ্টে পরিচয় নাট । অথচ কিশোব বয়স হইতে তিনি বঙ্গবালীব সেবা কবিধাচ্ছন ।

কৃষ্ণধন বাবু বালীর প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশ সত্ত্বত । তিনি অল্প বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া বৃত্তি লাভ করেন, পবে উত্তরপাড়া উংবাজী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর জলপানি পান । তার পব কিছুদিন হর্গল কলেজে অধ্যয়ন কবিয়া কলিকাতার প্রেসীডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং

ঐ স্থান হইতে ঠং ১৮৮০ সালে গণিতেব এম এ পৰীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কবিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরে ১৮৮২ সালে বি, এল পরীক্ষা দিয়া কিছু দিন ওকালতীব পৰ মুন্সেফী গ্রহণ করেন এবং কয়েক স্থানে দক্কতাব সহিত ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া ঠং ১৯০৭ সালে সবজজ পদে উন্নীত হন। তখন তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স। ঐহাব কয়েক মাসেব মধ্যে ঠং ১৯০৮ সালে তাঁহার দেহান্ত হয়। তখন তিনি দাবনজে সবজজরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কবাল প্রেগ এদাশর অনেক রত্ন অপহরণ কবিয়াছে কিন্তু সেই সকল বস্তুর মধ্যে রক্ষণন বাবুই বোপ হয় অত্যাচ্ছল।

যতদূর জ্ঞানিাত পানিযাছি রক্ষণন বাবুব প্রথম বচিত প্রবন্ধ ১২৮৪ সালেব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, প্রবন্ধেব নাম ‘আমাব মালা গাঁথা’। এই গ্রন্থে দ্বিতীয় ভাগেব সপ্তম পৰিচ্ছেদে উহা সম্বলিত হইযাছে। তখন রক্ষণন বাবুব বয়স্ক্রম প্রায় তুড়ি বৎসব। ঐহাব কিছুপূর্বে তিনি বঙ্কিম বাবুব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েব কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ১২৮৪ সালে বাঙ্গালা দেশে বঙ্গদর্শনের পূর্ণ প্রভাব। বঙ্কিম বাবু ‘আমাব মালা গাঁথা’ প্রবন্ধকে বঙ্গদর্শনে সাদবে স্থান দান করেন এবং নবীন লেখকেব রচনার বহু প্রশংসা কবিয়া বলেন যে ইনি কালে বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হইবেন। ঐহাব ভবিষ্যৎ বাণী সন্দল হইযাছে।

১২৯২ সালে বঙ্কিম বাবু “প্রচার” প্রকাশ করিতে আরম্ভ

କରେନ । ତখন ବାଙ୍ଗଳାର ଶାନ୍ତି ସମାଜେ ଧର୍ମର ବାତାସ ପରିବାସିତ ହଇয়াছে, ଇଂରାଜୀ-ନବୀନ ନାସ୍ତିକତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଚାର ଛାଡ଼ିଯା ଧର୍ମର ନିକେ ସନ ନିକେ ଆବସ୍ତ କରାଯାଛେନ ଏବଂ ଜନ ମିଳ ଓ ଅଗଷ୍ଟ କୋମତେବ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଯା ବ୍ୟାସ ବାସାକ୍ତବ ଅବେଷଣ କରାଯାଛେନ । ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବାଞ୍ଛ୍ୟ ବାବୁ 'ପ୍ରଚାର' ପ୍ରଚାରିତ କରାଯାଆନ୍ତେ ଆବସ୍ତ କରେନ । ଆମରା ତখন କାଳରେ ଛାତ୍ର, ଯା ଏ କ୍ରାମେ ପାଠି, ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ବାଳିକା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଶକ୍ତି ଦାଏ, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେବ ଏଡ଼ାଉଁ କାଳ ବିଷ୍ଣୁ 'ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ'ର ବିବାଟ ଏକାଳ ତାବ ଜନସମ୍ମତ ବାବୁରେ ପାରି ନା, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେବ ଏକତ୍ର କଥା ପ୍ରଚାରକା ହେବ କରାଯାଆନ୍ତେ ନା । ଏ ଅବସ୍ଥା 'ପ୍ରଚାର' ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତେ ଆବସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ । ପ୍ରଚାରେ ବାଞ୍ଛ୍ୟ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଲିଖିତନ । ଏ ସମୟ ଠାହାଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ସକଳ ପାଠ କରାଯା ଆମରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦିଗଟି ବିଶାଳତାବ କତକଟ, ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଆନ୍ତେ ପା ରାମ । ବାଞ୍ଛ୍ୟ ବାବୁର ମାତ୍ର ତখন ଓ ଡାକ୍ତର ପାବନ ହବ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଠାହା ନା ହୁଅନ୍ତେ ଛାତ୍ର ଜୀବନେବ ମତ ମତ ଏହିକେ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ । ଏ ସମୟ ବାଞ୍ଛ୍ୟ ବାବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଓ ଶିନ୍ଦୁ ଆଚାରେବ ମତା ଧାରଣ କରାଯା ଭାବତାହେବ କରେବିଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖିବାଛାନ୍ତେନ । ଏ ସକଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ୧୦୦ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ଆବ ଏକଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ।

ପ୍ରଚାର ବାଞ୍ଛ୍ୟ ବାବୁର ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପାଠ କରାଯା ଏବଂ ମତେ ମତେ ଠାହାବ ମାତ୍ର ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତେ ମାତ୍ର ୧୯୦୩, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ । ମତେ ୧୯୦୨ ବା ୧୯୦୩ ମାତ୍ର

ঐহাব সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন আমিও বৎ কিকিং বঙ্গ-সাহিত্যেব সেবা করিতে আবস্থ করিযাছি। রক্ষণ বাবুর সেট সৌম্য শাস্ত্রমূর্ত্তি এখনও আমাব চক্ষেব সম্মুখে ভাসিতেছে। তিনি বড়ই মিষ্টালাপী ছিলেন অথচ মতভাবী। পবিচয়ে দোখলাম সাস্থিক প্রকৃতির লোক -জগতের সংঘর্ষেব উপযোগী কঠোবতা ঐহাতে নাট, নিজ্ঞনে শাস্ত্রামূলীলন ও সম্মচচার ভক্তট ত্তান গঠিত।

পবে ঐহাব সহিত মনো মনো সাক্ষাৎ হকত এবং আমবা উভয়েই ঐওসকিষ্ট সত্যাব অস্তবঙ্গ সত্য বালযা পবম্পনেব মনো সৌহাদ্য ও ভাবুভাব বন্ধমূল হয়। অকালে রক্ষণ বাবু স্বর্গে চলিবা গিযাছেন, আমি এখনও সংসার তবাক্ষব অভিযাক সহিতেছি।

১৩০৪ সালে আমবা খিওসাক্যাল সোসাইটি হটাত পরা নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার কাবতে আনস্ত কাঁব। রক্ষণ বাবু পত্ৰাব কর্ণবাং ছিলেন, আমি ঐহাব মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় ছাদশ বৎসর ঐহাব সহযোগী ছলাম। পত্ৰাব রক্ষণ বাবু নিযামত ভাবে লিখাতন এবং ঐহাব বচনা সম্মপিপাসুর বিশেষ আদবণীর ছিল। ঐ সকল প্রবন্ধে রক্ষণ বাবুঃ পাববত শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও পবিপক্ক আস্তিক্য বুদ্ধি সমাক্ প্রকাশিত হকত। বড়ট খোভের বিষয় যে ঐহাব জীবন-রাবি অপবাহেব পূক্ষেই পশ্চিম গগনে অন্তমিত হকল। বিধাতাব কি উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে রক্ষণ বাবুর বক্তব্য শেষ হয়

নাই, তাঁহার জ্ঞান ভাণ্ডারে যে ভবরাজি সংগৃহীত হইয়াছিল তিনি তাহার অর্ধেক ও বিলাইবার অবকাশ পান নাই।

কৃষ্ণধন বাবু নিজস্ব সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি শুধু মুখস্থ নহেন, কার্য্যতঃ কর্ম্মফল স্ত্রীরূপে অর্পণ করিতেন। যশোলিপ্সার জন্ত নহে, আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত নহে, গ্লব ববের জন্ত নহে, কেবল বঙ্গবানীর সেবাব জন্ত তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইংবাজী-শিক্ষিত দেশবাসীকে কিরূপে সেই সঙ্কল্পের মহিমা অণুপ্রাণিত করিবেন তাহ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ছিল। সেজন্ত অতি ভ্রমোদ্ধা তব সকলও তাঁহার ব্যান দৃষ্টির নিকট পরিষ্কৃত হইত এবং অতি সবল ও প্রাজ্ঞল ভাষায় ও ভাঙ্গতে তিনি তাহা পাঠককে বুঝাইতে পারিতেন। এ অন্তর্দৃষ্টি কেবল শাস্ত্রাব্যবনের ফল নহে, তিনি শাস্ত্র শুধু অধ্যয়ন করতেন না, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতেন। আমার মনে আছে, একবার আমায় বলিয়াছিলেন যে বিগত চাবি বৎসর ধাবয়া তিনি কেবল গীতা ও সাংখ্য সূত্র চিন্তা করিতেছিলেন। একরূপ ত্রৈকান্তিকের কাছে বিন্যা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। সেজন্ত দেখা যায় কৃষ্ণধন বাবুর রচনায় একটি আত্মবিকতা, একটি অমোঘতা ছিল বাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

বড়ই আনন্দের বিষয়, তাঁহার মহাশয় প্রবন্ধাবলি সাময়িক

পত্রিকার অতল গর্ভে নিষ্পজ্জিত না থাকিয়া, এতদিনে লোক লোচনের
 মোচর হইল। আমার আশা আছে এই গ্রন্থ সাধারণের আদৃত
 হইবে এবং বাঙ্গালি পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ধর্ম-
 সাহিত্যের বোধোচিত স্থানে বৃক্ষধন বাবুকে প্রাতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

—

মুখবন্ধ ।

—:~:—

পরিজ্ঞাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্ম্য সংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

গীতা ।

আমরা এই শ্লোক হইতে দেখিতে পাই, যে ভগবান্ ধর্ম সংবন্ধনের জন্ত, সাধুগণের পাবিত্র্যের জন্য ও অসাধুগণকে বিনাশার্থে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন । উক্ত শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে এই বলিতেছেন যে, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই আমি শব্দে তিনি তাঁহার নিজতাব প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার এই ‘আমি’ কথা বড়ই বড় কথা, এটি ক্ষুদ্র তাব নহে তাঁহাও ‘আমি’ সর্ব্বকণী ‘আমি’ বিশ্বব্যাপী কারণ তিনি বালিয়াছেন :-

“সকস্ম চাহম হৃদি সন্নিবিষ্টো ।” গীতা ।

তবে আমরা তাঁহাকে সন্মুখভেই দেখিতে পাই । যে স্থলেই মহত্ব দৃষ্ট হয় সেই স্থলেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে । জীব যখন দেহ কোষাদি অতীত হইয়া আমার ক্ষুদ্র আমিহঁটি বা ব্যক্তিত্বটি (Personality) ভুলিয়া যায়, তখন সে সুদৃষ্টে থাকিয়া মহত্ব লাভ করিয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র ‘আমি’ কে ভুলিয়া মহত্ব মিলন করাটী মহাত্মার লক্ষ্য ।

মহাত্মাগণের ‘আমি’ সর্বময় এই জ্ঞানই তাঁহাদের চিরসিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁহাদের সর্বজীবেরই সমভাব পরিলক্ষিত হয় ও নিজেদের সর্বময় (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চভৌতিক স্থূল সূক্ষ্মাদি) ঐতিগবদচরণে ক্ষুদ্র ‘আমি’রূপে সমর্পণ করিয়া জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে “নিয়ন্তং কুরুকশ্ম ত্বং।” কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু—

“না কলেবু কদাচন।” গীতা।

কর্ম্মফলের প্রত্যাশা করিও না। একথা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সার কথা বুঝাইয়াছেন কাবণ এতদপ কর্ম্মই জীবের পক্ষে মঙ্গল। এই রূপ সার্বিক পুরুষ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, সেই কর্ম্মই নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা হয়, এইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তা নিজেকে কৃতকর্ম্মেব কর্ত্তা জ্ঞান করেন না সমস্তই ভগবদচরণে সমর্পণ করেন তজ্জন্য কর্ম্মফলেব দায়ী হন না।

মহাত্মগণ বুঝেন যে তাঁহারা জগতে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন যাত্রা, তজ্জন্য তাঁহারা কর্ম্মফল প্রত্যাশা না হইয়া, অহংজ্ঞান দূরীভূত করিয়া নিজের সমস্ত ভুলিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, নিজের পদা না ভুলিলে সমস্ত লাভ হয় না। সত্য শব্দে বহু, এই বহুভাবে তাঁহার অস্তিত্ব, তবেই তিনি মহাত্মা। তাঁহার কর্ম্মশক্তিও বহু, সর্বজনপ্রিয় এবং হিতকর। এক কথায় মঙ্গলময়ের নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, জীবকে উন্নতির পন্থায় আনয়ন করে। যে রূপ শঙ্করাচার্য্য,

বুদ্ধদেব ইত্যাদি মহাস্বাগণ ইহসংসারে না থাকিলেও সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব এই জগতেই ক্ৰিয়মান রহিয়াছে। তাঁহাদের সংকল্পানুষ্ঠান ও সহপদেশ এখনও লোকের সম্মুখে পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। মহাপুরুষগণের তিরোভাব হইলেও আমরা তাঁহাদের স্মৃতি প্রাপ্ত হইতে দেখিতে পাইতেছি, যে তাঁহারা সৰ্ব্বতোভাবে আমাদের নিকট বিদ্যমান—তাঁহাদের কীৰ্ত্তি কলাপাদি সারোপদেশ গ্রন্থ সমূহ অব্যবভাবে আমাদের নিকট সহাস্য উপদেশ দিতেছে।

এই সকল শাস্ত্রোপদেশ আমাদের মোহপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অসার মন বুদ্ধি গুলি পারমার্জিত করিয়া দিয়া মোহাবদূষিত করিয়া দেয়, তখন জ্ঞান চক্রে ক্ষুদ্রটি মহে পাবণত হয় তখন মোহান্ধকার কোথায় ঘুচিয়া যায়? এমোহতাব বুচানই সাবোপদেশ। যদি কেহ বলেন যে কণিক - কল্প এই কণিক হইলেও নিবৃত্ত অভ্যাস দ্বারা কণিককে কৰ্মফলানুবাধী দীর্ঘস্থায়ী কিম্বা চিবস্থায়ী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। অতএব এইরূপে আমরা মহাস্বাগণের শাস্ত্রোপদেশানুবাধী নিষ্কামকৰ্ম অভ্যাস করিয়া শ্রীগুরুচরণে কৰ্ম ফল গুলি সমর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। ৩।

এইরূপে কৰ্মফল সমর্পণ কারণে আমরা পবনাদ্বারা পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল, মহাপ্রসাদে দেখিয়াছি। যিনি পুস্তক সম্পাদক থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ সম্পাদকীয় উক্তিসকল ও প্রবন্ধ গুলির সৰ্ব্বকৰ্মফল

শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। সেই
 ত্যাগী মহাত্মার প্রণীত কতকগুলি প্রবন্ধ বিবিধ মাসিক পত্রিকা যথা
 বঙ্গদর্শন, প্রচার, ভারতী, পূর্ণিমা প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া
 শ্রীভগবৎ কৃষ্ণায় অঙ্ক এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থখানি গ্রন্থাকারে সম্পা-
 দন করিতে সমর্থ হইলাম। সুপণ্ডিত শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃ সুহৃদ ‘পদ্মাব’
 কৃতপূর্ব সম্পাদক, ব্রহ্মবিজ্ঞা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ
 গ্রন্থকাব শ্রীযুক্তবাবু হীবেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, (বেদান্তবদ্ব),
 এটনি মহাশয় এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিবার ভারগ্রহণ করিয়া ও
 কার্য্যতঃ সুসম্পন্ন করিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং স্বর্গীয়
 পিতৃদেব মহাশয়ের প্রতি বিশেষ অনুকূল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,
 তজ্জন্ত হীরেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট রুতজ্জতা প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে
 জানাইতেছি যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অধিকতর সফল হউক এবং
 তিনি স্বর্গীয় মহাত্মা সুযোগ্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের শুভানীর্কাদ লাভ
 করুন। বঙ্গের শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় বমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ট,
 মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্র মাসিক প্রকাশিত উপনিষদ গ্রন্থাদির সম্পাদক
 এবং লোটন্স লাইব্রেরীর সহাধিকারী সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু অনিল চন্দ্র
 দত্ত ভাইজিউ এই গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে

বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন, অতএব তাঁহাব কল্যাণ প্রার্থনা করি।
 আশা করি এই গ্রন্থখানি সৰ্বজনপ্রিয় ও সৰ্ব্বপোকারী হইবে এবং
 আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীচাক্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

প্রকাশকের নিবেদন ।

—:—

সবিনয় নিবেদন,

সর্বজন বিদিত সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিক লেখকের এই
তত্ত্ব-নিষ্কাশা নামক গ্রন্থখানি আমি প্রকাশ করিতেছি। সেই সর্বজন
প্রিয় ও হিতৈষী মহাত্মা পরম শ্রদ্ধাম্পদ আমাদের স্বর্গীয় কলকধন বাবু
“আমাদের বড়ই সুপরিচিত।” তদীয় সুপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধ গুলি বঙ্গের
বন্ধিমুপের বিবিধ মাসিক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া পরম বহু
সাহিত্যসেবী পন্থার প্রসিদ্ধ লেখক গ্রন্থকারস্য সুবোধ্য পুত্র শ্রদ্ধাম্পদ
শ্রীবৃদ্ধ বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আতিশয় পরিশ্রম ও
বহু সহকারে এই গ্রন্থখানি সুসম্পাদন করিলেন। কৃতবিদ্য স্মৃতি
চারুবাবু তদীয় পিতৃদেব মহাশয়ের প্রবন্ধ গুলি সংগ্রহ করিয়া
সুরক্ষিত ভাবে একত্রে সম্বদ্ধিত পূর্বক সর্ব সমক্ষে আনয়ন করতঃ
সাধারণের বিশেষ উপকার করিলেন, বলা বাহুল্য তাঁহার অধিকতর
সাহায্য না পাইলে আমরা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম
না। তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই। আশা করি গ্রন্থকারের
অন্যান্য রচনা গুলি “তত্ত্ব-নিষ্কাশা” নামক গ্রন্থকারে প্রকাশ করিতে
সমর্থ হইব। অধিকন্তু সুপণ্ডিত হীৰেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ, বি
এল, (বেদান্ত-রত্ন) মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া

বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছেন। অতএব তাহাকেও সম্পূর্ণ
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সাধারণের নিকট প্রার্থনা যে এই
অমূল্য-রত্ন গৃহে গৃহে রাখিয়া শাস্তি সুখ উপভোগ করুন। তবেই
আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

বিনয়ান্বিত :—

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সাল। }
কলিকাতা। }

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।
লোটস লাইব্রেরী।

ତତ୍ତ୍ୱ-ଜିଜ୍ଞାସା ।



ପ୍ରଥମ ଭାଗ ।



তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ।



প্রথম ভাগ ।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দুটি কথা ।

প্রচারের কোন এক জন পাঠক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকত
এক জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। চিন্তাশীল লোক ঈশ্বর তত্ত্ব
সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিবেন ততই নানাকণ দুঃস্বপ্ন এক্স সকল তাঁহার
মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া থাকে। আমরা পরস্পর পরস্পরের
সাহায্যে সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব
ইহাই আমাদের কর্তব্য কর্ম। আপাততঃ পাঠক মহাশয় বে দুইটি
এক্স সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিব।

১ম। এই জগৎ যদি জগদীশ্বরের দেহ হয় তবে ঈশ্বরে লীন
হইবার জন্য এত চেষ্টা কেন। বোক বোক বলিয়াই বা চীৎকার
কেন? আমরা সকলেই ত তাঁহার শরীরে আছি।

উত্তর। ঈশ্বরের লীন হওয়া কথটির অর্থ স্পষ্ট জ্ঞানদান করিতে
পারিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া পড়ে।

যেমন একটি পত্র একটি বৃক্ষের সহিত অতিশয় তাবে সংযুক্ত
হইয়া থাকে আমিও সেইরূপ সত্যি ঈশ্বরের সংযুক্ত রহিয়াছি অথচ
আমি বোক পদ পাই নাই ঈশ্বরের লীন হইতে পারি না, এই
দুইটি কথা আপাততঃ বিরুদ্ধ তাব লক্ষিত হয়। এই দুইটি

কথার যদি একটি সত্য হয় তবে অল্পটি মিথ্যা । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পূর্ণ জ্ঞানীগণ বাহ্যিক অধ্যাত্মিক রহস্য ভেদ করিয়া যোক্ষ পদ পাইয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটি কথাই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন ।

যেমন এক ঘাসের ছেলে, জানে না যে সে মনুষ্য, কিন্তু তথাপি সে যে মনুষ্য এবিষয়ে কোন সংশয় নাই সেইরূপ আমি ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত বটে কিন্তু হৃৎকের বিবর এই যে এই সত্যটি আমি জন্মমন্ডয় করিতে পারি না । জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যিনি আপনাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সহিত অতিরিক্ত বৃত্তিতে পারিবাছেন তাঁহাকেই মুক্ত বা ঈশ্বরের লীন পুরুষ বলা যায় । হিন্দু শাস্ত্রে এই জ্ঞানকে আত্ম জ্ঞান বলে । আমরা এক্ষণে মুখে বলিতে পারি যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত কিন্তু যতক্ষণ এই সত্য অস্তরে ধারণা করিতে না পারি তত দিন ঈশ্বরে লীন হইতে পাবিব না । ঈশ্বরও আমি যে অতিরিক্ত এই জ্ঞানের অভাব স্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার প্রত্যন্ত নাশ হওয়ারকেই শাস্ত্রকাবগণ ঈশ্বরে লীন হওয়া বলিয়া থাকেন । ঈশ্বর তবু বিবরক জ্ঞানের সহিত আমার আমি জ্ঞান একান্ত সংযুক্ত করিতে পারিলেই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব ।

আমার স্থূলদেহ এই বিশ্বের স্থূল দেহের সহিত স্থূল প্রাকৃতিক শক্তি হুত্রে একান্ত সংযুক্ত, আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের সহিত আমার মন বিশ্বের মনের সহিত, সূক্ষ্মতর শক্তিহুত্রে গাঁথা রহিয়াছে । যে চৈতন্যের বশে বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে সেই চৈতন্যের বশেই আমি চৈতন্য ; যে যে পদার্থ লইয়া আমি গঠিত সে সকলই ঈশ্বরের, আমার কিছুই নহে, কেবল একটি জিনিস আমার আছে, সেইটি কেবল ঈশ্বরে সংযুক্ত নহে সেইটি আমার অহংকার । আমি জানি যে আমি আর

বিশ্ব এই দুইটি পৃথক জিনিস । এই জ্ঞানটিই অহংকার । যখন এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে না যখন আমার অহংজ্ঞান ঈশ্বরে সন্নিবেশ করিতে পারিব তখনই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব ।

ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির এইরূপ অর্থ বুঝিতে পারিলে, আমি ঈশ্বরে সংযুক্ত অবস্থ লীন নহি এ কথাটিতে আর গোলমাল চৈকিবে না ।

প্র । আমরা যদি সেই পরম পুরুষের অংশ তবে আর আমরা আমাদের কর্মের ফলাফল ভোগ করি কেন ? আমরা বাহ্য করিতেছি তাহাত পরমাত্মা করিতেছেন ।

উ । অহংকার । যে সকল কর্ম আমি করিবা থাকি, বাস্তবিক সেই সমুদয় কর্ম আমার কৃত নহে । প্রকৃতির গুণের বশে সমস্ত কার্য্য হইতেছে কিন্তু সেই সকল কর্মে আমার আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকাতেই আমি কর্মের ফল ভোগ করিবা থাকি । আমি ভাত খাই ইহাও প্রকৃতির কার্য্য আমি ছেণেকে ভালবাসি ইহাও প্রকৃতির কার্য্য কিন্তু আমি এই সকল বিষয়ে আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করি—এই অভিমান টুকু আমার । এই অভিমান টুকুর জন্যই আমাদের কর্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় ।

প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্জনঃ ।

অহংকার বিশ্বচাত্ম্য কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ।

ভগবদ্গীতা ।

বাহ্যর এই অহংকার নষ্ট হইবাছে তাঁহাকে কর্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় না সমগ্র বিশ্বের সহিত আমি অভিন্ন এই জ্ঞান না জন্মিলে অহংকার অংশ হয় না ।

আমার অহংকার আমার নিজের। আমার অহংজ্ঞান সংকীর্ণ করা বা বিস্তীর্ণ করা আমার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা বহু ও অব্যবসায় সহকারে আমি আমার অহংজ্ঞান সমগ্র বিশ্বে বিস্তীর্ণ করিতে পারি। যিনি এইরূপে সমগ্র বিশ্বে আপনাকে এবং আপনাতে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পান তিনিই মুক্ত পুরুষ, তিনি ঈশ্বরে লীন পুরুষ, এবং তিনিই সত্ত্ব ঈশ্বর।

ঈশ্বরোপাসনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সাকার ও নিরাকার)।

অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের উপাসনার কোন প্রয়োজন বিবেচনা করেন না। এই প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্ত লিখিতেছি না। ধীহারা ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য জ্ঞান করেন এবং হিন্দু ধর্মের সম্ভ্রম্য বিবেচনায় মতামতাদায়ী উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনা পদ্ধতিকে প্রশস্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে এবং কি উপাসনা-পদ্ধতি কোন্ স্থলে প্রশস্ত, তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা যাউক, বাস্তবিক ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে? আন্তরিকতায় সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর জগতের মূল কারণ এবং সেই কারণ এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু এই বিশ্বাস থাকিলেই

যে, ঐশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলা যায় তাহা নহে । কিন্তু ঐশ্বর দয়াময় সর্বশক্তিমান অচিহ্ন্য অব্যক্ত ইত্যাদি বলিতে পারিলেই যে ঐশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিতে হইবে তাহা নহে । সেকপীরর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন । তাঁহার কাব্যের সহিত অন্ত কাহারও কাব্যের তুলনা হয় না । ইহা জানিলেই কবি সেকপীরর সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ইহা বলা সঙ্গত হয় না । তবে যিনি সেকপীররের কাব্য সমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহার রসগ্রাহী হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, কবির বিষয়ে সেকপীরর সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে । আবার তিনি যদি সেকপীররের বাসস্থান, চরিত্র আদি বিষয়ে অনু-সন্ধান করিয়া থাকেন, তবে চরিত্রাদি বিষয়ে সেকপীরর সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে বলা যায় । ঐশ্বর জগৎ-রচয়িতা বলিলেই যে, ঐশ্বর-তত্ত্ব বুঝিয়া লইলাম, তাহা নহে । সেই রচনা-কৌশল মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি ভাবগ্রাহী হইতে পারি, তবে জগৎ-রচনা বিষয়ে ঐশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়াছে বলিব । যেমন সেকপীরর নামা কবিকে জানিতে হইলে তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন ও রসগ্রহণ প্রয়োজন, সেইরূপ সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে হইলে সৃষ্টি বিষয় অধ্যয়ন এবং ভাবগ্রহণ প্রয়োজন । প্রলয় কর্তাকে জানিতে হইলে প্রলয়তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, এবং পালন কর্তাকে বুঝিতে হইলে পালনতত্ত্ব জয়জয় করিতে হইবে । এবং যখন একমাত্র ঐশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা বলিয়া জানিতে চাহিব, তখন সৃষ্টি কর্তা বিষয়ক জ্ঞান এবং সংহার কর্তা বিষয়ক জ্ঞান যে ঐশ্বরিক এক শক্তির বিষয়, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে ।

ঐশ্বর সম্বন্ধে শুটিকত বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা এবং ঐশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান যে সম্পূর্ণ শূন্য তাহা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই । বাস্তবিক সেই জগৎকারকের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ । সেই অজ্ঞতা বধাশাধ্য দূর করিবার চেষ্টাই

আমার মতে ঈশ্বরোপাসনা। যিনি এই অজ্ঞতাৰ অসম্ভৱ, জ্ঞান লাগসা বৃত্তি বশতঃ তিনি সেই জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অধেবী হন এবং তিনিই আমার মতে যথার্থ ঈশ্বরোপাসক। অৰ্থাৎ আগ্রহচিন্তে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিবার চেষ্টাই তাঁহার উপাসনা। যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে লাগসা না থাকে, গিৰ্জাৰ গিৱা নিজেৰ জন্ত প্ৰাৰ্থনা কৰ বা মন্দিৰে বসিয়া কোন দেৱ মূৰ্ত্তি ভাবনা কৰ, তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে।

পূৰ্বে যাহা বলিলাম, তাহাতে এমন কেহ না বুঝেন যে, আগ্রহ চিন্তে জগতের কারণ অনুসন্ধান করাই ঈশ্বর উপাসনা। তাহা হইলে আল কালকার পাশ্চাত্য নাস্তিক বৈজ্ঞানিক গণকে ঈশ্বরোপাসক বলিতে হয়। আগ্রহ চিন্তে সেই এক জগৎ-কারণ-তত্ত্ব-অনুসন্ধান কে ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। অৰ্থাৎ জগতের আদি কারণ এক এবং অসীম ইহা বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। সমুদ্রের তলে কি আছে ইহা জানিবার জন্ত সমুদ্র অন্বেষণ করা, মুক্তা অন্বেষণ করা নহ। সমুদ্র তলে মুক্তা আছে ইহা জানিয়া, সমুদ্র অন্বেষণ করাই মুক্তা অন্বেষণ।

একণে দেখা গেল যে, ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বর স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ, এই জ্ঞান ও সেই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্ত জ্ঞান-লাগসা এবং সেই জ্ঞান লাগসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত কৰ্ম্মে নিযুক্ত হওয়া।

একণে দেখিতে হইবে, সাধারণ জনগণ কোন না কোন ধৰ্ম্মাশ্রয়ী হইয়া যে যে পদ্ধতিতে উপাসনা করেন, তন্মধ্যে কাহাকে যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি। সাধারণ উপাসনাকেই বা কোন্ সময়

ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি এবং নিরাকার উপাসনাকেই বা কখন ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি না ?

গাভী একটি সাকার পদার্থ। গাভীগণ দ্বারা আমরা এই সংসারে অনেক উপকার প্রাপ্ত হই। সে উপকার ভুলিবার নয়। সেই জন্য যদি আমি একটা গাভীকে তত্ত্বি সহকারে পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

অগ্নির অসীম ক্ষমতা। অগ্নি না থাকিলে আমরা যথুয্যৎ পাইতাম না। আবার অগ্নি বড় ভয়ের ভিনিব। অগ্নি সন্মুখে এই শ্রদ্ধা ও ভয় বিমিশ্রিত হওয়ার, যদি আমি অগ্নির পূজা করি, তাহা নিশ্চয়ই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

সূর্য্য এই সৌর জগতের সকল ঘটনার আদি। সূর্য্যের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে উহার বাহ্যে বন পূরিয়া বার, এমন অবস্থায় যদি আমি সূর্য্যকে স্তব করি, তবে তাহাও ঈশ্বরোপাসনা নহে।

ছেলেবেলা থেকে শুনিয়া আসিতেছি, প্রলয়ঙ্করী কালী দেবীর অসীম ক্ষমতা, তত্ত্বিতাবে তাঁর উপাসনা করিলে ঐহিক পারত্রিক অনেক ফল লাভ হয়। এই বিশ্বাসে যদি কালীমূর্ত্তি সম্মুখে ধরিয়া কালীর উপাসনা করি, তবে তাহা কালীদেবীর উপাসনা বটে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা নহে।

কিন্তু যদি আমি ঐ গাভী, ঐ অগ্নি, ঐ সূর্য্যকে উপলক্ষ করিয়া জগৎ কারণ সেই আদি পুরুষ সন্মুখে চিন্তা করি, ঐ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশ্বরের যে বহিরা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানের উপায়, ইহা বুঝিয়া, সেই বিষয়ে তথ্যানু-সন্ধানী হই, এবং সেই সেই বহিরা বাহ্যে ভাবগ্রাহী হইয়া ঐ অগ্নি

স্বর্ঘ্যাদিকেই ভক্তিভাবে প্রণাম করি, তবে আমি ঈশ্বরোপাসনা করিলাম বলিতে হইবে।

যদি কোন দেবতার উপর অশেষ শুভ ফলপ্রসন্ন বলিয়া বিশ্বাস থাকে এবং সেই ভক্ত সেই দেব দেবীর পূজা করি, তবে তাহা ঈশ্বর উপাসনা নহে, কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানী আমার যদি এইরূপ বিশ্বাস থাকে যে, শাস্ত্রকারগণ বাহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দেব দেবীর বিষয়ে চিন্তা করা ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের এক প্রকার উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর-তত্ত্ব জানাভিলাষী আমার দেব দেবীর বিষয় চিন্তা করা উচিত। এইরূপ দেব দেবীর চিন্তা ঈশ্বরের স্বরূপ জানের পথ বুঝিয়া যদি দেব দেবীর উপাসনা করি তবে ইহা ঈশ্বরোপাসনা।

এরূপ উপাসনায় কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করিতেছি না, কেবল সাকার পদার্থ বিষয় চিন্তার সাহায্যে অনাদি কারণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ উপাসনাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহা সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করা যে সাকার উপাসনা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । (সাকার ও নিরাকার) ।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ? এ সম্বন্ধে সকল আন্তিকই স্বীকার করেন যে তিনি নিরাকার । সুতরাং কোন সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে, ঈশ্বরের মহিমার ঋক্ষ করা হয় । শুধু তাহাই কেন, উপাসক দ্রাব্য পথের পথিক হন । যদি আমি কালীরূপকে ঈশ্বরের রূপ জ্ঞান করি, তবে যখন কালী-রূপ অস্তরে অনুভব করিতে পারিব, তখনই আমি ঈশ্বরের অরূপ বুঝিয়াছি এই বোধ হইবে । ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা জ্ঞান আর থাকিবে না, সুতরাং আমার আকাঙ্ক্ষা সেই ধানেই শান্ত হইবে । বাহারা ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রকারগণ যখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন, তখন আমি যদি ঈশ্বরকে কালী-রূপাত্মক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তবে আমি সত্য পথে যে বেশী অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।

এরূপ সাকার উপাসনার যে কোমল নাই তাহা আমি বলি না । তবে এরূপ সাকার উপাসনা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নিরাকার সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধিতে পারা যায় না ইহা নিশ্চিত ।

যদি কেহ ক্ষটিককে হীরক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং হীরক লাঞ্চে চারিদিক অব্বেষণ করিতে থাকেন, তবে তিনি ক্ষটিক পাইবাই হীরক পাইয়াছি জ্ঞান করিবেন এবং উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বিবেচনা করিবেন । সেই ক্ষটিক তাঁহার অনেক উপকারে আলিতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যথার্থ হীরক লাঞ্চে বঞ্চিত রহিলেন । কেবল সাকারকে

কেন কোন সগুণ পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত নিগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকিব। ঈশ্বর কেবল নিরাকার নহেন, তিনি কেবল রূপের অতীত নহেন, তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দাদি গুণ এবং ভক্তি দয়া আদি গুণেরও অতীত। ঈশ্বর-তত্ত্বের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলি না যে, আত্মকাল বাহ্যার নিরাকার উপাসক নায়ে খ্যাত, তাঁহার সকলেই নিরাকারের উপাসনার ঠিক পথে চলিতেছেন। ঈশ্বর নিরাকার দরাময়, ইহা বিশ্বাস থাকিতে কোন কামনা সিদ্ধি জন্ত সেই নিরাকারকে অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেই ঈশ্বরোপাসনা হইল না। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লালসা অন্তরে না থাকে, তবে কোন উপাসনাই ঈশ্বরোপাসনা নহে। ভক্তি বৃত্তির চর্চার মানসিক উপকার বাহ্য হইবার সম্ভাবনা, এট উপাসক সেই উপকার পাইবেন। ফলে ইহার বেশী আর কিছুই হইবে না।

তবে যখন ইহা বুঝিব, নিরাকার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ জন্ত আমাদের ভক্তি আদি মানসিক বৃত্তির ক্ষুদ্র প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভে কোন শাকার অবলম্বন ব্যতীত সেই সকল বৃত্তি ক্ষুদ্রের চেষ্টা করি, তখন তাহাই নিরাকারের নিরাকার উপাসনা।

পূর্বে বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা পদ্ধতিভেদে দুই প্রকার নামে বিভক্ত। যখন সেই ঈশ্বরকে নিরাকার জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান জন্ত কোন শাকার চিন্তারূপ পথ অবলম্বন করা যায়, তখন তাহাকে শাকার উপাসনা বলে, এবং যখন কোন শাকার চিন্তা ব্যতিরেকে ঈশ্বরোপাসনা করা হয়, তখন তাহাকে নিরাকার উপাসনা বলে। আমরা

এই প্রবন্ধে যে সাকার বা নিরাকার উপাসনার দোষ গুণ বিচার করিব, তাহা এই উপরিউক্ত অর্থে প্রযুক্ত বৃত্তিতে হইবে।

সাকার-উপাসনা-পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্র-বিহিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যত দিন আমরা স্বাধার অধীন থাকিব, যত দিন ইঞ্জিয় সাহায্য ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তত দিন নিগূণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করিতে সক্ষম নহি, কেননা ঈশ্বর নিগূণ, সুতরাং কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কোন ইঞ্জিয়ার বিষয় হইতে পারেন না। সেই জন্য নিগূণ ঈশ্বরের সত্ত্ব উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন রূপ উপাসনা হইতে পারে না। আজকালকার নিরাকার উপাসকগণ যে সত্ত্ব উপাসক, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সাকার উপাসক রূপের সাহায্যে ভক্তিভাব উত্থেক করেন। নিরাকার উপাসক না হয় কতকগুলি শ্লোত্র গান দ্বারা তাঁহাদের ভক্তি-ভাব উত্তেজিত করেন। রূপ ও শব্দ দুই বাহ্যিকের বিষয়। একটি দর্শনেঞ্জিয়ার অপরটি শ্রবণেন্জিয়ার। প্রভেদ ত এই। তবে নিরাকার উপাসক দর্শনেঞ্জিয়ার বিষয় রূপের সাহায্য লইয়া উপাসনা করিতে এত পরাশ্রুণ কেন?

ইহার এক কারণ আছে। হিন্দুসমাজের আজ কালকার অবস্থা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সাকার উপাসনার দ্বারা নিগূণ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার পদ্ধতি প্রচলিত আবার সমাজের অবনতির সহিত সাধারণ জনের সাকার পদার্থকেই ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা প্রার্থনীয় নহে। এই জন্য ধর্ম সংস্কারগণকে মধ্যে মধ্যে ইহা উপদেশ দিতে হইয়াছে যে, উপাসনার অন্য যদিও রূপাদি ধ্যান করিতে হয় কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য, যে, ঈশ্বর নিরাকার। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, সাকার পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞান

করিয়া উপাসনা করিলে ভয়ে দ্রুত ঢালা হয়। কিন্তু আমি যাহাকে সাকারোপাসনা বলিতেছি, তাহা যে নিশ্চিন্দা তাহা কেহ বলিয়াছেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। সাকারকে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে না ইত্যাদি উপদেশের ফল আবার দাঁড়াইয়াছে যে, একেবারেই সাকার থাকতেই অশ্রদ্ধা। উপাসনা কালে সাকার চিন্তা করা আর উপাসনা ভ্রষ্ট করা, অনেকের কাছে একই কথা দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক গোঁড়ামী সকল সময়েই ধারাপ। গোঁড়ামী থাকিলে বিচার শক্তির ধারা সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। আজকালকার নিরাকার উপাসক গোঁড়ামী ছাড়িয়া যদি এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি কর্ণেল্লির সাহায্যে ঈশ্বরের যে উপাসনা করেন, তাহা সাকার উপাসকের রূপ শব্দাদির সাহায্যে সেই নিগূর্ণ কারণের উপাসনা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়েরই উপাসনা স্থূল উপাসনা। উভয়েরই স্থূল ইঞ্জিয়ার সাহায্যে উপাসনার রত।

তবে যদি কেহ স্থূল ইঞ্জিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে উপাসনা করেন, তিনি স্থূল উপাসক অপেক্ষা বেশী অগ্রগামী হইয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার করি।

আমার বিবেচনার উপসনার পদ্ধতি স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম ভেদে তিন নামে বিভক্ত করা বাটতে পারে। স্থূল, শরীরস্থ ইঞ্জিয়ার সাহায্য ব্যতীত যিনি উপাসনা করিতে পারেন না, তিনি স্থূল উপাসক। স্থূল শরীরস্থ ইঞ্জিয়ার সাহায্য ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীরস্থ এবং কারণ শরীরস্থ ইঞ্জিয়ার সাহায্যে উপাসনা সূক্ষ্ম উপাসনা। এবং যিনি কেবল মাত্র কারণ শরীর অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন, তাহারই উপাসনা অতি সূক্ষ্ম। আর যে উপাসক নিজের আত্মার সহিত উপাস্য আত্মার যোগ

করিয়া আছেন, তিনি মায়াপাশ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ অবগত হইয়াছেন ।

উপাসনা পদ্ধতি আচার সত্ত্ব ব্রহ্মঃ তমঃ গুণভেদে তিন প্রকার । আচার বিচার-শক্তি, প্রেম ইচ্ছা-শক্তি অস্তঃকরণের এই তিন প্রকার বৃত্তিভেদে জ্ঞান প্রদান, ভক্তি প্রদান এবং কর্মপ্রদান এই তিন ভাবে বিভক্ত হইতে পারে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সাকার ও নিরাকার ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আগ্রহচিহ্নে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার চেষ্টার নামই ঈশ্বরোপাসনা। কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার অভিলাষে কোন ভ্রান্ত পথের পথিক হন, তবে তাঁহার উপাসনা কখনই প্রসংসনীয় নহে। যদি কেহ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার ভ্রান্ত তত্ত্বাদি শাস্ত্রের গূঢ় মন্ত্র না বুঝিয়া কপাল কুণ্ডলার কাপালিকের ভ্রান্ত আচরণ অবলম্বনে উপাসনা করেন, তবে তিনি যে কতদূর ভ্রান্ত, এবং তাঁহার উপাসনা শক্তি যে কতদূর তাহা বোধ হয়, বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক হিন্দু সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ভ্রান্ত এমন অনেক আছেন, বাঁহাদের উপাসনা শক্তি প্রসংসনীয় দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণাজনক।

সুতরাং, এক্ষেপে দেখিতে হইবে যে, কোন পথ অবলম্বন করিলে ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যায়। কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্ট ধর্ম, সকলই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এক মাত্র সত্য কথা এই পাওয়া যায় যে, বাহ্যতে মানব চিত্তের পূর্ণ ক্ষুরণ হয় এবং সেই ক্ষুরণ ভ্রান্ত পুরুষ নিত্যস্থায়ী লাভ করিতে পারেন, তাহাটী সেই নিত্য পদার্থ ঈশ্বরকে জানিবার এক মাত্র পথ। যেমন প্রাণেন্দ্রিয়ের সম্যক বিকাশ না হইলে সঙ্গীত বাহ্যাদ্য বুঝা

যায না। সেই রূপ চিন্তের সম্যক বিকাশ না হইলে সেই অনন্ত শক্তির যে সঙ্গীত লহরীতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লব হইয়াছে, সেই সঙ্গীত বাহাদুরী কেহই বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। এই জগতই সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে যদি ঈশ্বর তব বুঝিতে চাও, তবে বাহাতে মানব-চিন্তের সম্যক বিকাশ হয়, সেই চেষ্টা কর এবং ঐ চেষ্টাকেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা বলিতে পারি।

কোন একজন খ্রিষ্টান ঈশ্বরোপাসনা একজন ইংরেজ শিষ্যকে এই বলির উপদেশ দিয়াছিলেন যে, “Live up to your highest ideal of true manhood” অর্থাৎ তুমি বাহাতে যথার্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ কল্পনা করিতে পার, সেই আদর্শানুযায়ী কার্য্য কর এবং আপনাকে সেই উন্নতাবস্থার ভুলিতে ক্রমাগত চেষ্টা কর। যিনি এই উপদেশ বাক্য মত কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনিই ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

চিত্রবিদ্যা শিখিতে গেলে প্রথমে কল্পনার বাহা সুন্দর, চিত্রপটে সেই চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়, ক্রমে চিত্রবিদ্যায় যত নিপুণতা জন্মিতে থাকে, ততই পূর্বাশ্রয়ী অধিকতর সুন্দররূপ কল্পনা করিবার ক্ষমতা জন্মে এবং সেই ক্ষমতাবশতঃ পূর্বাশ্রয়ী সুন্দররূপ চিত্রপটে আঁকিতে চেষ্টা জন্মে। এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই যেমন যথার্থ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা হয়, চিন্তের ক্ষুদ্ররূপ বিদ্যা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এই বিদ্যায় শিক্ষানবীশ মনুষ্যের যতদূর উন্নতাবস্থা কল্পনা করিতে পারেন, ততদূর উন্নত হইবার চেষ্টা করুন। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে চিন্তা যখন কতক পরিমাণে সার্বজনীন করিতে হইবে তখন অধিকতর উন্নতাবস্থা কল্পনা করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। এখন

তিনি আপনাকে সেই অবস্থার তুলিতে চেষ্টা করুন। এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা চিত্ত যতই ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের জ্যোতিঃ চিত্তে স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিবে, ঈশ্বর সঙ্ঘর্ষে জ্ঞান ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। ক্রমে যখন চিত্তের পরিস্ফুটনাবস্থা অগ্নিবে, তখনই যথার্থ ঈশ্বর কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমি এখন বোদ্ধ হই আর তুমি এখন বৈষ্ণব হও, উন্নতাবস্থার চরম আদর্শ সঙ্ঘর্ষে এখন তোমাতে আমাতে প্রভেদ থাকিতে পার, কিন্তু আমি যদি যথার্থ বোদ্ধ হই, অর্থাৎ বুদ্ধ চরিত্রাত্মধারী নিজের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করি, আর তুমি যদি যথার্থ বৈষ্ণব হও, অর্থাৎ কৃষ্ণ-চরিত্রাত্মধারী নিজের চরিত্র গঠন করিতে থাক, তবে আমরা উভয়ে কিছুদূর অগ্রগত হইলেই দেখিতে পাইব যে, যজ্ঞব্যবহের চূড়ান্ত আদর্শ সঙ্ঘর্ষে আমাদের আর বড় যতভেদে নাই। কেন না ঈশ্বরের বিমল জ্যোতিঃ নির্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যজ্ঞব্যবহের যে অবস্থা হয়, তাহাই যজ্ঞব্যবহের চূড়ান্ত আদর্শ। সেই আদর্শ এক বই দুই হইতে পারে না। তবে মানব-চিত্ত অজ্ঞান মলার বিভিন্নরূপ হওয়াতেই সেই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়।

কি হিন্দু, কি বোদ্ধ, কি খ্রীষ্ট ধর্ম সকল ধর্মেই এইরূপ একটি না একটি আদর্শ ধরিয়া চিত্ত সার্জন করিবার শিক্ষা দিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের পক্ষে খ্রীষ্টকৃষ্ণই যজ্ঞব্যবহের চরম আদর্শ স্বরূপ, খ্রীষ্ট ধর্ম-ব-লম্বীদের যিগু, বৌদ্ধগণের বুদ্ধদেব এবং শৈবগণের পক্ষে শিব, এইরূপ যজ্ঞব্যবহের চরম আদর্শ। যদি কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ কৃষ্ণপদে তুলসী চন্দন দেওয়াকেই বিষ্ণু পূজা জ্ঞান করেন, কিন্তু কৃষ্ণের উন্নত চিত্রাত্মধারী নিজের চিত্ত গঠিত করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহার পূজার ফল নাই। আর যে খ্রীষ্টবান প্রতি রবিবারে গির্জায় গিয়া

গান কবেন, কিন্তু যিশুর ক্রায় মহৎ হইবার চেষ্টা না করেন, তবে যিশু তাঁহাকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন জানি না ।

বঁাহাকে ভক্তি করা যায়, তাঁহাকেই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে । বঁাহাকে ভাববাসি না তাহার অনুকরণে মন যায় না । এই জন্যই সকল ধর্মে এই শিক্ষা দেব যে, কোন একটি উন্নত আদর্শে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া সেই আদর্শ-সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করিবে । এইরূপ আদর্শ চিন্তাই সাধারণতঃ উপাসনা নামে খ্যাত ।

সাকার-উপাসক হিন্দুগণেব দেব দেবী এইরূপ এক একটি আদর্শ যাত্র । আর নিরাকার উপাসকের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বরও এইরূপ একটি আদর্শ ব্যতীত আর কিছুই নহে । এইরূপ সগুণ ঈশ্বর হিন্দুদেব কাছে একটি দেবতা-স্বরূপ । ঈশ্বর নিগুণ, সূতরাং সগুণ উপাস্য আদর্শকে ঈশ্বর না বলিয়া দেবতা বলাই সঙ্গত ।

বাস্তবিক হিন্দুরা সাকার বা সগুণ দেব দেবীকে কখনই আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না । ঈশ্বর তাঁহাদেব কাছে চিগ্নব অদ্বিতীয় নিরূপ এবং অশব্দী । তবে যেট

“চিগ্নরস্যা দ্বিতীয়স্য নিরূপস্য শরীরিনঃ ।

উপাসনানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা ॥”

এখন দেখ, সাকার উপাসক হিন্দু পৌত্তলিক, কি তুমি নিরাকার উপাসক খ্রীষ্টিয়ান পৌত্তলিক । হিন্দুরা আদিকাবণে কখন কোন গুণ পর্য্যন্ত আরোপ করিতে চান না, কিন্তু তুমি খ্রীষ্টিয়ান অব্যক্ত অনাদি সেই কারণে সামান্য যজ্ঞোত্তর দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ আরোপ করিতে চাও । তুমি যখন ঈশ্বরে ঐরূপ দয়াদি গুণ আরোপ করিলে, তখন তুমি ঈশ্বরকে একটি সজীব পুত্তল স্বরূপ বলিলে না শু কি ? যদি বল, সগুণ না ভাবিলে ত উপাসনা করা যাব না আশিও তাই বলি যে,

যাহা সঙ্গুণ নয়, তার বিবরণ চিন্তা করা যায় না, আর সেই জন্যই হিন্দুরা দেব দেবীর কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং সকল সময়েই অরণ্যে যখন যে, তাঁহাদের উপাস্য দেবতার রূপ গুণাদি কেবল কল্পনাকল্পিত মাত্র। যখন ঈশ্বরোপাসনার জন্য সকলকেই উন্নত অবস্থার একটি না একটি আদর্শ মনে মনে গড়িয়া সেই বিবরণ চিন্তা করিতে হইল, তবে সেট আদর্শের রূপ কল্পনার কোন উপকার আছে কি না ?

উপাস্য দেবতার হাত আছে, পা আছে, মুখ আছে, চোক আছে ইত্যাদি ভাবিতে পারিলেই উপাস্য দেবতার রূপ চিন্তা হয় না। ষষ্ঠাংশ রূপ কাহাকে বলে, দেখা বাউক ।

কেবল মাত্র নান্য কর্ণাদির সমষ্টি লইয়াই মনুষ্যের রূপ নহে। সমস্ত দেহ বিশেষতঃ মূৰ্ধ্যমণ্ডল হইতে যে এক ছটা নির্গত হয়, যে ছটা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া কোন বাক্যাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্তরে নানারূপ ভাবের উদ্ভেক করে, তাহাই মানবের রূপ অথবা রূপের সার ভাগ। যখন মাতা তাহার শিশুর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তখন কি সে তাহার মুখ চোক কান একটি একটি করিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হয় ? শিশুর সেই হাসি হাসি মধুমাধা সেইটি বাহার নাম রূপ, তাহাই দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মনুষ্যের অন্তরস্থ ক্রাব সমূহ প্রস্ফুটিত হইলেই তাহা বাহ্য শরীরে এক রকমে প্রকাশিত হয়। শাশ্ব পুরুষের শাশ্ব ভাব, সুখের শাশ্ব শ্রী দেখিলে বুঝা যায়। এই রূপ বাহ্যকে শ্রী বলে, তাহার নাম রূপ। যিনি ষষ্ঠাংশ উপাসক, তিনি ইষ্ট-দেবের রূপ ধ্যান কালে ইষ্ট-দেবের যে রূপ যে শ্রী তাঁহাকে শোহিত করিয়াছে, সেই রূপ অন্তরে উদ্ভিত করিবার চেষ্টা করেন। এবং রূপ অন্তরে উদ্ভিত হইলে মনুষ্য ক্রাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই অর্থে নারায়ণের পার্শ্ববর্তিনী শ্রী (লক্ষী)

কল্পিত হইয়াছে । নহিলে, সত্য সত্য তাহার একটা গৃহিনী নাই ।

এরূপ রূপ-চিন্তার কল কি ? জননী যদি গর্ভাবস্থায় কোন সুন্দর রূপ অনবরত চিন্তা করেন, তবে গর্ভস্থ শিশু অনেকট। সেই রূপের অনুরূপী হয় । ঐক্যতির যে নিয়মে এক জনের চিন্তা হেতু তাহার গর্ভস্থ শিশুর ঐক্যতি গঠিত হইতে পারে, সেই নিয়মের বলে যে স্বয়ং সেই রূপ অহরহঃ চিন্তা করে, তাহার নিজের স্বভাবের কি কোন পরিবর্তন ঘটবে না ? পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইষ্টদেবের চিন্তায় উন্নত ভাব অনুকরণের চেষ্টাই উপাসনা । যে ভাব সুন্দর (বাহ্য সুন্দর, তাহাই উন্নত) সেই ভাব অন্তরে ক্রমাগত উদ্ভিত করিবার চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অবিরাম অভ্যাস দ্বারা মানব নিজে সেই সুন্দর ভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে । চিন্তা দ্বারা যে এই রূপ কল পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই । হয় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে কিম্বা কোন রূপ ধ্যান কিম্বা কোন গন্ধ স্পর্শাদির অনুভব দ্বারা সাধারণ সকল উপাসকই তাহাভের আন্তরিক ভাব উত্থেক করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন ।

আজ কাল বাঁহারা নিরাকার উপাসক বলিয়া ব্যাত তাহারা কেবল মাত্র কতকগুলি বাক্যার্থ, অর্থাৎ শব্দের অর্থ বনোমধ্যে আলোচনা দ্বারা অন্তরে সুন্দর ভাব উদ্ভিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হিন্দু উপাসক বাক্য, রূপ, সঙ্গীত, গন্ধ ইত্যাদি সকলেরই সাহায্য লইতে জানি বোধ করেন না ।

উপাসনার আসল ঐশ্বোজন অন্তরে সুন্দর ভাব উদ্ভিত করা । কিন্তু কেবল মাত্র বাক্যের সাহায্যে পূর্ণরূপে সেই ভাব উদ্ভিত হওয়া সম্ভব নয় । নিজের মনে যে ভাব উদ্ভিত হইয়াছে, সকল সময় তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, আর যে ভাব উদ্ভিত

হয় নাই, বাক্য দ্বারা অন্তরে তাহা পূর্ণরূপে উদ্ভিত করা অনেক সময় কত দূর অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু রূপের সাহায্য পূর্ণ সুন্দর ভাব অন্তরে উদ্ভিত করিতে পারা যায়।

সে ভাব কি কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে অসম্ভব করিতে পারা যায়? রূপে যে ভাব উদ্ভিত করিতে পারে, বা সঙ্গীতে যে ভাব উদ্ভিত করিতে পারে, বাক্য দ্বারা সেরূপ পূর্ণভাব কখনও উদ্ভিত করিতে পারা সম্ভব নহে। অভিনীত নাটকে এবং কেবল পণ্ডিত নাটকে যে তফাৎ, শাকার ও নিরাকার উপাসনায় সেই তফাৎ।

রূপচিন্তা দ্বারা সুন্দরের, অর্থাৎ উন্নত ভাব সম্পন্ন জনের ভাব সমূহ অন্তরে পূর্ণরূপে বিকাশিত করিতে পারে যায়, ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু রূপ চিন্তা কথটা বড় সোজা কথা নয়, এটা যেন সকলের স্বরণ থাকে। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাদের ক্ষুরিত হয় নাই, সঙ্গীত দ্বারা তাহাদের আন্তরিক বৃত্তি ক্ষুরিত হওয়া সম্ভব নয়, সেই রূপ যাহাদের দর্শনেন্দ্রিয় ভোঁতা যাহারা রূপ সাহায্যে বুঝেন না, তাহারা রূপ চিন্তা দ্বারা ইষ্টদেবের উপাসনা করিবার অধিকারী নহেন। তাহাদের নিরাকার উপাসনা ব্যতীত আর গতি নাই। কিন্তু একরূপ নিরাকার উপাসক রূপোন্মত্ত শাকার উপাসক, অপেক্ষা উন্নত না অবনত?

আর যিনি রূপ-সাহায্যে বুঝিতে পারেন, যাহার দর্শনেন্দ্রিয় কিছু না কিছু ক্ষুরিত, তাহাকে ইষ্টদেবের রূপ-কল্পনা কারতে হইবে। আমি যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহা রূপেই হউক শব্দেই হউক বা গন্ধেই হউক বা আন্তরিক গুণ সমূহেই হউক, সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য, প্রতিতে আমার উপাস্য দেবকে গড়িব, ইহা নিশ্চয়। কেন না যাহা সুন্দর, তাহাই উন্নত। যদি কেহ আমার নিবেদন করেন যে, তোমার

উপাস্য দেবের ভূমি রূপ করণা করিওনা, আর আমি যদি যথার্থ রূপের সৌন্দর্য্যগ্রাহী হই, তবে আমার মন আমাকে ভিতর হইতে বলিয়া দিবে যে, ভূমি কাহারও কথা শুনিও না, ভূমি বাহাতে সৌন্দর্য্য দেখ, তাহা লইয়া তোমার মূন্দরকে গঠিত কর ।

উন্নতাবস্থার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা যখন বলিব, তখন বেধাইব যে দর্শনও শ্রবণেন্দ্রিয় তেঁতা করিয়া রাখা যথার্থ উন্নতাবস্থার লক্ষণ নহে । তবে এমন যদি কেহ থাকেন, বাঁহার দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সম্যক স্মরিত হইবা অন্তরেন্দ্রিবে লয় পাইয়াছে, এরূপ জনের পক্ষে তাঁহার ইষ্টদেবের রূপ করণা নিশ্চয়োজ্ঞানীয় । তিনিই সূক্ষ্ম উপাসক এবং তিনিই যথার্থ নিরাকার-উপাসক । এবং আজ কাল-কার যে নিরাকার উপাসনা ধর্ম্ম-মন্দিরে দেখিতে পাই, তাহা উক্তরূপ নিরাকার উপাসনার ভেঙান মাত্র ।

আমি যে সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইবা এত কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে আজ কাল অনেকেই হিন্দুদের সাকার উপাসনার যথার্থ ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইষ্টদেবের রূপ চিন্তা করা একটা মহাপাপ স্থির করিয়াছেন । উর্নবংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-গুরু পাদরী মহাশয় গণের সংসর্গেই অনেকেব ঐরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে । কোন কোন সম্প্রদায় ভুক্ত খ্রীষ্টীয়ানদের গির্জার যিগুর ছবি পর্য্যন্ত রাখা নাকি নিষিদ্ধ । কিজানি যদি পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে, কি জানি যদি কেহ লম্ব ক্রমে যিগুর পবিত্রমূর্ত্তি এক বার মনোমতো ভাবিয়া ফেলে তবেই ত সৰ্ব্বনাশ । খ্রীষ্টীয়ানদের এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সাকার উপাসনা উঠাইয়া দিতে চান । কিন্তু এরূপ চেষ্টায় কুফল বই সুফল হওয়া ত সম্ভব দেখিনা । রূপ-ধ্যান হিন্দু উপাসনা-পদ্ধতির একটি প্রধান এবং সুন্দর অঙ্গ, তাহা উচ্ছেদে

ত কোন উপায় দেখি না। তবে দেব দেবীর মূর্তি কল্পনা হেতু হিন্দু সমাজে যে পৈতৃকত্ব দোষ জন্মিয়াছে তাহা যদি নিরাকরণ করিতে চাও তবে দেব দেবীর মূর্তি কল্পনার বর্ষা উদ্দেশ্য কি, তাহা সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা কর। তাহা না করিয়া যদি রূপ চিত্রা ধর্মের অঙ্গ হইতে উঠাইতে চাও, তবে তোমাদের চেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নয়। অল্পবুদ্ধি যুবকগণ সঙ্গীত-চর্চা করিতে গিয়া অনেক সময় দ্বন্দ্বাবস্থায়-চপলতা বশতঃ কুপথপামী হইয়া থাকে, এই জন্ত কি সমাজ হইতে সঙ্গীত-চর্চা উঠাইতে চাও? আর উঠাইতে চাহিলেই কি তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে? আজ-কল-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে যে রূপ-ধ্যান-প্রথা চলিয়া আসিতেছে, আজ তুমি পাশ্চাত্য-গণের অহুকরণে ছুদিনে কি তাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইবে? কখনই না। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে সেই জন্ত এই কথা বলিতে চাই যে, সমাজে সাকার উপাসনা নিবন্ধন যে যে দোষ ঘটিয়াছে তাহারই নিরাকরণের চেষ্টা কর, সাকার কথাতেই একেবারে অপ্রত্যা নাই করিলে ?

বাস্তবিক একটু বুঝিয়া দেখিলে হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতি অপেক্ষা মুন্সর অন্তরূপ উপাসনা পদ্ধতি দেখা যায় না। ব্রাহ্মণদের নিত্য কর্ম মধ্য হইতে একটি ছোট ষাট পূজা পদ্ধতি দেখাইয়া ইহা দেখাইতে চাই। দেখ, শিব উপাসক কি পদ্ধতিতে শিব পূজা করিতেছেন। প্রথমে জ্ঞানাদি কার্য সমাপন করিয়া দেহবিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিলেন। সরল ভাবে উপবেশন করিয়া “বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ, উর্ধ্বে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, সম্মুখে নমঃ শিবায় নমঃ” প্রথমে এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিলেন। এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহার মনে কি

কি ভাবের উদয় হইল দেখা যাউক। ইষ্টদেবের মহিমা-সম্বন্ধে হাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন ভক্তি ভাবে সেই গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া উপাসক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ‘যেন আমার উপাসনার ফল অচিরে ফলে’ একান্ত চিন্তে এই সিদ্ধি কামনা অন্তরে থাকায় উপাসক সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিলেন। এই দুইজনকে নমস্কারে উপাসক তাঁহার ভক্তি-বৃত্তি এবং ইচ্ছা-বৃত্তির প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখ, উপাসকের সিদ্ধিকামনা কেন? অল্প কোন কারণে নয়, উচ্ছৃংসেই ব্রহ্ম এবং অধঃস্থ তাঁহার অনন্ত-শক্তি অনন্তের বিষয়ে জ্ঞান লাভ জন্মই এই কামনা। এই জন্ম উপাসক ব্রহ্ম ও অনন্তকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবকে নমস্কার করতঃ তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদের প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতিই এইরূপ দেখা যায় যে, তাঁহাদের উপাসনা কেবল মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্ম এবং পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাই বস্তুর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা। ইষ্টদেবের ধ্যান করিতে করিতে যখন তাঁহার পূর্ণভাবে অন্তরে উদ্ভিত হইবে, তখন উপাসক মানস-পূজা আরম্ভ করেন। মানস-পূজা অর্থাৎ “সোহং” সেই ইষ্টদেবই আমি, এই রূপ চিন্তা দ্বারা আপনাকে ইষ্টদেবের উন্নততাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। “সেই আমি” এই চিন্তা দ্বারা নিজের অহংজ্ঞান নিজের রূপে না রাখিয়া, নিজের ভাব সমূহে না রাখিয়া, ইষ্টদেবেব্দু রূপ ও মহিমায় সেই অহংজ্ঞান অর্পিত করিবার চেষ্টা করিতে হিন্দুধর্ম ভিন্ন অল্প কোন ধর্মে শিক্ষা দেয় কি? এইরূপ মানস-পূজার পর বাহ্যজ্ঞান হইলে উপাসক পাদ্য, অর্ঘ্য, নৈবেদ্যাদি ইষ্টদেবে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বাহ্য পূজা করেন।

কল্পনা-কল্পিত রূপ মহিমাদি ধ্যান ও মানস-পূজাদি ব্যাপার সুন্দর হইলে ও চাল ছোলায় নৈবেদ্য লইয়া ইষ্টদেবে উপহার দেওয়া

যে একটি কুসংস্কারের ফল, তাহার ত সম্ভেদ নাই। অনেকে এইরূপ মনে করিতে পাবেন। কিন্তু আমরা বলি যে, হিন্দুদের উপাসনার এই অংশ তুচ্ছ সর্কাপেক্ষা সুন্দর। হিন্দু-উপাসক নিজের অন্ন পানীয় জব্য পর্য্যন্ত ইষ্টদেবে, সমর্পণ না করিয়া গ্রহণ করেন না। হিন্দু-উপাসক যে অন্ন পানাদি গ্রহণ করিবেন, তাহা তাঁহাদের নিজের আসক্তি পরিতৃপ্তির জন্য যেন না হয়, যেন সেই অন্ন পানাদি জনিত শক্তি কেবল দেব কার্য্যেই ব্যয় হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশই নৈবেদ্য প্রদানের যথার্থ অর্থ। যখনই আমি অন্নপানীষাদি ইষ্টদেবে অর্পণ করিতে বাইব, তখনই আমার স্মরণ হইবে, এই অন্নপানীয় দ্বাৰা আমি যে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শাস্তি কবিব, তাহা যেন কেবল দেবকার্য্য সাধনাদ্বেশেই করি। উপাসক একরূপ বাসনা অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখিতে চান, এই জন্যই তাঁহার প্রাত্যহিক নৈবেদ্য নিবেদন। এখন দেখ, হিন্দুদের এই প্রথা কত দূর সুন্দর।

এইরূপে হিন্দুদেব উপাসনা-পদ্ধতি যতই আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ততই সুন্দর বলিবা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং হিন্দুদের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি একেবারে অশ্রদ্ধা না করিয়া বরং সমাজের অবনতির সহিত উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি বেরূপ মলিন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মলিনতা ঘুচাইতে সকলে চেষ্টা করুন। তবেই সমাজের যথার্থ উপকার হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ ।

মনুষ্য নিজে তাহার জ্ঞান ও বিচার শক্তি চালনা দ্বারা মনুষ্যত্বের যতদূর উন্নত অবস্থা করিয়া করিতে পারে, সেইরূপ উন্নত দশায় উঠিতে সতত চেষ্টা করিলে ঈশ্বর সদ্বশে জ্ঞান লাভের পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিবে। সেই কল্পিত আদর্শ পুরুষের যেরূপ মূখ্যত্ব হইতে পাবে, স্বরের যেরূপ মাধুর্য্য সম্ভব, আন্তরিক ভাব সমূহের বিকাশ যতদূর সুন্দর হইতে পারে, সেইরূপ মূখ্যত্ব, সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ আন্তরিক ভাব সমূহ অনবরত চিন্তা দ্বারা আপনাকে সেইরূপ মধুর স্বর, সেইরূপ মূখ্যত্ব ও সেই সেই সমস্ত সুন্দর ভাব-সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আপনাকে উন্নত অবস্থায় তুলিতে তুলিতে যখন নিজেব প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পরা প্রকৃতির সহিত একতানে লয় করিতে পারিবে, তখনই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের চিন্তের ভাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সুতরাং পরমোন্নত পুরুষ সদ্বশে ভিন্ন ভিন্ন লোকের করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি যাহাকে যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া করিয়া করিব, তাহা অপর একজনের করনানুযায়ী না হইলে হইতে পারে, এইজন্য নিজের করনানুযায়ী আদর্শ বর্ণনা দ্বারা কাণ্ডা হইয়া কাণ্ডাকে পথ দেখাইতে চাহি না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষগণ মনুষ্যের

যেইরূপ অবস্থাকে যথার্থ উন্নত অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থা কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতে চেষ্টা করিব ।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার বলিয়াছেন :—

“সৰ্বভূতহৃদাঙ্গানং সৰ্বভূতানি চান্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ॥”

ঈশ্বরের যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সৰ্বত্র সমদৰ্শী হইয়া আপনাকে সৰ্বভূতত্ব এবং সৰ্বভূতকে আপনাতে দেখেন । শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ লোককেই যথার্থ উন্নত পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন । যিনি আপনাকে সৰ্বভূতত্ব দেখেন এবং আপনাতেই সৰ্বভূতকে দেখিতে পান, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে । এরূপ জনের কাছে বর্ণ বিচার নাই—এরূপ জনের কাছে পণ্ড পক্ষী, বৃক্ষ লতা, বাতু মৃত্তিকা, দেব গন্ধৰ্বাদি সম্বন্ধে প্রভেদ-জ্ঞান নাই—ইনিই যথার্থ অবৈতবাদী । “একমেবা-দ্বিতীয়ং” কথার অর্থ ইনিই বুঝিয়াছেন । ইনিই যথার্থ ব্রহ্মোপাসক ।

‘আপনাকে সৰ্বভূতত্ব দেখিবে’ এই কথাটির ভিতর যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় ভাবেন না । সমস্ত বেদের, সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা ঐ কয়টি কথার নিহিত রহিয়াছে । যোগই বল, যাগই বল, তপস্যাই বল, আর মনুষ্যত্বই বল, সবই ঐ কয়টি কথার ভিতর রহিয়াছে ।

এই জগতে সকলেই নিজের জন্ত ব্যস্ত । পরের জন্ত কয়টা লোক ভাবে ? পরের জন্য ভাবে না বলিয়াই জগতে নৃষ এত কম । এই জন্তই সকল ধর্মের শিক্ষা দেয় যে, যেমন নিজের জন্ত ব্যস্ত হও, সেইরূপ পরের জন্তও ব্যস্ত থাকিও । এই শিক্ষা অতি উচ্চতর নীতি-শিক্ষা সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুধর্মে বাহ্য শিক্ষা দেয়, তাহা উচ্চতম শিক্ষা । নিজের জন্ত যেমন ভাব, পরের জন্ত তেমন ভাবিও, এই নীতিতে নিজ ও পরে

এতেদ জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু হিন্দুধৰ্ম্মে সেই এতেদ জ্ঞানটুকুও রাখিতে চায় না। হিন্দুদের উন্নত দশাৰ আদৰ্শ-পুৰুষেৰ কাছে আমি ছাড়া অস্ত্ৰ কেহ থাকি সম্ভব নয়। কেন না এই উন্নত পুৰুষ ‘আপনাকে সৰ্বভূতহু’ ঘোষিয়া থাকেন। হিন্দু ধৰ্ম্মেৰ আদৰ্শ পুৰুষ পৰেৰ জন্ত ভাবেন না নিজেৰ জন্ত ভাবেন, কিন্তু তাঁহাৰ সেই নিজেৰ জন্ত ভাবনাতেই জগতেৰ সৰ্বভূতেৰ মঙ্গল সিদ্ধ হয়।

‘সৰ্বভূতহুমাখ্যানং’ কথাটিৰ অৰ্থ একটু পৰিষ্কাৰ কৰিয়া বুজিলেই দেখা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্ৰকাৰগণ কতদূৰ উন্নতমনা ছিলেন। আমাৰ আমি-জ্ঞান আমাৰ আন্তৰিক ভাব সমূহেৰ সমষ্টি জ্ঞান। অৰ্থাৎ আমাৰ দেহে আঘাত কৰিলে কষ্ট হয়, আমাৰ ক্ষুধাৰ সময় বাইতে না পাইলে কষ্ট হয়, ঔষ পুত্ৰেৰ মূৰ দেখিলে বন সন্তুষ্ট হয় ইত্যাদি আমাৰ সমস্ত ভাবেৰ সমষ্টি লইয়া আমি-জ্ঞান। কিন্তু এই ভাব সমূহ সাধাৰণ জনগণেৰ পক্ষে বড়ই সংকীৰ্ণ, এই জন্ত সাধাৰণেৰ ‘আমি-জ্ঞান’টিও বড় সংকীৰ্ণ। নিজেৰ অজ্ঞপ্ৰত্যক্ষ ইঞ্জিয়াৰিতেই সাধাৰণতঃ এই আমি-জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু আদৰ্শ-পুৰুষেৰ কাছে আমাদেৰ দেহেৰ অজ্ঞপ্ৰত্যক্ষ ও ইঞ্জিয়াদিৰ সহিত আমাদেৰ যে সম্বন্ধ, এই বিশ্বেৰ অজ্ঞ-প্ৰত্যক্ষাদিৰ সহিত তাঁহাৰও সেই সম্বন্ধ। সুতৰাং আমরা সাধাৰণে যেমন আপনাদিগকে আমাদেৰ দেহস্থ বিবেচনা কৰি, তিনিও সেইৰূপ আপনাকে সৰ্বভূতহু জ্ঞান কৰিয়া থাকেন।

নিজেৰ অহংজ্ঞান বতাই বিত্তীৰ্ণ কৰিবে, ততাই যজুৰ্য্য উন্নতদশা প্ৰাপ্ত হইতে থাকিবে। আমাৰ অহংজ্ঞান কেবলমাত্ৰ নিজেৰ চক্ষু-কৰ্ণ-নাসাদি ইঞ্জিয়গুলিতে না রাখিয়া অন্যভূতে অহংজ্ঞান স্তম্ভ কৰিবাৰ শিক্ষা কেবল হিন্দু-উপাসনা-প্ৰণালীতেই দেয়। হিন্দু উপাসক উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে “সোহং” সেই আমি, এই জ্ঞান

বাহ্যতে জন্মায়, তাহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন। আমার সহিত আমার হস্তপদাদি ও মনের সহিত একটি নিত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধটি আমি অনুভব করিতে পারি বলিয়াই আমার হস্তপদাদি ও মনে, আমার অহংজ্ঞান জন্মিয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিবে যে আমার সহিত সমস্ত বিশ্বের ঐক্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনুভবশক্তির বিকাশে মানব সেই সম্বন্ধ স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবে। অমনট মানবের অহংজ্ঞান সর্বভূতে জন্মিবে। আমার সহিত জগতের সেই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহারই পর্যালোচনায় হিন্দু ঋষিগণ তাঁহাদের দীর্ঘজীবন যাপন করিতেন।

হিন্দু-ঋষিগণ যাহাকে যোগ বলিয়া গিয়াছেন, নিজের অহংজ্ঞানের সহিত এই জগতের যোগই ইহার অর্থ। যে ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তিতে জগৎ চলিতেছে, সেই সেই ঐশ্বরিক শক্তির ক্রিয়া মানব চেষ্টা করিলে আপনাতে দেখিতে পান। হিন্দু-ঋষিগণ এই জন্ত মনুষ্যকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আপনাতে অনুভূত উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তির যে সূত্র, তাহাকে জগতের হেতুভূত শক্তি সকলের সূত্রের সহিত একতানে মিলন করার নামই যোগ। আমার মনের সহিত জগতের মনের আশ্রয় বুদ্ধির সহিত জগতের বুদ্ধির এবং আমার আত্মার সহিত জগতের আত্মার একতানে মিলন করাই যোগ। এইরূপ যোগযুক্তায়াই আপনাকে সর্বভূতস্থ জ্ঞান করিতে সক্ষম।

অনেকে ভাবিবেন যে, পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা কেবল কতকগুলি কথা শাশ্বত মাত্র। জগতের মন, জগতের বুদ্ধি, এ সকল কথার অর্থই নাই। বাস্তবিকই যাহারা হিন্দু-দর্শনাদিতে বীতশ্রদ্ধ,

তাহারা ঐরূপ মনে করিবেন সন্দেহ নাই। বেদান্তে ব্যষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য এবং সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য, ব্যষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি ও সমষ্টিভাবাপন্ন বুদ্ধি এই সকল কথার অর্থ দ্বাহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহারা পূর্বোক্তিত জগতের মন, জগতের বুদ্ধি ইত্যাদি কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

কোলাহল-পূরিত রাজধানীতে কত লোক কত প্রকারের শব্দ করিতেছে। নিকটবর্তী কোন শৈলশ্রেণী দণ্ডাধীন হইয়া রাজধানীর দিকে কর্ণপাত করিলে, সেট সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক একটি পৃথক পৃথক শুনা না গিয়া যে একটি মাত্র হো হো শব্দ শুনা যায়, সেট শব্দটি পূর্বকথিত ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সমষ্টিভাব। কতকগুলি সুর একতানে মিলাইয়া বাজাইলে শ্রোতা যে একটি মাত্র সুর শুনিতে পায়, সেই সুরটি ঐ ভিন্ন ভিন্ন সুরগুলির সমষ্টি-সুর। এবং ঐ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সুরকে ব্যষ্টিসুর কহা যায়। সেইরূপ এই সমস্ত জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূতের চৈতন্য যিনি সমষ্টিভাবে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে পারেন সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য কাহাকে বলে। এই সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্যই জগতের আত্মা। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভূতের মন, ভিন্ন ভিন্ন ভূতগতভাব সমুদয় দ্বারা ব্যষ্টিভাবাপন্ন রূপে প্রতীক্ষমান হইলেও উন্নতপুরুষ সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টিভাব অনুভব করিয়া জগতের মন কি তাহা বুঝিতে পারেন এবং এই জগতের মনের সহিত নিজের মনের একতা সম্পাদন করিয়া বোণ্য যুক্তাদ্বা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই রূপ উন্নত পুরুষই হৃক্ষোক্ত আদর্শ-পুরুষ।

সমষ্টি ভাব আর ব্যষ্টিভাব সম্বন্ধে আর ও গুটিকতক কথা বলা চাই। বেদান্ত মতে সমষ্টিভাবাপন্ন চৈতন্য অবিদ্যার আশ্রয়ে

ব্যক্তিভাবাপন্ন হওয়াতেই এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। ‘একমে-
বাচীতীয়ং’ এই কথার একম্ শব্দে বাহ্য অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা
হইতেই অসংখ্য সৃষ্টি হইয়াছে। এইটি বুঝিতে পারিলেই কোন্ পথে
গেলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায়, তাহা বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহা
হইলেই এই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ভূতগত ব্যক্তিভাবে প্রতীয়মান ভাব
সমূহ যে এক মাত্র ভাবেরই পরিব্যঙ্গক, সেই সমষ্টি ভাবটি কি,
তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে।

মনে কর, আমার মনে কোন একটি সুন্দর পুরুষের রূপ সম্বন্ধে
একটি ভাব আছে। আমি সেই সুন্দর পুরুষের ছবি এক খানি
বথন আঁকিতে বাট, তখন প্রথমে মূখ, পরে হাত, পরে পা ইত্যাদি
রূপে একটির পর একটি আঁকিয়া থাকি। চিত্রাঙ্কিত এই হাত পা
মূখ ইত্যাদি পরস্পর ভিন্ন হইলেও সকলেই আমার অন্তরস্থ একই
মাত্র যে একটি ভাব, সেই ভাব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সেই
আন্তরিক ভাবটি অন্তরে সমষ্টিভাবে ছিল, কিন্তু চিত্র পট হস্ত পদ
পৃথক্ পৃথক্ সময়ে অঙ্কিত হইয়া ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলা
যায়। এই জগৎ সম্বন্ধে ও সেইরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ
এক খানি চিত্রপট স্বরূপ, ঈশ্বরের অন্তরে এক মাত্র একটি ভাব
বাহ্য সদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ভাবটিই পরিদৃশ্যমান জগতে
ক্রমে ক্রমে পরিফুট হইতেছে। এই একটি মাত্র ভাব ইহাই জগৎ
সদ্ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমষ্টি ভাব। এই সমষ্টি ভাবের সহিত
যিনি নিজের আন্তরিক ভাব একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই
মহাত্মা। তিনিই যস্যোয় উন্নতি দশার প্রকৃত আদর্শ।

বৃক্ষের শাখা পত্রাদি সমূহ বীজগত যেমন একই শক্তি হইতে
উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়া ও পরস্পরের সহিত একই সম্বন্ধে

গাঁধা, সেইরূপ এই অগতঃ মহুব্য, ইতর জন্তু, উদ্ভিদ, খাতু, পিতৃগণ ও দেবগণ ও সেইরূপ একই ঐশ্বরিক ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াও একই সম্বন্ধে গাঁধা আছে। সেই সম্বন্ধটি অন্তরে অনুভব করিতে পারিলেই মানুষ আপনাকে সৰ্ব্বভূতঃ জ্ঞান করিতে সক্ষম হন।

মুখে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সমস্ত জীবই এক সূত্রে গাঁধা, কিন্তু মুখে বলা আর অন্তরে অনুভব করা এ দুইটি বড় পৃথক্। কথার জানিলাম যে সমস্ত জীবই পরস্পর এরূপ সম্বন্ধে গাঁধা যে একের সুখের উপর অন্তের সুখ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সকল জীবে দয়া প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র কথার জানিয়া নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না। অন্তরে যখন অনুভব করিতে পারিবে যে, সমস্ত বিশ্ব একই সূত্রে গাঁধা, যখন অন্তর হইতে অন্তরের মানুষ তোমাকে হিতের জন্ত প্রেরণ করিবে, তখনই জানিও যে উন্নতির সোপানে তুমি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছ। এইরূপ অন্তরের প্রেরণায় বাঁহারা অগতঃ হিতে রত হন, তাঁহারা সূখ্যাতি মান বা লজ্জা কিছুই উপর লক্ষ্য রাখেন না।

যদি ঈশ্বর কি জানিতে চাও, যদি উন্নত হইতে চাও তবে যিনি—

“সৰ্ব্বভূতঃস্বাত্মাং সৰ্ব্বভূতানি চাশ্বনি।

ঈক্ষতে যোগবুদ্ধাত্মা সৰ্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

এরূপ জনকে আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

শিক্ষক । ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বাহ্য বলিতে চাই তাহা বিশেষ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল ধর্ম উনার মত শুনিয়া গেলে আমার প্রশ্ন সার্থক হইবে না। সেট জন্ম বাহ্য বলিতেছি তাহা মন দিয়া শুন ।

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরকে নিরাকার নিগূর্ণ, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, অনন্ত, অনাদি, সত্যস্বরূপ, এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া ধ্যাত করেন। এবং ইহাও বলিয়া থাকেন যে এই ঈশ্বর আমাদের বাক্য ও মনেব অগোচর। ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ গুলির প্রয়োগ করা হয়, তাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই। প্রথমে নিরাকার শব্দটিতে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন ।

ছাত্র । বাহ্যর কোন রূপ নাই তিনিই নিরাকার। এ ভিন্ন নিরাকার শব্দের কি অর্থ কোন রূপ অর্থ আছে না কি ?

শি । রূপ ও আকার এই দুই শব্দ অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুই শব্দ একের অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে অনেক সময় অনেকে আকার কথাটির অর্থ সম্বন্ধে অনেক ভুল করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন গুণ সকল আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। বল দেখি, প্রত্যেক আকার আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় ?

ছাত্র । প্রত্যেক আকার আমাদের চক্ষুবিজ্ঞানের বিষয় ।

শি। বাহাকে দ্রব্যের বর্ণ-গুণ কহে তাহাই আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। এই বর্ণ-গুণকে দ্রব্যের রূপ বলে এবং বাহা দ্রব্যের আকার তাহাকে ও সময়ে সময়ে রূপ বলা হয়। রূপ শব্দের এই দুই প্রকার অর্থ থাকাতে অনেকে দ্রব্যের আকারকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে বাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর তাহাব বৃত্তি কোন আকার নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বায়ুর আকার আছে। এক জন জন্মান্তর, যে কখনও কোন দ্রব্যের রূপ চক্ষে দেখে নাই, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আকার সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। এই যে আমার পদ্যস্রোতি রহিয়াছে ইহার আকার গোল এবং ইহার বর্ণ লোহিত।

কোন দ্রব্যের আকার কি, এই কথাটিতে সেই দ্রব্য কিরূপ আয়তন বিশিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাই বুঝায়। কোন দ্রব্য আছে কিন্তু উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই ইহা আমবা অনুভবই কবিত্তে পারি না। এবং ঐ দ্রব্য যেরূপ সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহাকে দ্রব্যের আকার বলা যায়।

যদিও আমাদের দ্রব্য জ্ঞান ও তাহার আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান উক্ত দ্রব্যের গুণ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হওয়ারতেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু উহা কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নহে। কিরূপে দ্রব্য ও তাহার আকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমাদের অন্তরে জন্মিয়া থাকে, তাহাব বিচারে এখন প্রয়োজন নাই। যে কারণেই হউক যখনই বুঝি যে, কোন একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব আছে তখনই সেট দ্রব্য যে কোন না কোন স্থানে অবস্থিত এবং কোন না কোন পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া আছে, ইহা মনে হইবেই হইবে। স্থান ব্যাপকতা কথাটিতে যে অর্থ বুঝায় তাহা বস্তুর ধর্ম। অর্থাৎ কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই

অথচ বস্তু আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। যে দ্রব্য বেরূপ সীমাবেষ্টিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর আকার।

এখন দেখে ঈশ্বর নিরাকার এই কথায় কি অর্থ বুঝায়। ঈশ্বর কথাটিতে কোন বস্তু বুঝায়, কি কোন গুণ বুঝায়? সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কথাটিতে সর্বব্যাপী বস্তুই বুঝায়। যখন বলি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী, তখন ঈশ্বরের যে স্থান ব্যাপিকতা গুণ আছে, তাহা সকলেই গুণিবেন। এই পদ্যটি স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই জন্য উহাকে সাকার বলি কিন্তু ঈশ্বর স্থান ব্যাপিয়া আছেন অথচ তাঁহাকে নিরাকার বলি, ইহার কারণ কি?

আমরা সচরাচর সাকার এই বলিতে কি অর্থ বুঝি। যে দ্রব্য কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহাকেই সাকার বলিয়া বুঝি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ঈশ্বর কি কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছেন? এই বিশ্ব যে অনন্ত ও অসীম। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই, এই জন্যই তিনি নিরাকার।

যদি বল কল্পনার বিশ্বের একটি সীমা দিতে পারি, তবে আমি বলি যে কল্পনার একটি সীমা দিয়া একবার ভাব দেখি যে ঐ সীমার বাহিরে আর স্থান নাই। ইহা তুমি ভাবিতে পারিবে না। এই জন্যই বিশ্বের সীমা নাট, এই জন্যই ঈশ্বর নিরাকার। এখন বুঝিয়া দেখ যে বস্তু অসীম তাহাই নিরাকার। একমাত্র ঈশ্বরেরই কোন সীমা নাই, এই জন্য ঈশ্বরই নিরাকার। ঈশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তাহার সীমা আছে ইহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। এমন কোন সীমাবদ্ধ স্থান ভাবিতে পারি না বাহ্যর বাহিরে আর স্থান নাই, সুতরাং ঈশ্বর যখন বিশ্বব্যাপী, তখন তাঁহার সীমা

আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, এই জন্তই শাস্ত্রে তাঁহাকে নিরাকার বলে।

ছা। ঈশ্বর নিরাকার এই অর্থে আমি এই বুঝি যে, যন যেসকল নিরাকার বস্তু ঈশ্বর সেই অর্থে নিরাকার।

শি। যনকে যদি কোন বস্তু বিশেষ বল তবে উহা অবশ্যই কোন না কোন স্থান ব্যাপিয়া থাকিবে। যখন আমার মন তোমার মন ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন মনের কথা বল তখন একটি মন অবশ্যই কোন সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মনেরও আকার আছে বলিতে হইবে। যদি তুমি মনের স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম অস্বীকার কর, তবে যনকে আর বস্তু বলিতে পার না। তাহা হইলে যনকে কোন না কোন স্থান-ব্যাপকতা ধর্ম বিশিষ্ট বস্তুর গুণ যাত্র বলিতে হইবে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনের কোন আকার স্বীকার করেন না এবং এই জন্যই তাঁহারা যনকে আমাদের দেহস্থিত বস্তু সমষ্টির গুণ যাত্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের হিন্দুগণ দেহ ছাড়া মনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মন ভিন্ন ভিন্ন রূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে, এইরূপ কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। তুমি যে যনকে নিরাকার বস্তু বলিতেছ তাহার কারণ কি ?

ছা। মনের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই সকল গুণ নাই, এই জন্যই যনকে নিরাকার বস্তু বলি।

শি। সচরাচর যে সকল স্থূল দ্রব্যকে আমরা সাকার জ্ঞান করি তাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গুণ অসুভব দ্বারাই তাহাদের আকার জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সেই জন্ত আকার আছে বলিলেই তাহার রূপ রসাদি গুণের কোন না কোন গুণ আছে ইহা মনে হয়। কিন্তু

রূপ রসাদি যে সকল গুণ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়, মন নামক বস্তুর সে সকল গুণ নাই সূতবাৎ তাহার আকার কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যে সকল সাকার পদার্থের ঐ সকল স্থূল গুণ নাই, আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদের আকার নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মানব স্থূল ইন্দ্রিযে অভিমানী না থাকিলে তাহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূক্ষ্ম সাকার বস্তুর আকার নির্ধারণ কবিত্তে সক্ষম হন। যখন তুমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিজের বাও এবং স্বপ্ন দেখ তখন তুমি যে নানাকরূপ আকার দেখিতে পাও সে কাহাব আকার? তোমার নিজের মন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে যে আকার ধারণ করিয়া থাকে সেট সেই আকার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মে।

এখন বুঝিবা দেখে যে, মনকে কোন বস্তু বিষয়ের গুণ বলিয়া কোন বস্তু বলিলে উহার আকার আছে বলিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ সাকার বস্তু বলিলে যেসকল স্থূল সাকার বস্তু মনে হয়, মন সেসকল সাকার নহে। স্থূল বস্তু সকল স্থূল জাতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। যাহারা স্থূল বস্তু ভিন্ন অন্য কোনরূপ সূক্ষ্ম বস্তুব অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহারা মন যে এই স্থূল দেহ ছাড়া অন্য কোন বস্তু ইহাও বলিতে পারেন না।

এক্ষণে দেখ মনকে যে অর্পে নিরাকার বল, ঐশ্বরকে সে অর্পে নিরাকার বলিতে পার না মনকে বস্তু বলিলে মনকে কোন সীমাবদ্ধ বস্তু বলিতে হইবে। ঐশ্বর যে স্থান ব্যাপিয়া আছেন তাহার সীমা নাই এই জগৎ তিনি নিরাকার।

নিরাকার শব্দের অর্থ আমি যাহা বুঝিবাছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে ঐশ্বর নিগূঢ়, এই শব্দে কি অর্থ বুঝা যায় বল দেখি।

ছা। ঈশ্বর নিগূর্ণ এই কথাটির অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। বাহা হইতে এই অগতের সমস্ত পদার্থের গুণ জন্মিবাছে, তাহাকে কি কি করিয়া নিগূর্ণ বলিতে পারি।

শি। যেমন সূর্য্য কিরণের বর্ণ, যেত গীতাদি বর্ণ সকলের সমষ্টি বর্ণ, সেইরূপ এই অগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে সেই সমুদয় গুণের সমষ্টি গুণ যে একটি অসীম গুণ, তাহাই ঈশ্বরের বিশ্বরূপ কথাটির অর্থ বুঝাইব তখন সমষ্টি গুণ তাহাকে বলে তাহা বুঝাইবা দিব। ঈশ্বরের এই অসীম গুণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কোন ইঞ্জিয়েরই বিষয় হইতে পাবে না। কেননা যে গুণ সীমাবদ্ধ তাহাই ইঞ্জিয়ের বিষয় হইতে পাবে কিন্তু যে গুণ কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহা কোন ইঞ্জিয়ের বিষয় হইতে পারে না।

ছা। সীমাবদ্ধ স্থান কথাটির অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু সীমাবদ্ধ গুণ কথাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

শি। সীমা কথাটির অর্থ কি। এই দোনার বর্তুলটি একটি সীমাবদ্ধ স্থান ব্যাপিয়া আছে, যখন এই কথা বলা যায়, তখন সীমা শব্দে কি অর্থ বুঝায়। এই বর্তুলটি একটি স্থান ব্যাপিয়া আছে এবং সেই স্থানটি ছাড়া অন্য স্থান আছে। এই হুইটি স্থান যাহা দ্বারা পৃথক্ ভাবাপন্ন হইবাছে তাহাই এই বর্তুলটির সীমা। সেইরূপ যখন লোহিত বর্ণ, এই গুণ সম্বন্ধে ভাবি, তখন এই বর্ণটি লোহিত বর্ণ নয় এমন বর্ণও আছে, তাহা বুঝিয়া থাকি। বাহা লোহিত এবং যাহা লোহিত নয় এই উভয়ের প্রভেদ বিচার করিয়াই লোহিত বর্ণটি কি তাহা বুঝিতে পারি। যখনই একটি গুণকে অন্য গুণ হইতে পৃথক্ ভাবিব অমনট বলিব যে, সেই গুণটির একটি সীমা আছে।

ইঞ্জিয় দ্বারা যে সকল গুণের জ্ঞান জন্মে সে সকলেরই সীমা আছে।

ইঞ্জির গুলি একটি হইতে আর একটির প্রভেদ দেখাইয়া দেয় বলিয়াই গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে । আমাদের গুণ সম্বন্ধে যত জ্ঞান সকলই আপেক্ষিক অর্থাৎ একটি গুণের জ্ঞান অত্র গুণের উপর অপেক্ষা করে । ইংরাজিতে ইহাকে Relativity of Knowledge বলে । গুণ জ্ঞান আপেক্ষিক ; সুতরাং ইঞ্জিরের গ্রাহ্য গুণ যাত্নেরই সীমা আছে । যদি ছুঃখ কাহাকে বলে না জানিতাম তবে সুখ কাহাকে বলে বুঝিতাম না । যেখানে সুখের শেষ, সেইখান হইতে ছুঃখের সীমা আরম্ভ । যেখানে অজ্ঞানের শেষ সেইখান হইতে জ্ঞানের সীমা আরম্ভ । কিন্তু ঈশ্বরের যে গুণ আছে বলিয়াছি, তাহার সীমা নাই । সুতরাং তাহা কোন ইঞ্জিরেরই বিষয়ীভূত হইতে পারে না । এই জন্য আমরা বাহাকে সগুণ বলিয়া বুঝি ঈশ্বর তাহা নহেন । ঈশ্বর নিগুণ ।

ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই, এই কথাটির অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা চাই । কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, বারাদ্বারে সে চেষ্টা করিব ।

শি । সে দিন তোমাকে বলিয়াছি যে ঈশ্বরের গুণের সীমা নাই—এই জন্তই তাঁহাকে নিগুণ বলা হয় । কিন্তু ঈশ্বর অসীম গুণ বিশিষ্ট । এই জন্তই তিনি নিগুণ, এ কথাটি অনেকের কাছে কেমন নূতন কথা ঠেকিবে । তাহার কারণ এই—অসীম কথাটিতে সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ বুঝা যায় যে যাহার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী—যাহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই তাহাকেই অসীম বলা যায় । কিন্তু আমরা যে অসীম কথাটি ব্যবহার করিয়াছি, তাহার অর্থ এই, যে যাহার কোন বিশেষ সীমা নাই । যে গুণের এমন কোন সীমা নাই, যাহা দ্বারা তাহাকে অত্র কোন গুণ হইতে বিশেষ রূপে ভাবা যায়, তাহাই অসীম গুণ । ঈশ্বর নির্বিশেষ, এই জন্ত তিনি নিগুণ । যদি বলি যে তুমি

বড় সুন্দর—তবে এই বুঝার যে, যে গুণ থাকিলে তুমি কুৎসিত হইতে বা মাঝামাঝি রকমের শ্রী বিশিষ্ট হইতে, সেট সেই গুণ তোমাতে নাই। তোমার সৌন্দর্য্য যে গুণ তাহার সীমা রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতে যত গুণ আছে, সকলেই ঈশ্বরের একমাত্র গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং এই গুণটি তাঁহাতে আছে এবং তাহারই বিপরীত ভাবাপন্ন গুণটি তাঁহাতে নাই, একথা বলা যায় না। এই বিধে যত স্থান (Space) আছে, তত স্থান তিনি ব্যাপিয়া আছেন, এটী জ্ঞাত তিনি নিবাকার এবং এই জগতের যত গুণ আছে, সমস্তই তাঁহার এক অনীর্কচনীয় গুণের অন্তর্গত, এটী জ্ঞাত তাঁহার গুণের সীমা নাই। এই জ্ঞাত তাঁহার গুণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষমীভূত হইতে পারে না এবং এই জন্যই তিনি নিগূর্ণ।

একটি উপমা দিয়া নিগূর্ণ কথাটি বুঝাইতে চাই। আজ কাল বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহারা কিছু অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে যদি এক খণ্ড রেশম বস্ত্র দ্বারা একটি কাঁচের খণ্ডকে ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঐ কাচ ও রেশম বস্ত্রে তাড়িত শক্তির গুণ দেখা যায়। কিন্তু ঐ কাচের তাড়িত শক্তি এবং ঐ রেশমের তাড়িত শক্তি ভিন্ন প্রকার। বিজ্ঞান-বিদগণ একটির নাম পজিটিভ্ ইলেকট্রিসিটি এবং অন্যটির নাম নেগেটিভ্ ইলেকট্রিসিটি বলেন। কিন্তু তাড়িত শক্তি এই দুই ভাগ হইবার পূর্বে কাচ বা রেশমের বস্ত্র পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে তাঁহারা নিউট্রাল ইলেকট্রিসিটি বলেন। যেমন এক নিউট্রাল ইলেকট্রিসিটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া পজিটিভ ও নেগেটিভ্ দুই প্রকার তাড়িত শক্তি রূপে প্রতীয়মান হয়, সেদরূপ ঈশ্বরের এক নিগূর্ণ ভাব হইতেই জগতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সগুণ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে যে চৈতন্য গুণ বা জড় গুণ দেখিতে পাই, তাহা

ঈশ্বরের অন্তর্গত একমাত্র গুণের ব্যাটী তাহ। ঈশ্বর চেতনও নহেন, জড়ও নহেন, হিন্দুগণ তাঁহার সেই নিঃশব্দ অনবচ্ছিন্ন গুণকে চৈতন্য গুণ নাম দিয়া থাকেন। চেতন গুণ কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু এই অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য গুণ কিরূপ তাহা আমরা অন্তরে ধারণা করিতে অক্ষম।

হিন্দুগণ একস্থলে ঈশ্বরকে নিঃশব্দ, আবার অন্য স্থলে তাঁহাকে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যময় এইরূপ বলিয়াছেন দেখিয়া অনেকে উক্ত দুই বিশেষণকে বিরুদ্ধতাব বিশিষ্ট বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ঐ দুইটি বিশেষণই যে একার্থবোধক তাহা বুঝা যায়।

হা। আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে, যাহাকে আমাদের মন বলা যায় তাহা সাকার বস্তু, কিন্তু এ কথাটির অর্থ আমি ভাল কবে বুঝিতে পারি নাই।

শি। আমাদের মন যে সাকার কি নিরাকার এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা পুনরাব বলা গুন। মন এই শব্দটিতে যদি কোন বস্তু বুঝ তবেই সাকার বস্তু, আর যদি মন কথাটিতে কোন বস্তু বিশেষের গুণ বুঝ তবে সেই গুণের ত আবার কোন আকার থাকিবে না। কিন্তু সেই গুণ অবশ্য সাকার বস্তুর গুণ হইবে। হিন্দু ধর্মিগণ মনুষ্য শরীরকে পাঁচটি কোষের সমষ্টিতে নির্মিত, এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। আমাদের স্থূল দেহ যেরূপ স্থূল জীব্য গঠিত, তদপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম জীব্য গঠিত আর চারিটি কোষ উহারই মধ্যে আছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে একটির নাম মনোময় কোষ। এই মনোময় কোষ সূক্ষ্ম আকার বিশিষ্ট সূক্ষ্ম বস্তু। ইহাকেই কখন কখন মন বলা যায়, আবার কখন কখন এই কোষের গুণকে মন বলা হয়। সুতরাং হিন্দুদের মতে মন কোন সাকার বস্তু বা সাকার বস্তুর গুণ বিশেষ।

ছা। ইংরাজি মনোবিজ্ঞান সকল পাঠ কবিতা mind আর matter এই দুইএর মধ্যে matter সাকাব, mind নিরাকাব। আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা আমি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না।

শি। যাহাকে আমরা স্থূল জড় বস্তু বলি, ইংলজী matter শব্দে তাহাই বুঝায়। Mind কিন্তু স্থূল জড় বস্তু নহে, সুতরাং mind আর matter যে ভিন্নরূপ বস্তু তাহাব সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জব্যের আকার উপলব্ধি কবিতে পারি না এবং মন স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তু নহে সুতরাং মনের আকার কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আকাব কথার যাহা যথার্থ অর্থ, তাহা বুঝিলে তোমার মনে আব গোল থাকিবে না। একবার ভাবিয়া দেখ যে তোমাব মন তোমাব দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, অথচ উহা কোন স্থান ব্যাপিয়া নাই। এরূপ ধারণা তুমি কখনই কবিতে পারিবে না। মন সম্বন্ধে যে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিবে, তাহার ভাব যদি কোন রূপ ধারণা কাবতে না পার, তবে এরূপ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগের ফল নাই।

আমব মতে এই জগতে সমস্তই সাকাব, কেবল একমাত্র ঈশ্বরট নিরাকার।

ছা। যাহাকে ইংলজীতে spirit বলে এবং হিন্দু শাস্ত্রে আত্মা বলে, তাহা সাকাব কি নিরাকার ? মনকে বস্তু বলিলে মনকে যে জড় সাকাব বলিতে হয়, আত্মাকেও তাহা হইলে সেই কারণে সাকার বলিতে হয়।

শি। যাহাকে আত্মা বলা যায় তাহা অবশ্যই দেশ ব্যাপী। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ আকার নাই কেন না তোমার আত্মা ও আমার

আত্মা একই পদার্থ। এই আত্মাই ঈশ্বর এবং ইহাই একমাত্র নিরাকার পদার্থ। যেমন একখানি কাগজের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকা থাকিলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের আধার সেই একমাত্র কাগজ, সেইরূপ এই জগতে যাহা কিছু আছে দেখিতেছ, এক জগদাধার আত্মা সেই সকলেরই আধার। হিন্দুদের এই মত জানিবে। আত্মা কথটির অর্থ যে যাহা না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না তাহাই আমার আত্মা। হিন্দুগণ বিশেষ পর্যালোচনা দ্বারা স্থির করিয়া ছিলেন যে আদি কারণ ঈশ্বর আমাদের না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিত না, এই জন্তই ঈশ্বরই আত্মা জানিবে। যাহারা মনে রাখেন যে এই স্কুল দেহ না থাকিলে আর আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, তাঁহাদের পক্ষে এই স্কুল দেহই আত্মা। কিন্তু ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন এই স্কুল দেহের অভাবে ও আমার অস্তিত্ব থাকে, সুতরাং স্কুল দেহ আত্মা নহে। এমনকি সূক্ষ্ম শরীর না থাকিলেও আমার অস্তিত্ব থাকে, সেই জন্ত সূক্ষ্ম শরীর ও আত্মা নহেন। এইরূপ, আমি কে এই চিন্তার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে অনন্ত জগৎব্যাপী ঈশ্বরই আমি। সেই জন্ত ঈশ্বরকে যে অর্থে নিরাকার বলা হয়, আত্মাকেও সেই অর্থে নিরাকার বলা হয়। ক্রমে ক্রমে এই সব কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ।

শিক্ষক । এক্ষণে ঈশ্বরের ঈশ্বররূপ এই কথাটির অর্থ কি বলি শুন ।

ছাত্র । আপনি ঈশ্ববকে নিরাকার বস্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু আত্মাকে যাহাকে ইংরাজীতে Spirit বলে তাহাকে বস্তু বলা কি ঠিক সম্ভব হয ?

শি । দেখ ইংরাজীতে Matter আর Spirit এই দুই কথায় তোমার মনে যে অর্থ ধারণা হইয়াছে তাহার মধ্যে matter শব্দের অর্থ আর বস্তু শব্দের অর্থ তোমাব মনে একইরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে । ইংরাজীতে matter বলিলেই জড় পদার্থ বিশেষ, এইরূপ জ্ঞান হয়, আর spirit অর্থে যাহা জড় নহে তাহাকেই spirit বলিয়া বুঝার কিন্তু আমরা যে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিতেছি তাহার অর্থ এই যে যাহার বাস আছে, তাহাই বস্তু, ইংরাজীতে যাহাকে existence বলে, সেই existence যাহার আছে তাহারই নাম বস্তু । কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় যখনই যে কথাটি প্রয়োগ করিবে তাহার ঠিক অর্থটি কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে ভিন্ন ভিন্ন কথার ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থ পরিষ্কার রূপে না বুঝিবার দরুণ অনেক সময় বিচারে ভুল হইয়া পড়ে ।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতই উন্নত দশা প্রাপ্ত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, এই জগত যে এক মাত্র বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এইটি প্রমাণ করিবার পথে তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন

এই এক মাত্র বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির ক্রিয়া হইতেই এই জগতের ভিন্ন ভিন্ন জ্বা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্যগণ উহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সকলের মধ্যে আবাব একপ সম্বন্ধ আছে যে এক প্রকারের শক্তি অন্য প্রকার শক্তি রূপে পরিবর্তিত হইতে পারে। শক্তি সকলের এই সম্বন্ধকে তাঁহারা correlation of-energy বলিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ এই বিশ্বের আকার সম্বন্ধে যাহা বুঝেন তাহা ৩ ঐরূপ^১। তাঁহারা ও বলেন যে এষ্ট জগত কেবল মাত্র বস্তু দ্বারা গঠিত। যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ শক্তির ক্রিয়া এই জগতে দেখিতে পাট সকলেই এক মাত্র শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থা মাত্র। এবং সেই একমাত্র বস্তু, সেই এক মাত্র শক্তির বশে যে গুণ বিশিষ্ট হন তাহাই ঈশ্বরের গুণ। এই বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। এই জগতই তাঁহাকে বিশ্বরূপ কহা যায়।

হ্যায়। জগতের আদি কাংশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের যেরূপ ধারণা আছে হিন্দুদের ধারণা ও কি সেই রূপ ছিল?

শি। ঠিক সেরূপ নহে, বিস্তার প্রভেদ আছে। এই বিশ্বের সমষ্টি শক্তি যে এক এবং উহাই যে সেই আদি কাবণেব অনন্ত শক্তি ইহা উভয়েই বলিয়া থাকেন বটে কিন্তু ঐ সমষ্টি শক্তি যে কিরূপ শক্তি সে বিষয়ে মতের ঐক্য নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির তালিকার তেজ, তাড়িত, আলোক, ইত্যাদি স্থূল শক্তি ভিন্ন অল্প শক্তির উল্লেখ নাই, সেই জন্ত তাহাদের সমষ্টি শক্তি তেজ তাড়িতের দ্বার কোন রূপ শক্তি হইবে, তাঁহাদের ধারণা এই, কিন্তু হিন্দুদের শক্তির তালিকার ভিতর ঐ সকল স্থূল শক্তির সহিত

ইচ্ছা শক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি, অনুভব শক্তি ইত্যাদি চেতন শক্তি সকল ও ধরা হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মের মতে এই সমস্ত মূল শক্তিরই প্রাধান্য জগতে এত অধিক যে সমষ্টি করিতে গেলে সমষ্টি-মূল মূল জাতীয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, হিন্দুধর্মের মতে এত সমষ্টি শক্তি চেতনজাতীয়, জড়-জাতীয় নহে, এবং এই শক্তিকে তাঁহারা বিত্ত্ব চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন। এত বিত্ত্ব চৈতন্য শক্তি এক প্রকার অনির্কটনীয় শক্তি। সাধারণতঃ আমবা-যাহাকে চেতন শক্তি বলিয়া বুঝি, বিত্ত্ব চৈতন্য শক্তি সেজন্য নহে একথাটি যেন স্মরণ থাকে।

সমষ্টি শক্তি কথাটির অর্থ একটু পবিষ্কার করিয়া বুঝ। যাহা দ্বারা জ্বলন্ত অবস্থাস্থল জন্মে তাহার নাম শক্তি। তেজ (heat) এক প্রকার শক্তি কেন না উহা শীতল জ্বলকে উষ্ণ অবস্থায় লইয়া যায়। এত এক তেজ শক্তি ববফকে জলের আকারে, জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ জলীয় বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজ থাকিলে উহা বস্তুই বরফের আকারে থাকে। ঐ ববফে নিহিত শক্তিকে কঠিন শক্তি বলিতে পার। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণ তেজ থাকিলে ঐ জলীয় বস্তু তরলাকার ধারণ করে তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে তরল শক্তি নাম দাও, আরও অধিক পরিমাণ তেজ থাকিলে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় তখন উহাতে নিহিত শক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি নাম দিতে পার। যেমন তেজ নামক একই শক্তি অবস্থান্তরে কঠিন শক্তি, তরল শক্তি এবং বাষ্পীয় শক্তি নাম পাইল, সেইরূপ এই জগতে একই প্রকারের আধারে প্রযুক্ত শক্তি অবস্থান্তরে দেবশক্তি জড়শক্তি চেতনশক্তি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমষ্টি পরিমাণের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই।

এইবারে মনে কর, খানিক বরফ, খানিক জল এবং খানিক বাষ্প একত্রে মিশাইলাম, ঐ তিনটি পদার্থে যে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টি শক্তি ঐ তিনটি পদার্থে যে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী শক্তি আছে তাহাদের সমষ্টি শক্তি ঐ তিনটি অব্যাহত জলীয় বস্তুর উপর ফিরা প্রকাশ করিল। এই তিনের মিশ্রণে মিশ্রিত দ্রব্য যদি বাষ্পাকার ধারণ করে তবে ঐ সমষ্টিশক্তিকে বাষ্পীয় শক্তি বলিতে পার, যদি তরলাকার ধারণ করে তবে উহাকে তরলশক্তি বলিতে পার। সেইরূপ এই বিশ্ব যখন একাকার ধারণ করিবে, যখন বিভিন্নতা আর থাকিবে না, তখন এই বিশ্বের যে অবস্থা বিধেব সমষ্টি শক্তির তাহাই সংজ্ঞা হইবে। এই বিশ্বের শক্তিতত্ত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা বিনা কেহই বলিতে পারেন না যে, এই সমষ্টিশক্তি চেতন কি জড় কি অন্তরঙ্গ। পশ্চাত্য বিজ্ঞান, শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং পশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি এই সমষ্টি শক্তিকে জড় শক্তি বলে তবে আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুধর্মবিগণ ইহারা যোগমার্গ অবলম্বনে বিশ্বের সহিত আপনাদিগকে একতাবাপন্ন করিয়াছিলেন তাঁহারা যেস্বপ্ন বলেন তাহা কতদূর সত্য তাহা সকলের তাবিয়া দেখা কর্তব্য। হিন্দুদের মতে এই বিশ্ব জড় নহে, ইহা চেতনও নহে, ইহা বিস্তৃত চৈতন্যময়।

যদি সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধীয় ভাব সমূহ অন্তরে একেবারে যুগপৎ ভাবিতে পার তবেই ঈশ্বর কি, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। এই বিশ্বই ঈশ্বর এই জগতই তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয়। এই বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপ পদার্থে চিত্রিত দেখিতেছ কিন্তু ইহাকে অখণ্ড এক বস্তু জানিও। এই এক বস্তুই ঈশ্বর। একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ বড় গভীর। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু কি তাহা অন্তরে ধারণা করিতে চেষ্টা কর

এবং এই চেষ্টাই ঈশ্বরোপাসনা। একমেবাদ্বিতীয়ং কথাটির অর্থ বাহ্যরা একপ বুঝেন যে জগতে দেবদেবী নাই তাঁহারা উহার অর্থ কিছুই বুঝেন নাই। হিন্দুগণ ঐ বাক্যটি মহাবাক্য বলিয়া মান্ত করিয়া থাকেন। পূর্বে নিরাকার নিগূর্ণ ও বিশ্বরূপ এই তিনটি কথার যেস্বরূপ অর্থ বলিয়াছি তাহা বেশ কবিতা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যদি আমার মতের সহিত কোন বিষয়ে অনৈক্য হও তবে তাহা আমাকে বলিবে।

ছা। আপনি নিরাকার ও নিগূর্ণ কথার যেস্বরূপ অর্থ বুঝাটবাহেন তাহাতে আমার বোধ হয় যে তাহা সত্ত্ব তাহাই সাকার।

শি। আমিও হোষ্ট বুঝি যে বাহার সত্ত্ব আছে তাহার আকারও আছে। কেন না, যাগাতে কোন সীমাবদ্ধ সত্ত্ব আছে তাহা যে অসীম স্থানব্যাপী ইহা সম্ভব নয়। এই জন্ত বাহ্যব সত্ত্ব সীমাবদ্ধ তাহার আকারও সীমাবদ্ধ বুঝি। ঈশ্বরকে যদি সত্ত্ব অথচ নিরাকার বলি তবে এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না।

ছা। ঈশ্বর বিশ্বরূপ নিরাকার ও নিগূর্ণ। তাঁহার আকার ও সত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহার উপাসনা কিরূপ সম্ভবে ?

শি। বাস্তবিক নিরাকার ঈশ্বরকে আমরা ভাবিতে পারি না। ঈশ্বর মনের অগোচর এট কথ্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে তিনি মনে মনে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন তবে আমি বলি যে তিনি নিরাকার কথার অর্থ বুঝেন নাই। নিরাকার ও নিগূর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই তাহা বাব না বলিয়া সত্ত্ব ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হিন্দুশাস্ত্র উপদেশ দেয়। বেদান্ত শাস্ত্রে

উপাসনা সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে “সম্পূর্ণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস-ব্যাপারানি উপাসনানি।”

সম্পূর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে চিত্ত বশ নির্মল হইবে ততই সেই আশ্রয় উজ্জ্বল আতা অন্তরে উদ্ভিত হইবে। তখন মনের সাহায্য ব্যতিরেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে।

ছা। সম্পূর্ণ ঈশ্বর কথাটির অর্থ কি।

শি। ঈশ্বরের স্বরূপ উন্নতিব চরম সীমা। যিনি উন্নতিব চরম সীমার উপস্থিত হইয়াছেন তিনিই ঈশ্বর লীন হইয়াছেন। যিনি উন্নতির চরম সীমার উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার আর পরিবর্তন নাই।

এই উন্নত মনুষ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে দেখিতে পান এবং এই উন্নত মনুষ্য দশার চরম আদর্শ পুরুষই সম্পূর্ণ ঈশ্বর। এক মনুষ্যাক্রম আধারে সমগ্র বিশ্ব ধাঁহাতে একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে তিনিই সম্পূর্ণ ঈশ্বর। যে নিয়ম শৃঙ্খলাবশে এই বিশ্ব চালাতেছে সেই নিয়ম শৃঙ্খল ধাঁহার কার্যশৃঙ্খলে দেখা যায় তিনিই সম্পূর্ণ ঈশ্বর। তিনি মনুষ্য অথচ ঈশ্বর এই জ্ঞাত তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর। যিনি কর্ম করিয়াও নিষ্কর্ম, যিনি মনুষ্য আকার ধারণ করিয়াও অন্তরে বিশ্বরূপ, ধাঁহার আমি জ্ঞান এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বস্তিবাছে, যিনি আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করেন সেই আত্মজ্ঞানী শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষই সম্পূর্ণ ঈশ্বর। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ Man God বলিয়া যে কথাটি ব্যবহার করেন সেই Man God কথাটি, আর সম্পূর্ণ ঈশ্বর কথাটি, আমি একই অর্থবোধক জ্ঞান করি। যদি ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাগসা জন্মিয়া থাকে তবে এইরূপ উন্নত পুরুষ সম্বন্ধে অবিরামে চিন্তা কর। নিজের আমি জ্ঞান এইরূপ সূক্ষ্মতার স্তরে মিশাইতে চেষ্টা কর। ক্রমেই দেখিবে চিত্ত নির্মল

হইতেছে আর কোথা হইতে কে যেন তোমাকে ক্রমে ক্রমে পথ দেখাইবা দিতেছে। হিন্দুশাস্ত্র যতটুকু আলোচনা করিবে ততই দেখিবে যে এইরূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান পিপাসু চিত্তের একমাত্র অবশ্যস্বীকার্য অমূল্য ধন।' এই চিত্তের বশে উক্ত উপাসকের চিত্ত উদ্ধ হইয়া ক্রমেই আত্মজ্ঞান জন্মিবে। তিনি ক্রমেই বুঝিতে পারিবেন ঈশ্বরের স্বরূপ কি।

— — —

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

হা। আপনি ঈশ্বরের স্বরূপ কি ইহা বুঝাইবার জন্য যে মনো বিজ্ঞানের কথাটিতে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন বড় বুদ্ধিতে পাবিতেছি না এবং সেই কচকচিব মধ্যে প্রবেশ করা বড় দুক্ল হ বোধ হইতেছে।

শি। দেখ, মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ না করিলে ঈশ্বর কি এবং তিন্মুখ্যই বা কি তাহা সবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। বেদান্ত, সংখ্যা এবং যোগশাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিবে না। সেই জন্য ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর কথাটি তে কি অর্থ বুঝায় তাহা তোমাকে কতক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। খ্রীষ্টিয়ানদের God আর আমাদের ঈশ্বর এই দুইটি কথার একই রূপ নহে। খ্রীষ্টিয়ানরা গির্জায় গিয়া যেকপ প্রার্থনা করাকে ঈশ্বরোপাসনা বলেন হিন্দুধর্মে তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে। খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবেচনায় জগতের আদি কারণ ঈশ্বর একজন মহান ব্যক্তির জ্ঞান, জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে অবস্থিতি করিয়া জগতের কাজ কর্ম পর্যালোচনা করিতেছেন। কে কখন কি কার্য্য করিতেছে তাহা সদাই উঁকি ঝুঁকি য়া়িতেছেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে জগৎ কারণ ঈশ্বর এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন স্থলে বাস করেন না। এই জগতই হিন্দুদের মতে অনন্ত অনাদি এবং বিভক্ত চৈতন্যময়। হিন্দুদের মতে

তির তির রূপ পরিদৃশ্যমান এই জগতের সমষ্টিভাব সদাই এক। এই একই ঈশ্বর ইনি নিগূঢ়, নিরাকার এবং সচ্চিদানন্দ। এই এক-মেবাদ্বিতীয়ং পুরুষের মহিমা হইতেই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে, সেই নিয়মের বশেই মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মফলস্বরূপে ফল ভোগ করিতেছে। খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর এই জগৎ রূপ রাজ্যের কাজ কর্ম্ম লইয়া সদাই ব্যস্ত, হিন্দুদের ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন কূটস্থপুরুষ। এই কূটস্থ পুরুষের বিশ্বরাজ্য অনন্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মেব ফলে চলিতেছে, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিবে না, সুতরাং ঈশ্বর যে এই জগতের জমীদারী লইয়া সদাই ব্যস্ত আছেন ইহা হিন্দুরা কল্পনাতেও জানিতে পারেন না। যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ ফল পাইবে এ নিয়মের লঙ্ঘন কখনই হইবে না, তবে পুণ্যবানকে পুণ্যের ফল আর পাপীকে পাপের ফল দিবার জন্য ঈশ্বর কেন সদাই ব্যস্ত থাকিবেন তাহা হিন্দুরা বুঝিতে পারেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে মনুষ্যের কর্ম্মই শুভাশুভ ফল-প্রদাতা এবং এটী হাজার সত্ত্ব শক্তিই হিন্দুদিগের দেব দেবী। একথা তোমাকে পরে বুঝাইব। এক্ষণে দেখ, ঈশ্বর কথাকাটাতে খ্রীষ্টানবা যেকপ অর্থ বুঝেন আর হিন্দুরা যেকপ অর্থ বুঝেন উভয়ে কত প্রভেদ এই প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে গেলেই মনোবিজ্ঞানের কচকচিতে প্রবেশ করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের কচকচির মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ঈশ্বর তব যদি বুঝা যাইত তবে কপিলদেব কঠিনটে সাংখ্যশাস্ত্র বা ব্যাসদেব বেদান্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অনর্থক অমাদের মাথা ঘুতাইবার বল প্রস্তুত করিয়া যাইতেন না।

বেদান্ত, সাংখ্য ও বোগশাস্ত্র সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিচ্ছি তাহাই তোমাকে জন্মে জন্মে বালাতে ইচ্ছা করি।

বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম, সাংখ্যের নিগুণ পুরুষ আর যোগ শাস্ত্রের নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা গন্তব্য পদার্থই এই জগতের আদি কাবণ । সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত নিত্যসুখ, নির্ৰূপ সুখ পাওয়া যায় না । দেবদেবীর উপাসনার কোন কোন শুভফল পাওয়া যায় ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত নিত্যসুখ পাওয়া যায় না । সেই জন্তই দেব দেবীর উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার কাছে অধম উপাসনা । ত্রিষ্টয়ানুগত ঐহিক বা পারত্রিক সুখ কামনায় যেকোন প্রার্থনা করাকে ব্রহ্মোপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনা বলেন, সেইরূপ সকাম উপাসনা দ্বারা, উপাসকের কন্মাত্মাধারী কন্ম ফলপ্রদ শক্তি অর্থাৎ কোন কন্মাত্মক দেব দেবীর সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওরূপ সকাম উপাসনায় মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার বখনও সম্ভবে না । সেই জন্তই উহাদেঃ সকাম উপাসনা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মজ্ঞের কাছে দেব দেবীর উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে । বেদের সকাম কন্মকাণ্ড দেব দেবীর উপাসনা, কেননা বেদোক্ত কন্মদ্বারা কামনা-সিদ্ধি-দাতা কন্মাত্মক শক্তির সাহায্য লাভ হয় । ঐ সকল কন্মাত্মক শক্তিই দেব দেবী, ইহা তোমাকে পূর্বেই বলিযাছি । এই জন্তই বেদোক্ত কন্মকাণ্ডাত্মক দেব দেবীর উপাসনা অধম উপাসনা । এই জন্তই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিযাছেন যে—

যামিমাং পুন্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ । নান্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপর্য্যঃ জন্মকন্ম ফলপ্রদাং

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রেতি ॥

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তযাপহৃতচেতসাং ।

ব্যবসায়ান্বিতা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিদ্যতে ॥

দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা ভোগৈশ্বর্য লাভ হয় এবং সেই ভোগৈশ্বর্য লাভে মুক্ত জনের ব্যবসায়িত্বকা বুদ্ধি জন্মে না। এবং সেই জন্ম তাহারা সমাধি সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে। এই জন্মই ব্রহ্ম উপাসকের পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা অর্থ উপাসনা। একাগ্রচিত্তে যে যেকণ কামনা করে তাহা একাগ্রতা নিবন্ধন সে সেই কামনামুযায়ী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য কামনা থাকিলে ভোগৈশ্বর্য-কল-প্রদা শক্তি অর্থাৎ দেব দেবীর সাহায্য পাইবে, আব যদি নিষ্কাম হও অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কামনা না থাকে তবে নিঃশ্রুতিবিগ্ৰহাৎ শক্তি ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষ্য-কাব পাইবে। সকাম কন্দট দেব দেবীর উপাসনা এবং নিষ্কাম কন্দট ঈশ্ববোপাসনা জানিও। নিবাকার ঈশ্ববোপাসক নামে ধ্যাত খাঁষ্ট ধর্মাবশম্বীদেব সকাম উপাসনা বাস্তবিক সত্ত্ব ও সাকার দেব দেবীর উপাসনা।

আমি তোমাকে পূর্বে ঈশ্বর নিরাকার নিঃশ্রুতি ও বিশ্বরূপ এট কথটি কথার যে অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহাও কারণ এট যে আজকাল অনেকে প্রকৃত পক্ষে দেব দেবী উপাসনা করিয়া যথার্থ নিবাকার ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া পবিচিত হইয়া থাকেন। যাহা আমাদের স্থল দর্শনেপ্রেমের অতীত তাহাই নাম যদি নিবাকার হয় তবে দেব দেবী ও নিবাকার। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে যাহা অনন্ত তাহাই কেবল নিরাকার। অনন্ত শক্তির আধার পদার্থই নিরাকার আর শান্ত শক্তির আধার পদার্থই সাকার। দেব দেবীগণ শান্তশক্তি বিশিষ্ট এই জন্ম তাঁহাদের উপাসনাও তাঁহাদের সাহায্যে অনন্ত সুখ পাওয়া কখনই সম্ভব নয়, এই জন্মই নিরাকার অর্থাৎ অনন্ত শক্তির আধার সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তির

উপাসনা ব্যতীত অনন্ত যুক্তি সূত্র কেহ কখন পাইতে সমর্থ হন না। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা তোমায় বলি শুন। যিনি যুক্তি কামনা করিয়া একাগ্রচিত্ত, শমন্যাদি গুণে অলঙ্কৃত, এবং কোন বিষয় সূত্র কামনা রহিত তিনি যে শক্তির সাহায্যে অনন্ত আনন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। এই অনন্ত জগৎ এই ব্রহ্মশক্তির আধার এবং এই অনন্ত ব্রহ্মশক্তি বিশিষ্ট অনন্ত জগৎই ঈশ্বর। যিনি এই ঐশ্বরিক শক্তি অন্তর অন্বেষণ করিতে পারিয়াছেন তিনি আপনাকে অনন্ত সত্যবিশিষ্ট পূর্ণজ্ঞানী এবং সদানন্দস্বরূপ বুঝিয়াছেন এই জগৎ ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ছা। আপনি বলিয়াছেন যে কর্ম্মাত্মক শক্তির নামই দেব দেবী, এ কথাটির অর্থ কি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

শি। প্রথমে কর্ম্ম কথাটিতে হিন্দুশাস্ত্রে কি অর্থ বুঝায় তাহা বলি শুন। যাহা কবা যায় তাহারই নাম কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িলাম ইহা একটি কর্ম্ম। আমি হাত নাড়িবাব ইচ্ছা করিলাম কিন্তু হাত নাড়িলাম না ইহাও একটি কর্ম্ম। আমার হাত নাড়া কর্ম্মটি স্থূল জাতীয় এবং হাত নাড়িবার ইচ্ছা করা কর্ম্মটি সূক্ষ্মজাতীয়। যখন হাত নাড়িলাম, যে শক্তির ব্যয় হইল তখন সেই স্থূলজাতীয় শক্তির ক্রিয়া স্থূল জগতে প্রকটিত হয় অর্থাৎ সেই শক্তি তাড়িত বা তেজ বা অস্ত্র কোন আকার ধারণ করিয়া থাকে। আর যখন কেবল মাত্র হাত নাড়িবার ইচ্ছা করিলাম তখন কি আমি কোন শক্তির ব্যয় করিলাম না? হিন্দুদের মতে দৈহিক অঙ্গচালনাদি কর্ম্ম দ্বারা যেমন শক্তির ব্যয় করা হয়, মানসিক কর্ম্ম সকলেও সেইরূপ শক্তির ব্যয় হইয়া থাকে। এই শক্তি স্থূল জগতে তাড়িত তেজ প্রভৃতি রূপে তখনই

পরিবর্তিত হইয়া প্রকটিত হয় না বটে, কিন্তু হৃদয়গত হৃদয়াকারে উহা প্রকাশ পায়।

যেমন একটি বীজ ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি নিবন্ধন ক্ষেত্রেই সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে উহা ক্রমে বৃদ্ধক্ৰমে পরিণত হইয়া ফলশায়ী হয়, আত্মাদেব মানসিক চিন্তা বল্লনা বা ইচ্ছা প্রমুখ শক্তিও সেইরূপ হৃদয় জগতের ক্ষেত্রে বীজরূপে নিহত হয়। ঐ বীজ যে জাতীয় সেই জাতীয় শক্তির সাহায্যে ক্রমে ফল উৎপাদন করে। হৃদয় জাতীয় যে রূপ শক্তির সাহায্যে মানসিক কর্ম সকল হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেব শক্তি। এবং এই মানসিক কর্মকেই সাধাবশতঃ হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম বলা যায়। চিন্তার একাগ্রতা হইতে যে কর্মরূপ বীজ উৎপন্ন হয় সেই বীজ বেনী তেজস্বী হয় এবং উহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। হৃদয় জাতীয় যে প্রাকৃতিক শক্তির বশে মানস ব্যাপাররূপ বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই নাম দেবশক্তি ইহা তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক এক্ষণে কোন শক্তি জগতে আছে কিনা সে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ ভঞ্জন জন্য হিন্দু ঋষিগণের দোহাই না দিয়া আমি তোমাকে পাশ্চাত্যগণের মেসমেরিজম সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আনাদিগের ইচ্ছা শক্তিতে আমরা যেমন আপনাদেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে পারি সেইরূপ একজনকে মেসমেরাইজ কবিয়া আমার ইচ্ছার বশে তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করা যায়। ইহাতে এই প্রমাণ করা যায় যে আমার ইচ্ছাপ্রমুখ হৃদয়জাতীয় শক্তি আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া তাহার ফলে অপরের স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করাইতে সক্ষম হইল। সুতরাং আমার বাহিবে অবশ্যই এমন ক্ষেত্র আছে বলিতে হইবে

যাহাতে আমার ইচ্ছাজনিত শক্তি প্রযুক্ত হইয়া ক্রমে তাহার ফলে অপরের অঙ্গ সঞ্চালিত করিল। যে ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছাশক্তি উহা অল্প জনেব অঙ্গচালনক্ষম শক্তিতে পবিণত হইতে পাবে তাহাকে পাশ্চাত্যগণের কথায় Animal magnetic fluid বলা যায়। এই রূপ সূত্র পদার্থে ব্যাপ্ত ক্ষেত্রই হিন্দুদের মতে দেবশক্তির আধার। এবং এইরূপ ক্ষেত্রাত্মকবস্তু যে শক্তির বশে মনুষ্যেব কোন মানসিক কর্মরূপ বীজ হইতে ক্রমে কর্মফল জন্মে তাহাই দেবশক্তি অর্থাৎ যাহাবা কর্মফল প্রদাতা তাহাবাষ্ট দেবতা।

যেমন সূর্য জগতে তেজ, তাড়িত আদি নানাক্রম ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে সেইরূপ সূর্যজগতেও দেবশক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই জগতই হিন্দুদের দেব দেবী সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেব। এই জগতই কোন একটি দেব সসীম শক্তিবিশিষ্ট ও সাকার। এট জগতই কোন দেব দেবীর সাহায্যে অনন্তকাল স্থায়ী শুভফল পাওয়া সম্ভব নহে। এই জগতই স্বর্গ-সুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ দেবদেবীর সাহায্যে পাওয়া যায় তাহাও অনিত্য এবং মুমুকুশ বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্যই বেদের সকাম কন্ম-কাণ্ড মুমুকুশ কাছে অধম উপাসনা।

সকাম মানসব্যাপার আব কোন না কোন দেব দেবীর উপাসনা একই কথা। সকাম মানসব্যাপারে রত মনুষ্য অজ্ঞাতসারে দেব-শক্তির অর্জুনা করিতেছে। এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া নিত্যানুধদাতা নিত্য পদার্থের অর্জুনা কবিত্তে ভুলিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন কোন না কোন দেব দেবীর অর্জনায আসক্ত হইয়া মাহুষে নিত্যানুধ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। এক এবং অধিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই হিন্দুধর্মের সার কথা। তবে যে হিন্দুগণে দেব দেবীর উপাসনার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার কারণ শ্রীরক্ষ ভগবদগীতায় সুস্পষ্ট

বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেদের কৰ্মকাণ্ড যাহা দেব দেবীর উপাসনা তাহা একেবারে নিস্প্রযোজনীয় মহে, ফল-কামনা রহিত হইয়া কেবল যাত্রা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম করা যায় তাহা জীবের বন্ধের কারণ হয় না। অর্থাৎ উহা আপাত পক্ষে দেব দেবীর অর্চনা হইলেও কামনা শূন্যতা নিবন্ধন উহা স্বার্থ ঈশ্বরোপাসনা।

যখন একজন মনুষ্য অন্যলোকের উপাসনা করে তখন তাহার উদ্দেশ্য সেই উপাস্য লোকের নিকট হইতে কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া। সেইরূপ কোন দেবশক্তি সাহায্য লাভের জন্য যাহা করা যায় তাহার নাম দেব উপাসনা। আর সেই একমেবাদ্বিতীয় অনন্ত পুরুষের অনন্ত শক্তি যাহা এই সমগ্র জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তির সমষ্টি-শক্তি সেই শক্তির সাহায্য পাইবার প্রদাসবেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। যিনি ঐশ্বরিক বা পাবিত্রিক কোন ফল কামনা করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি হাজার কেন ভক্তিতাবেই ডাকুন না ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য তিনি পাইবেন না। তাঁহার প্রার্থনার ফল ফলিবে না। একথা আমি বলি না, কেন না একান্ত একাগ্রতার সহিত সেই ফললাভের কামনা থাকায় ভক্তিবৃত্তির উদ্বেগের সহিত যে মানস ব্যাপার রূপ কৰ্ম তিনি স্বজন করিলেন, সেই জাতীয় কৰ্মের ফল প্রদানকর দেবশক্তির সাহায্য তিনি পাইবেন। একরূপ স্কাইম উপাসক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ডাকিয়া দেব শক্তির সাহায্যে কোন ফল পাইলে সহজেই এরূপ ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, যিনি মনে করেন তিনি বুকি ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পাইয়াছেন। এইরূপে অনেক স্থলে আমাদের স্থূল চক্ষুর অগোচর কোন দৈব শক্তিকেই ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়ার মাত্র যে অজ্ঞানে পতিত হয় তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড় দুঃস্থ হইয়া উঠে। এইরূপ উপাসক দ্বারা ঈশ্বরের

মাহাত্ম্যের বস্তু ধর্ম করা হয় সাকার দেবদেবীর উপাসক দ্বারা তাহা হয় না। রাজসাক্ষ্য করিতে গিয়া দ্বারবান দ্বারা কোনরূপ অনুগৃহীত হইয়া দ্বারবানকেই রাজ্য জ্ঞান করা যে বড় ভ্রম ইহা তোমাকে আর বেশী বলিতে হইবে না।

সকাম উপাসক কেন ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য পায় না তাহার কারণ কি বলি শুন। যদি দুইটি বেহালা একসূত্রে বাঁধিয়া বাধে, তার একটি বাজাইলে অন্যটি বাজিয়া উঠে, একতানে না বাঁধিলে অমনটি ঘটে না। লোহা চুম্বকেব কাছে থাকিয়া চৌদুক গুণ বিশিষ্ট হয় তাই চুম্বকের ও লৌহের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি দেখা যায়। তোমার মানসিক শক্তির সুর যে প্রকারের হইবে তুমি সেই প্রকারের দেব-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদি তোমার আন্তরিক ভাব সকাম হয় তবে তুমি কামকপী দেবশক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তির সাহায্য পাইবে না। আর যদি নিষ্কাম হও যদি মুমুক্শুত্ব অর্থাৎ আমার মোক্ষ হউক এই দৃঢ় ইচ্ছা অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে অনন্ত শক্তি মোক্ষ-দেবতা তাহারই সাহায্য পাইবে। ঈশ্বর নিরাকার, নিগুণ, বিশ্ব-ব্যাপী, সদানন্দ। যখন নিজেকে ঐরূপ সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা অন্তরে উদ্ভিত করিতে পারিবে, যখন নিরাকারোন্মি, নির্লীকাবেন্মি, নিগুণোন্মি, সদানন্দোন্মি ইহা বুঝিবার চেষ্টা হইবে, যখন নিজের অহংজ্ঞানের সূত্রে সহিত বিশ্বের আত্মার সুর মিলাইবার একান্ত বাসনা জন্মিবে, তখনই তুমি ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির সাহায্য লাভের অধিকারী হইবে। ঈশ্বর নিষ্কাম সূতরাং তুমিও নিষ্কাম না হইলে ঐশ্বরিক সুর বাজিবে না। ঈশ্বরের নাম করিয়া সকাম উপাসনা গুলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে দেব দেবীর উপাসনা করিব আর বলিব ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি ইহা

অপেক্ষা দ্রাস্তি আর কি হইতে পারে? খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা এইখানেই দেখিতে পাইবে। হিন্দুধর্ম মতে সাকাম উপাসনা অথবা উপাসনা, তথাপি যদি কোন হিন্দু কোন সাকাম উপাসনা করেন তাহা দেব দেবীর সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। ঐশ্বরিক শক্তির ভাব আর কামদায়িনী শক্তির ভাব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহারা কখনও ভুলেন না। হিন্দুগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে মোক্ষ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। নিত্য পদার্থ ঈশ্বর নিত্য-ফল মোক্ষমুখ ভিন্ন অন্য ফল প্রদান করিতে জানেন না। অনিত্য দেব দেবীগণ যত্নব্যয়ে অনিত্য সুখ প্রদান করিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখে, অতএব সতত সাবধান থাকিও অনিত্য দেব দেবীগণ যে সুখ দিতে সক্ষম তাহাতে সন্দেহ হইয়া নিত্য সুখের পথে অগ্রসর হইতে ভুলিও না।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা এইবারে অল্পকণায় বলি শুন। মানবাত্মার সুর বাহার সুরের সহিত মিলাইতে পাবিলে মানব নিত্য সুখ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন তিনিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরে যোগ যুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন এবং আপনাতে সর্বভূতস্থ দেখেন, ইহা বৃক্ষোক্তি। অর্থাৎ সমগ্র জগতের সমষ্টি-শক্তির যে সুর, ঈশ্বরে যুক্তাত্মা পুরুষও সেই সুরে বাঁধা। সেই জন্য এই সমগ্র জগতকে অধঃ এবং একমেবম্বিতীয়া ভাবিয়া ইহাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও।

ছা। আপনি আজ যাহা বলিলেন তাহা কি কি বিষয়ে বলিলেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখি। ১ম। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। ২য়। খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরকে যে রূপ শুভাশুভ ফল প্রদাতা মহান ব্যক্তি বিশেষ জ্ঞান করেন, বেদান্ত সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর সে রূপ নহেন। ৩য়। সগুণ দেব

দেবীই ঐহিক বা পারত্রিক ফল বিধাতা। ৪র্থ। সাকাম উপাসনা দ্বারা ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য কোন ক্রমে পাওয়া যায় না, সাকাম উপাসনা কামনামুযায়ী দেব-দেবীর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে, ঈশ্বরের ধারেও যাইতে পারেনা, সেট জন্ত সাকাম উপাসকের পক্ষে কোন বিশেষ দেব বা দেবীর উপাসনা বরং ভাল কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি মনে জানিয়া কোন সাকাম উপাসনায় অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িতে হয়। ৫ম। শম-দমাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া, মোক্ষ কামনায় ঐহিক বা পারত্রিক শুভফলে বীতবাগ হইয়া, যে নিকাম উপাসনা তাহাই নিরাকাবেয় উপাসনা। ৬ষ্ঠ। নিকাম হইয়া, কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া, শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ডের আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ কোন দেব-দেবীর অর্চনা, যদি মোক্ষলাভার্থে অর্থাৎ ঈশ্বরের তত্ত্ব অগন্ত হইবার জন্ত কবা যায় তবে তাহাও ঈশ্ববোপাসনা। ৭ম। ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে সাকার দেব-দেবী বিষয়ক চিন্তা ঈশ্ববোপাসনা, কিন্তু ফল কামনা করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের ত্রোত্রপাঠ প্রকৃত পক্ষে দেব-দেবীর উপাসনা। ৮ম। যুমুজু সাধক যে শক্তির সাহায্যে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন তাহাই ঐশ্বরিক শক্তি। ইহাই লগতের সমষ্টি-শক্তি এবং জগদাধারে প্রযুক্ত সেই সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বব। ৯ম। মনুষ্যের মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বেকপ শক্তির অধীনে পরে ফলপ্রদ হয় সেই, স্বল্পজাতীয় শক্তিই দেবশক্তি। ১০ম। সাকাম উপাসনা মাত্রেই দেব-দেবীর উপাসনা, আর নিকাম উপাসনাই মোক্ষদাযিনী ঈশ্ববোপাসনা।

আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তাহা এই যে আপনি দেব-দেবীকে কর্মাত্মক কর্মফলপ্রদ স্বল্পজাতীয় শক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। তাড়িত তেজ ম্যাগনেটিজম্ ইত্যাদির জ্ঞায় ঐ স্বল্পজাতীয়

শক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেই জন্ত প্রত্যেকের গুণ সীমাবদ্ধ, সেই জন্তই সত্ত্ব ও সেইজন্তই সাকার। আপনি সাকার কথার যেরূপ অর্থ বলিয়াছেন সে অর্থে উহা বা সাকার বটে, কিন্তু মনে করুন এই কালীদেবীর যেরূপ রূপ চিত্রিত হয় ওরূপ রূপ কি কাহারও আছে ?

শি। তুমি স্বপ্নে নানারূপ আকার দেখিয়া থাক। কিন্তু বল দেখি তোমার দৃষ্ট আকারের কারণ কি ? স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীর সঙ্কল্পীয় জ্ঞান মনুষ্যের কমিয়া যাব সেই সময় মাতৃবের নিজের মানসিক অবস্থারূপে যেমন পরিবর্তন হইতে থাকে তেমনই নানারূপ আকার দেখিতেছি এই জ্ঞান হয়। মন বড় চঞ্চল এইজন্য ঐ সকল আবার ক্ষণস্থায়ী। যদি কোন বাহ্যিকের শক্তিবলে মনের অবস্থার স্থানিকরূপ একইরূপ থাকে তবে ততক্ষণ ধরিয়া ঐ আকার সমুদ্রে রহিয়াছে বোধ হইবে। যে শক্তি স্থূলদেহস্থ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মনের অবস্থাস্তর কবিত্তে পারে তাহাবট নাম সূক্ষ্ম-জাতীয় শক্তি। হিন্দুসাধক সকল দেব-দেবীর চিত্রায় তন্ময় হইয়া এক প্রকার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায়, (Trance state) থাকিতেন। এই অবস্থায় তাঁহাদেব আত্যাত্মবিক জ্ঞান বেশ আছে কিন্তু স্থূল শরীর বা স্থূলজাতীয় জ্ঞান থাকিত না। মেসমেরাইজ করিলে লোকে যেমন অস্তরে জাগ্রত এবং বাহ্যে নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এ সেইরূপ অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের মন তাঁহার কামনা ও কর্ম অনুযায়ী সূক্ষ্মশক্তির সহিত একতানে অবস্থাত করে। এবং তাঁহার মনের অবস্থানুযায়ী রূপ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হয়। ইহাই কোন দেব-দেবীর রূপ। এ সব কথা আর একদিন বুঝাইব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সাকার নিরাকার উপাসনা ।

ছাত্র । মহাশয় আপনি পূর্বে ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি যে সাধারণ জনের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রযুক্ত ।

শিক্ষক । সাকার উপাসনা অর্থে যদি দেব-দেবীর উপাসনা বুদ্ধ তবে আমি সাকার উপাসনার বিরোধী কিন্তু সাকারের আরাধনার সাহায্যে যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহাকে যদি সাকার উপাসনা বল তবে আমি তাহারই পক্ষপাতী । ঈশ্বরতত্ত্ব পণ্ডিতগণ সাকার উপাসনা দেব-দেবীর অর্থে উপাসনা বুঝিতেন । ঈশ্বরতত্ত্ব পণ্ডিতমাত্রেই দেব-দেবীর উপাসনার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন , দেব-দেবীর উপাসনা ঈশ্বর পদ লাভে ব্যাঘাত স্বরূপ । আজকাল যে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া ঝগড়া দেখিতেছি, ঈশ্বরতত্ত্ব মহাত্মাদের ঐক্য উক্তিই ঝগড়ার মূল । তাঁহারা কি অর্থে সাকার উপাসনা নিন্দনীর বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঠিক না, বুঝিতে পারাই এই ঝগড়ার গোড়া । যখন সমাজ সেই ঈশ্বর তত্ত্ব পণ্ডিতদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবে তখন ঝগড়া মিটিয়া যাইবে ।

ঈশ্বর তত্ত্ব পণ্ডিতদের উপদেশ এই যে, সাকার অর্থাৎ দেব দেবীর উপাসনা কখন করিও না কেন না উহা দ্বারা শান্তি সুখ মিলে না , দেব দেবীর উপাসনার দ্বারা দেব দেবীর চক্রে পড়িয়া ঘুরিতে হয় ,

তবে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার জন্ত স্থল বিশেষে দেব দেবীর আবাধনা করা কর্তব্য।

ছা। আপনি এ কি গোলমালে কথা कहিলেন ইহার মর্থ ত বুঝিতে পাবিলাম না। ‘দেব দেবীর উপাসনা’ আব ‘দেব দেবীর আরাধনা’ এই দুইটি কথার কি অর্থ যোজনা করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পাবিলাম না।

শি। উপাসনার প্রধান অঙ্গ উপাস্ত পদার্থে ভক্তি, উপাস্ত পদার্থেব সহিত সম্পূর্ণ রূপে এক হইয়া বাইয়াব চেষ্টার নাম উপাসনা। উপাস্য পদার্থে ভক্তিস্থাপন পূর্বক আপনাহারা হইবার চেষ্টার নাম উপাসনা। আব আরাধনা কথাটির অর্থ সন্তুষ্ট করা। আরাধনায় আপনাহারা হইতে হয়না। উপাস্য দেব যে দিকে লইয়া যাইবেন আমি সেই দিকে চলিব ঐরূপ ভাব সংস্থাপনের চেষ্টাব নাম উপাসনা, কিন্তু আমার অতিপ্রায় অনুযায়ী কন্ঠে দেব দেবীকে অননুষ্ঠ কবিবার জন্ত, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার নাম দেব দেবীর আরাধনা। ঈশ্বরোপাসক, দেব দেবীর চক্রে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আপনাহারা হইতে চান না। এক ঈশ্বর ভিন্ন, আর কাহার ও জন্ত আপনাহারা হইও না, ইহাই ঈশ্বর তত্ত্ব পণ্ডিতগণ, ঈশ্বরীশ্বেতী জনকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহানির্লান তত্ত্বের শেষভাগ এই—

কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা—

নির্লান যুক্তি প্রার্থী ব্রহ্মোপাসক প্রযোজন অনুসারে কালীর আরাধনায় কোন হানি দেখেন না, কিন্তু কালীতে তিনি আপনাহারা হইতে চান না, কালীকে নিজের বশে আনিতে চান। দেব দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহাদের অধীন হওয়ার নাম দেব দেবীর উপাসনা আর নিজের ওপের সৌন্দর্য্যে দেব দেবীকে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের বশে আনার নাম দেব দেবীর আরাধনা। তাহা

বুঝিলে দেব দেবীর উপাসনা কি কুফল তাহা বুঝিতে পাবিবে । হিন্দুধর্ম রহস্য বড় গভীর সূত্রবাং ধর্ম রহস্য সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া মিছা গল্পগোলা করা কাহাবও উচিত নহে । শ্রীরক্ষ ভগবৎসীতাব ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যে সবল উপদেশ দিবাছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত হিন্দুধর্মাত্মসাবে দেব দেবীর উপাসনা মিস্ত্রনীয়, বিস্ত্র স্থল বিশেষে দেব দেবীর আবাধনা প্রযোজনীয় । হিন্দু ধর্মের এই রহস্য টুকু সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানি তে না ।

দেব আবাধনা ক্রবাব নাম যজ্ঞ । বেদেব কর্মকাণ্ড দেব দেবীর আবাধনা । এই যজ্ঞ সম্বন্ধে মহায়া শ্রীরক্ষ এই কথা বলিয়াছেন । সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ । অনেন প্রসবিবাত্ত্বমেধ বোত্তিষ্ঠকাধুক্ ॥

ইষ্টান্ ভোপান্ হিবে দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিত্যাঃ ।

তৈর্দত্তা ন প্রদাট্যন্তো যো ভুংক্তে স্তেন এব সং ॥

দেবতাদিগকে যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে তাহাবা দাসেব জ্ঞাব ইষ্ট ভোগ্য সকল দান করিরা থাকে । সূত্রবাং দেবতাদিগকে যিনি যজ্ঞ দ্বাবা সন্তুষ্ট না করেন তিনি চোব ।*

* দেব দেবী অর্থে আমি এই বুঝি যে, কর্ম ফলপ্রদ শক্তির নামই দেব দেবী । জানী শ্রেষ্ঠ একজন বলিয়াছেন—Every thought of man upon being evolved passes in the inner world and there coalescing with an elemental becomes an active entity এই active entityরাই দেব দেবী । শক্তি দুই

ছা। মহাশয়, ঈশ্ববোপাসকের কাছে বেদেব কর্ম কাণ্ড প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় সে কথা এখন ছাডিয়া দিয়া সাকার উপাসনা ও নিরাকার উপাসনা লইয়া বিবাদ সম্বন্ধে বাহা বলিবাব' আছে তাহাই প্রথমে শুনিতে চাই।

শি। আমি বাহা বলিতেছি তাহা ঐ বিবাদ সম্বন্ধেই বলিতেছি। ঐ বিবাদেব গোড়াটা কোষায় সেটাত আগে খুঁজিবা দেখা চাই। বেদের কর্ম কাণ্ড আর উপনিষৎ ভাগ লইয়া যে বিবাদ সেই বিবাদই, এই বিবাদের গোড়া। কেহ বলেন কর্মকাণ্ড দ্বাবা (বৌদ্ধমত) ঈশ্বর প্রকারে বিতৰ্ক হইতে পারে, দৃষ্ট শক্তি এবং অদৃষ্ট শক্তি। অদৃষ্ট শক্তিই দেব শক্তি।

এই খানে আব একটি কথা উঠিতে পাবে, দেবতা বলিতে ভাল শক্তিকেই বুঝায় কিনা? দেবতা কথায় ভাল শক্তিকে বুঝায় কি মন্দ শক্তিকে বুঝায় সে বিষয়ে আমি এই বলি, যে দেবতার বাস্তবিক ভাল মন্দ কিছুই নহে। যাহুদের চিন্তার রূপ অনুসারে দেবতাদের ভাল বা মন্দ বলা যায়, যেমন এক তাড়িৎ শক্তি কখন বা ভাল কাজের জন্য কখনও বা মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কালী শক্তি ঈশ্বরেরও দেবতা, এবং তাত্ত্বিক যুয়ুয় যোগদেরও, আর Forces in the astial light অর্থাৎ স্থল জাতীয শক্তি যাত্রেয়ই সাধারণ নাম দেব, সেই জন্য দেব ও অনুর কথার অর্থ—হিন্দু ও পারসীকদের মধ্যে উন্টা হইয়া গিয়াছে। এই স্থল শক্তি সকল নানা ভাবে বিতৰ্ক হইতে পারে। শাস্ত্রে অনুর পিষাচ প্রকৃতিও দেব নামে অনেক স্থলে অভিহিত হইয়া থাকে। বাহাবা পিষাচের আরাধনা করেন পিষাচেরা তাহাদের কাছেই দেবতা। আমল কথা আবাব্য অদৃষ্ট শক্তির নাম

পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ণকান্ডের প্রয়োজন নাই কেহ বলেন (পূর্ব
নীবাংসক) কর্ণকান্ড ব্যতীত ঈশ্বর পাওয়া যায় না, এই দুই দলের
বিবাদ হইতেই সাকার বাদী ও নিরাকার বাদীর মধ্যে বিবাদ।
ঈশ্বরের ব্যাঘ্র প্রকৃত ঈশ্বরত্বকে মহাত্মা গীতা শাস্ত্রে এই উত্তর মতের
বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন ।

কর্ণকান্ড দ্বারা ঐহাদের সম্পর্কে আসিতে হয়, তাঁহারা দেব দেবী
তাঁহারা সাকার, এবং জ্ঞান কান্ড দ্বারা ঐহাদের সম্পর্কে আসা যায়
তিনিই ঈশ্বর তিনিই নিরাকার। ঈশ্বর তত্ত্বকে মহাত্মারা বলেন যে
ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবার জন্য সাকারের আরাধনা প্রয়োজনীয় হইলেও
সাকারের উপাসক হইও না। দেব দেবীরা শ্রদ্ধার পাত্র হইলেও
ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই ভক্তির পাত্র নহেন। প্রথমে গুহ্যচিত্ত হইয়া
দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া নিরাকার বিশ্বরূপ ঈশ্বরের সম্পর্কে আসিয়া সেই
ঈশ্বর ভক্তি হাপন করাই ঈশ্বরোপাসকের কর্তব্য। ঈশ্বর ব্যতীত আর
কাহারও সম্পর্কে আসিয়া আপনাতাহারা হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না।

দেব বলি যায়। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ঐহারা আরাধ্য, হিন্দুরা
তাঁহাদের দেবতা বলেন এবং নিষিদ্ধ কর্ণপ্রদ শক্তি সকল তাহারা
বেদাদি অনুসারে আরাধ্য নহে তাহারাই অনুব। দেবতা কথার আর
একটি অর্থ আছে এই অর্থে তাঁহারা কেবল স্থল বিশেষে আরাধ্য
নহেন তাঁহারা উপাস্য। গুরু শক্তির নাম দেবতা। গুরু দীক্ষাকালে
শিষ্যে, যে শক্তি সঞ্চারিত করেন তাহাই শিষ্যের ইষ্টদেবতা। কর্ণ-
ফলপ্রদ সাধারণ শক্তি হইতে এইরূপ দেবতার প্রভেদ এই যে, যে
ইহারা গুরুর কন্যতাবীন, কিন্তু অন্য শক্তি সেরূপ নহে।

ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই যেন উপাস্ত না হয় । শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইয়া তবে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তত্ত্ববোধ সম্বন্ধে কহিয়াছেন ।

তল্ল তল্ল করিয়া ঈশ্বরালোচনা করিতে হয় । ইহা কি ঈশ্বর ? না ইহা নহে, এইরূপ করিয়া আলোচনা করিয়া তবে ঈশ্বর কি তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে । সাধক শুল ইন্দ্রিয় দ্বাৰা যে সকল বস্তু দেখিতেছেন তাহাদের মধ্যে কি কেহ ঈশ্বর ? না, শুল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ সকল সাকার কিন্তু ঈশ্বর নিরাকার, স্মৃতরাং বস্তুত্ব এই সকল সাকার পদার্থের সম্পর্ক থাকিবে ততক্ষণ সাধক যেন আপনানাহারা হন না । পরে সাধক ইন্দ্রিয় সকল হঠাৎ বন্ধ করিয়া লইয়া যখন মনোময় জগতে পৌঁছিয়া জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উঠিবেন তখন যে সকল পদার্থের সহিত সম্পর্কে আসেন তাহাদের মধ্যে কেহ কি ঈশ্বর এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধক দেখিতে পাটবে যে তখনও তিনি সাকারের সম্পর্কে রহিয়াছেন, স্মৃতরাং সে অবস্থায় তিনি যেন আপনানাহারা না হন । এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থার পর সাধক যখন জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিবেন তখন তিনি সাকার অর্থাৎ সত্ত্ব পদার্থের সম্পর্কে আর থাকিবেন না । এইরূপ জাগ্রত সুষুপ্তি অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক বাহ্যিক অস্তিত্ব অহুভব করিতে থাকেন, তিনিই ঈশ্বর । এইরূপে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলে সেই ঈশ্বর সংস্থাপন রক্ষার নাম ঈশ্বরোপাসনা । ঈশ্বরোপাসনা কথাটি বড় সহজ কথা নয় ।

পূর্বেই বলিয়াছি মনোময় জগতীর হৃদয় শক্তির আধার পদার্থ সকলের নামই দেব দেবী । বেদের কর্মকাণ্ডের সাহায্যে এই সকল দেব দেবীর হৃদয় শক্তির সম্পর্কে আসিয়া সাধক হৃদয় জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হন । যিনি হৃদয় জগতে বিচরণ করিতে শিখেন নাই

তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ কখনই অস্ত্রবে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। কেন না ঈশ্বর কি তাহা জানিতে হইলে ঈশ্বর কি নহেন তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরোপাসক ঈশ্বর তত্ত্ব অতুসন্ধান জন্য যখন বাহ্য জগৎ হইতে আপনাকে সবাইয়া লইবেন, তখন তাঁহার ক্রমে ক্রমে সৃষ্টোদ্ভিন্ন সকলের বিকাশ আরম্ভ হইবে। এই অবস্থায় তিনি যেন অপনাহারা না হন। এই অবস্থায় তাঁহাকে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রবুদ্ধ রাধিতে হইবে। সৃষ্ট জগতীয় সাকার পদার্থ সকল তাঁহার উপাস্য নহে ইহা জানিয়া সৃষ্টোদ্ভিন্ন সকল হইতে ও আপনাকে সরাইয়া লইতে হইবে। এবং এই অবস্থাতে ও প্রবুদ্ধ থাকিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ করিবা সেই ঈশ্বরই তাঁহার উপাস্ত এইটি জানিবা তখন তিনি আপনাহারা হইতে চেষ্টা করিলেই ঈশ্বরোপাসকের ঈশ্বর উপাসনা সিদ্ধ হয়।

সৃষ্ট জগতে বিচরণ করিবা দেব দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিবা তত্ত্ব অর্থাৎ উহার আঘার উপাস্য নহে এইরূপ বিচার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ ছাড়াইয়া কারণ জগতে উঠিতে হয়। কিন্তু সৃষ্ট জগতে বিচরণ করিবাই পাছে তিনি সেই অবস্থাতেই আপনাহারা হইয়া নিত্য পদার্থ লাভে বঞ্চিত হন, সেই জন্য ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে প্রধান সাকার পদার্থ অবলম্বন করিবা আপনাহারা হইও না, কেন না ঈশ্বর নিরাকার।

এক্ষণে দেখ সৃষ্ট জগতে বিচরণ করিতে শিখা অর্থাৎ জাগ্রত সপ্নাবস্থায় থাকিয়া বিচার শক্তি প্রবুদ্ধ রাধিতে শিক্ষা ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান। এই অবস্থায় যে সকল পদার্থের সম্পর্কে আসিতে হয় তাহারাই সাকার দেব দেবী। স্মৃতরাং দেব দেবীতে অপনাহারা যদি ও সাধকের পক্ষে হানিজনক কিন্তু দেব দেবীর সাক্ষাৎ লাভ

করিতে যাওয়া অর্থাৎ আমাদের অন্তর নিহিত সূক্ষ্ম শক্তিকে জাগ্রত করা, এবং তাঁহাদের সম্পর্ক জনিত সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া তত্ত্ব অলোচনা দ্বারা আরও উচ্চে অগোহণ চেষ্টা করাই ঈশ্বরোপাসনার সোপান । সাকারের আরাধনা ব্যতীত নিরাকারের উপাসনা হয় না ।

দেখ ঈশ্বরের যে আকার নাই তিনি যে নিরাকার, একথাটা বুঝাইবার জন্য ঈশ্বর বেত্তাদের এত কি দরকার পড়িয়াছিল ইহা একবার ভাবিয়া দেখি । ঈশ্বরকে কে কখনও দেখিতে পায় না সুতরাং উহা যে সাকার নহে তাহাত একটা মোটা কথা পড়িয়া রহিয়াছে । ঈশ্বর সাকার নহেন একথাটির অর্থ যদি এইরূপই হয় যে তিনি আমাদের চক্ষু আদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর ইহাব যদি অন্য কোনরূপ অর্থ না থাকে তবে ঈশ্বর নিরাকার এ জ্ঞান প্রচারের জন্য ঈশ্বরবেত্তাদের বেশী মাথা ঘুঁড়াইবার দরকার ছিল না । ঈশ্বর সাকার নহেন ইহাব আসল অর্থ এই যে মনোময় জগতের সূক্ষ্মশক্তির আধার দেব দেবীগণকে অনেকে ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিতেন কিন্তু সেই দেব দেবীগণ সাকার, ঈশ্বর তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন পদার্থ এইটি বুঝাইবার জন্যই ঈশ্বর নিরাকার এই কথাটি প্রচারেব প্রয়োজন হইয়াছিল ।

আমি তোমাকে যে কথাগুলি বলিলাম তাহার কারণ এই যে আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে সূক্ষ্মজাতীয় শক্তির আধার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সাকার দেব দেবীগণেব অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলে এবং ঈশ্বর সূক্ষ্মেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহেন অর্থাৎ সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সকল হইতে আপনাকে সরাইয়া না লইলে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয় না, এই কথাটি ঠিক বুঝিতে পারিলেই আজকাল সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া যত গোল-মাল দেখিতেছ সব মিটিয়া যায় ।

সাকার উপাসনা অর্থে দেব দেবীর উপাসনা, এই বুঝিয়া কিরূপে দেব দেবীর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয় তাহা যিনি ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিবেন।

আজকাল সাকার পূজা অর্থে প্রতিমা পূজা। প্রতিমাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিলে যে মহাদোষ সে বিষয়ে বেনী বলিবার দরকার নাই। কিন্তু প্রতিমাকে যে ঈশ্বর জ্ঞান করে এরূপ লোক ত দেখি না। প্রতিমাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে যাহুব তাকে কি বিসর্জন দিতে পারে ?

ছা। দেব দেবীত তেজীশকোটা, এখন ঈশ্বর উপাসনার জন্ত কাহার আরাধনা প্রয়োজন। সকলেরই আরাধনা করিতে হইবে নাকি ?

শি। দেব দেবীর চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্তই দেব দেবীর আরাধনা করিতে হয়, অর্থাৎ আমাদের অন্তর-নিহিত সূক্ষ্ম শক্তির উল্লেখ করিয়া তাহা হইতেই আবার যে শক্তির নিকৃষ্টতা ধারণ হয় তাহা যে ঈশ্বর নহে—ইহা বুঝিতে পারা যায়। বিশেষ বিশেষ কর্ম দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেব দেবী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম শক্তিকে আগ্রহ করা যায়। কে কিরূপ কর্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ কিরূপ দেব দেবীর আরাধনা দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিবেন তাহা যদি জানিতে চাও তবে ভগবদ্গীতা বুঝিতে চেষ্টা কর।

তবে প্রতিমাদি মূর্ত্তি সমক্ষে রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা পদ্ধতি কেন যে প্রচলিত আছে তাহা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে।

দেখ যদি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসক হইতে তোমার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে তবে তোমাকে গুটিকত উপদেশ দিই গুন।

কোন প্রকার বিশেষ পূজা পদ্ধতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনা-

হাবা হইও না, ঈশ্বর এই কথাটিতে ভক্তি রাখিয়া অগ্রসর হইতে শিখ ।

ঈশ্বর কোথায় আছেন এই কথাটির উত্তরে একজন ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া ছিলেন যে “ঈশ্বর তাহার নামে আছেন” ।* কথাটি বড় সুন্দর । ঈশ্বর কোথায় আছেন ? ঈশ্বর তাহার নামে আছেন, ঈশ্বর গির্জায় নাই, ভীর্থে নাই, কোন বিশেষ পূজা পদ্ধতিতে নাই, বিশেষ বর্ণে নাই, কোন বিশেষ কর্মে নাই, তিনি পিতার ভালবাসায় নাই, তিনি স্ত্রীব প্রেমে নাই, তিনি নামে আছেন । শ্রদ্ধার পাত্রে শ্রদ্ধা রাখিও, কিন্তু এই নামটিতে কেবল ভক্তি রাখিও । শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া কাদিতে শিখিলেই নামে ভক্তি জন্মিয়াছে, এরূপ বুঝিও না । নামে ভক্তির প্রথম ফল কি তাহা বলি শুন । যখন দেখিবে যে নামে ভক্তি থাকে নিবন্ধন তব্ব অলোচনা সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মিয়াছে তখন জানিবে যে ঈশ্বর নামে তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে ।

কাহার ও যাহাছায়ে যুদ্ধ হইলে অন্তরে যে ভাব জন্মে, যে ভাব নিবন্ধন সেই যাহাছায়ে বিশিষ্ট পদার্থকে ছাড়িতে চাই না, তাহারই নাম ভক্তি । ঈশ্বরোপাসককে ক্রমে ক্রমে সব ছাড়িতে হইবে স্মৃতবাৎ কোন অনিত্য পদার্থের যাহাছায়ে দর্শনেন্দ্রিয় যুদ্ধ হয়, সঙ্গীত সৌন্দর্য্যে কর্ণ যুদ্ধ হয়, কবিতার সৌন্দর্য্যে কল্পনাশ্রক মন যুদ্ধ হয়, আর নামের যাহাছায়ে বুদ্ধি যুদ্ধ হয় । যখন দেখিবে যে তোমার বুদ্ধি বৃত্তির অলোচনা জন্ত তোমার অন্ত কিছুই ভাল লাগে না, কেবল ঈশ্বরের নাম সম্বন্ধীয় তব্ব সকল আলোচনা করিতেই তোমার বুদ্ধি বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে, তখন তুমি ঈশ্বরের নামে ভক্তি কিরূপ তাহার

*ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট “নামে ভক্তি” কথাটি প্রথম শিখিয়াছিলাম ।

আভাস পাইবে, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য তুমি কিছুই বুঝ নাই এই জ্ঞানটি প্রথম জন্মান চাই, তাহার পব সেই মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য অন্তর যখন লালসিত হইবে, ধর্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র বা মুসলমান ধর্মশাস্ত্র যেখানে ঈশ্বরের নাম পাইবে, সেই সেই শাস্ত্রের ভাব লইয়া আলোচনা করিবার জন্য যখন আগ্রহতা জন্মিবে তখন ঈশ্বর ভক্তি কিরূপ তাহার আভাস পাইবে। ঈশ্বর মাহাত্ম্য কি গভীর, তখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া, যে সকল মহাত্মারা ঈশ্বর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গকামনার প্রাণ মন যখন উতল। হইবে তখন তুমি ঈশ্বর নামে ভক্তি শিখিত আবস্ত কবিয়াছ বুঝিও আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া অহঙ্কার যেন কখনও যেন না জন্মে। যে দিন তোমার ঐ অহঙ্কার জন্মিবে সে দিন তোমার উন্নতির পথে কাটা পড়িবে।

আজকাল সাকার ও নিরাকার উপাসনা, যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে সেই অর্থে তুমি সাকার উপাসকই হও, আর নিরাকার উপাসকই হও, মনে টোকা দিও জানিও যে কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিতে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। সুতরাং কোন বিশেষ উপাসনা পদ্ধতিব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপবার উন্নতি পথে আপনি কটক দিও না। ঈশ্বর তাঁহার নামে আছেন। যোগী পতঞ্জল বলেন, প্রণবন্ত্য বাচকঃ। এই প্রণব আলোচনা দ্বারা সমস্ত বৃত্তি সকলকে ঈগরাভিমুখী করিতে শিখ। মিছে ঝগড়া কাটিতে মাতিয়া নিম্নের কার্য্য হারাইও না।

হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধীয় পিতৃত্ব এবং দেবতা ত্ব আদি আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারিবে যে বিশেষ বিশেষ উপাসনা বা আরাধনা পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ বিশেষ দেবতাদের সম্পর্কে আসা যায়। সুতরাং

ঐহারা আপনাদের উপাসনা পদ্ধতি লইয়াই আডম্বর করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাদের উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন বলিতে হয়। কিরূপ পূজাপদ্ধতি দ্বারা কিরূপ সূক্ষ্ম শক্তির সম্পর্কে আসা যায় হিন্দু শাস্ত্র সকলে তাহার বিশেষ আলোচনা করা আছে। এ সম্বন্ধে গোটাকত মোটামুটি বলি গুন। দেবাদি পূজার মূল সূত্র এই যে “না দেবো দেবমর্চয়েৎ।” ‘দেব ভাবাপন্ন না হইলে দেব পূজার অধিকারী হব না।’ যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে সেইরূপ ভাবানুযায়ী দেবতাদের সম্পর্কে আসিতে পারিবে। সূক্ষ্ম শক্তির আধার সকল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। পিতৃলোক, দেবলোক, ঋষিলোক। শ্রদ্ধা দ্বারা পিতৃলোককে সন্তুষ্ট করিতে হয়, কর্ম অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির চালনা দ্বারা দেবলোকের সম্পর্কে আসা যায় এবং জ্ঞান চর্চা দ্বারা ঋষিলোকের সম্পর্কে উপনীত হওয়া যায়। যে পূজা প্রেম প্রধান তাহা পিতৃ লোকের পূজা, যে পূজায় ইচ্ছা শক্তির প্রাধান্য তাহা দেব পূজা এবং যে পূজায় জ্ঞান শক্তির প্রাধান্য তাহা ঋষি পূজা। আর যে পূজার উদ্দেশ্য পিতৃ ঋণ, দেবঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ করা তাহাই ঈশ্বরোপাসনা। নিজাম প্রেম চর্চা দ্বারা পিতৃঋণ শোধ দিতে হয়, নিজাম কর্ম দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ এবং আত্মজ্ঞান চর্চা দ্বারা ঋষি ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে পূজায় পিতৃ চক্র, দেব চক্র এবং ঋষি চক্র হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা। দেব ভাবাপন্ন জন দেব পূজার অধিকারী এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন জনই ঈশ্বরোপাসনা করিতে জানেন। ঈশ্বরোপাসনা কাহাকে বলে তাহা যদি জানিতে চাও তবে ঈশ্বর ভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেবের চরিত্রে চিত্ত সংযম করিতে শিখ।

আমি তোমার ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে হু কথায় কি বুঝাইব ?

সমগ্র ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে তবে ঈশ্বর উপাসনা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবে ।

হা । আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন—ঈশ্বর স্থূল পদার্থে নাই, ঈশ্বর কোন পুণ্য পদ্ধতিতে নাই, এই সকল কথা আমার মনে লাগিতেছে না ; কেন না সকল ধর্ম শাস্ত্রেই এই কথা আছে যে ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান । সামান্য ক্ষটিক স্তম্ভের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন প্রজ্বলিত ইহা বুঝিয়াছিলেন ।

শি । ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সকলের অর্থ বুঝা বড়ই দুর্ব্বল ব্যাপার । ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন অর্থাৎ তিনি স্থূল পদার্থেও আছেন সূক্ষ্ম পদার্থেও আছেন এ কথাও ঠিক এবং তিনি স্থূল পদার্থেও নাই এবং সূক্ষ্ম পদার্থেও নাই একথাও ঠিক । তুমি আমি সাধারণ লোকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে যে ভাবে দেখি, স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থকে সে ভাবে দেখিলে ঈশ্বর তাহাতে নাই—কিন্তু বাহার আয়ত্বেয়ান অন্নিয়াছে বাহার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধীয় ভেদ জ্ঞান নাই তিনিই সকল পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান, আর কিছুই দেখিতে পান না ।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী । যে এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ সর্বব্যাপী তাহারই নাম ঈশ্বর । কিন্তু বাহা জগতের এক দেশ ব্যাপী তাহা ঈশ্বর নহে । এই সমুদ্বাহিত স্থূল পদার্থটি তোমার সমক্ষে রহিয়াছে—এই পদার্থসম্বন্ধে তোমার জ্ঞান এই যে ইহা জগতের এক দেশ ব্যাপী সুতরাং তোমার কাছে ঐ স্থূল পদার্থটিতে ঈশ্বর নাই । কিন্তু আয়ত্বেয়-জ্ঞানী পুরুষের একখানি পুস্তক দেখিলে ও অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, একটি সুন্দর পুরুষ দেখিলেও অন্তরে সেই ভাব উদয় হয়, কিছুতেই অন্তরের ভাবের পরিবর্তন হয় না । সেই জন্যই তিনি সকল পদার্থেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান । দেখ কেবল কথা লইয়া কখনও তর্ক

করিও না। কথার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়া চেষ্টা করিবে। সে দিন একজন প্রতিমা পূজার পক্ষ সমর্থন জন্য এইরূপ তর্ক করিতে-
ছিলেন। ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, ঈশ্বর নদীতে আছেন, পর্বতে
আছেন, কার্ভে আছেন এবং সেই প্রতিমাতেও আছেন।
সুতরাং প্রতিমাকে ঈশ্বর জানে পূজা করিতে বাধা কি? কিন্তু এ
তর্কের গোড়ায় গলর কোষায় দেখ। প্রতিমাতে যে ঈশ্বর আছেন,
সে কি তুমি আমি বুঝিতে পারি। প্রতিমা দেখিলে মনে যে ভাব
উদয় হয় তাহা প্রতিমা সন্দ্বন্ধীয় ভাব; তাহাকেই ঈশ্বর সন্দ্বন্ধীয় ভাব
বলিলে ঘোরতর ভ্রম হইল। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাতে অন্তরে যে সচ্চিদানন্দ
ভাব উপস্থিত হয়, প্রতিমা দর্শনেও যিনি সেই ভাব উপলব্ধি করিতে
পারেন তিনিই বলিতে পারেন ঈশ্বর এই প্রতিমাতেও আছেন।

তোমার আমার ন্যায় লোককে এখন বুঝিতে হইবে যে সর্বব্যাপী
অর্থাৎ কোন বিশেষ একদেশ ব্যাপী নহেন। যখন জগতের ভিন্ন ভিন্ন
পদার্থের যাহাদের এখন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝ) সম্পর্কে আসিয়া সকল
সময়েই সেই এক সচ্চিদানন্দ ভাব বই অল্প কোন ভাব অন্তরে
আসিবে না, তখনই তুমি গাছেও ঈশ্বর দেখিতেপাইবে এবং
মানুষেও ঈশ্বর দেখিতে পাইবে।

দেব ভাবাপন্ন না হইলে পূজা দেবলোকে পৌঁছায় না,* সেইরূপ
নিজে ঈশ্বর ভাবাপন্ন না হইলে ঈশ্বর পূজা হয় না। সচ্চিদানন্দ
ভাব ঈশ্বর ভাব। ঈশ্বরোপাসনা শিখিতে গেলে অন্তরে এই ভাব
আনয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। যাহার অন্তরে এই ভাব উপস্থিত
হয় নাই অথচ নিজের উপাসনা পদ্ধতির গোঁড়ামী করিয়া থাকেন তিনি
ঐহার সেই ছোট খাট উপাসনা পদ্ধতির শিষ্টভাব হৃদয় হইয়া

আপনানাহারা হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তি ঈশ্বরে নাই, সেই উপাসনা পদ্ধতিতে তাঁহার ভক্তি দাঁড়াইয়াছে। অতএব সত্যত সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে শিখিবে। অতঃপরে এইরূপ গোঁড়াবী জন্মাইয়া দেওয়া ছুই দেবতার কার্য। দেবতার ঈশ্বর উপাসকের সাধনার পথে কেবল বিয় বটাইতে চেষ্টাকরে ইহা হিন্দুরা বেশ বুঝিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে দেবতাদের এইরূপ ছুটামি বেশ বর্ণনা করা আছে। সাবধান দেবতাদের চক্রে পড়িগ আপনানাহারা হইও না।

ভিন্ন ভিন্ন মাজুকের মন যত দিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের থাকিবে, তত-দিন পূজা পদ্ধতি কখনই এক রকম হইবার সম্ভাবনা নহ। যিনি যে রকম ভাল বুঝেন, তিনি সেই রকমে উপাসনা করুন, মিছে ঝগড়া কর্তব্য নহে। এই সব ঝগড়া দেখিয়া আমার অন্ধগোলাকুল ন্যায়ের পল্লটি মনে পড়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলেই কানা অথচ আপনায় গোঁ ধরিয়া ঝগড়াটি না কবিলে চলে না। আগে ঈশ্বর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর তাহার পর না হয় ঝগড়া করিও। যে পদ্ধতি অবলম্বনে মনে সচ্চিদানন্দ ভাবের আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা পদ্ধতি। আত্ম-কালকার সমাজে যে সাকার উপাসনা দেখিতে পাই কেবল মাত্র সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনেই কেহ কি সচ্চিদানন্দ ভাবের আনন্দ পাইয়াছেন? আত্ম-কালকার নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি অলম্বন করিলেই কি সেই সচ্চিদানন্দ ভাবের আনন্দ পাওয়া যায়? তাহা যদি হইত তবে ভারতে আত্ম মুক্ত পুরুষের ছড়াছড়ি যাইত। 'তবে কেন মিছে সামান্ত পূজা পদ্ধতি লইয়া গোলমাল করা ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঘরে অন্ন নাই কিন্তু কি রূপে অন্ন খাইতে হইবে হাতে কিছা কাঁটা চামচে—এই লইয়া ছুই তাইয়ে ঝগড়া করাটা কি ভাল দেখায়? আগে অন্নের চেষ্টা কর; আগে

ঈশ্বর কি দুজ্জের পদার্থ তাহাই বুঝিবার চেষ্টা কর । বিজ্ঞান সম্বন্ধিত জ্ঞান চর্চা কব তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা ।

ছা । আপনার কথা বাস্তব যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে আপনি জ্ঞান মার্গেরই বেশী পক্ষপাতী ।

শি । আমি ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে যাহা বুঝি তাহা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন । প্রথম নামে ভক্তি চাই, সেই ভক্তির ফলে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ অন্তরে বুঝিবার জন্ত আগ্রহতা জন্মান চাই ; জ্ঞান এবং কর্মের সাহায্যে বিশ্বরূপ, নিরাকার ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণা করিতে পারিলে তখন সেই ঈশ্বরের স্বরূপে ভক্তি সংস্থাপন পূর্বক আমি কে ইহা বুঝিবার জন্ত বিজ্ঞান চর্চা চাই, তাহার পর আমার অহং জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান যোগ করিতে পারাই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা । ঈশ্বরে ভক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইবার একটি হইতেই অপরটি জন্মিয়া থাকে । কর্মমার্গ অবলম্বনে জ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের সাহায্যে ভক্তির চর্চা, ভক্তির সাহায্যে আবার কর্মের চর্চা এইরূপ করিণ প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি জন্মিয়া থাকে । আমরা সাধারণ লোকে প্রেম ও ভক্তি কথাই বোঝি, ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থতে যদি ভূমি বুঝ, তবে ভূমি ঠিক বুঝ নাই । ঈশ্বর প্রেম বা ঈশ্বর ভক্তি কথাটির অর্থতে আমি যাহা বুঝি, তাহা তোমাকে আর এক দিন বুঝাইব ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বরোপাসনা ।

ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আমি তোমাকে বাহা যাহা বলিয়াছি সেই সমস্ত কথা আর একবার বলি তুমি ।

১ম । বৈষ্ণব কৰ্ম্মদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ তাহারই নাম ঈশ্বরোপাসনা ।

২য় । যুগে অনেকেই অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে , পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিতে জানেন না । যুগের কথায় বোকা আর অন্তরে অনুভব শক্তিদ্বারা বোকা, এই উভয়ে অনেক প্রভেদ । ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্তরে অনুভব করিবার নামই ঈশ্বরোপাসনা ।

৩য় । ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সাধারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সেই অজ্ঞতা দূর না হইলে বহুশয্য প্রকৃত পক্ষে সুখী হইতে পারে না , এই বিশ্বাসটি অন্তরে দৃঢ়ভূত হইলে আমাদের মনে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবার জন্য একটি পিপাসা উপস্থিত হয় । এই জ্ঞান-পিপাসা ঈশ্বরোপাসনার প্রথম অংশ ।

৪র্থ । ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ । যে পথ অবলম্বনে সেই অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হওয়া যায় সেই পথ অবলম্বনেই ঈশ্বরোপাসনা ।

৫ম । যেমন অপরিষ্কার দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়িতে পার না, সেইরূপ সমস্ত চিত্তে ঈশ্বরের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না । চিত্ত উন্নত ও নির্মল না হইলে ঈশ্বর কি তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়

না। সেই জন্য যে পথ অবলম্বনে চিত্ত উন্নত ও নির্মল হয় সেই পথ অবলম্বনই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা।

৬ষ্ঠ। যদি চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন জন্য কেহ কোন দেব দেবী রূপ মূর্ত্ত শক্তির সাহায্য অবলম্বন প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তবে সেই দেব দেবীর আরাধনাকেও ঈশ্বরোপাসনা বলিতে হইবে।

৭ম। চিত্তের উন্নতি সাধন করিতে গেলে মনুষ্যের উন্নত দশার চরম আদর্শ স্বরূপ কোন পুরুষের আদর্শ চিত্তা দ্বারা, সেই আদর্শকে সদাই অন্তরের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া সেই আদর্শমুখ্যায়ী উন্নত হইবার চেষ্টা করা উচিত।

৮ম। আমাদের মন বড় অস্থির। কোন আদর্শ চরিত্র মনো-মধ্যে সদা সর্বদা ধরিয়া রাখা বড় সহজ কথা নহে। সেই জন্য এই আদর্শ পুরুষের সঙ্গে আমাদের মনকে কোন বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখা চাই। উন্নত পুরুষের সহিত মনের বন্ধন হৃৎ করিবার জন্য মৃত্তা ভক্তির প্রয়োজন। এই জন্য ভক্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

৯। অনেকে ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল ঈশ্বর কথাটির উপর ভক্তি স্থাপন করিয়া সেট ভক্তি বৃত্তির চালনা কথাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক তাহার কর্ম্মমুখ্যায়ী কোন দেব শক্তির সাহায্য পাইলেই সেই দেব শক্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া দ্রুতর ভ্রমে পতিত হইয়া পড়েন। সুতরাং বাহ্যতে এইরূপ ভ্রমে পতিতে না হয়, সেই জন্য ঈশ্বর কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করা উচিত।

১০। এই পরিনৃক্তমান্ জগৎ যে এক শক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে তাহাই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি। জগতে যত প্রকার শক্তির

ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত শক্তিই কি মূল কি মূল সকলেই—সেই এক শক্তির বিকার মাত্র । সমগ্র জগতের সমষ্টি শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি । এই শক্তিকে হিন্দুশাস্ত্রে বিগুহ্ব চৈতন্য শক্তি বলিয়া থাকেন ।

১১। যিনি আত্মশক্তি এই সমষ্টি শক্তির সহিত একতানে মিলাইতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বর কি তাহা বুঝিয়াছেন । এই সমগ্র জগৎকে তিনি অশুণ্ড ও অবিভীয়া বলিয়া বুঝিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের সমষ্টি হাব হইতে তিনি আপনাকে পৃথক বলিয়া আর বুঝেন না । এইরূপ তিনি ।

সর্বভূতহুমান্বানং সর্বভূতানি চাশ্বনি ।

ঈক্যতে বোগবুজ্ঞাত্বা সর্বত্র সমবশনঃ ।

তিনিই উন্নত দশায় চরম আদর্শ পুরুষ এবং তিনিই ঈশ্বর ।

১২। এই সমগ্র জগতের সমষ্টি ভাবই ঈশ্বর, এইটি স্পষ্ট বুঝিলে ঈশ্বর নিরাকার, নিগুণ, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ও অনন্ত এই সকল বিশেষণ শব্দগুলির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় ।

১৩। মনুষ্যের কর্ণের কলদাতা শক্তির নাম দেব দেবী । দেব দেবীগণ অনিত্য সূত্রে প্রলোভনে মানুষকে দ্বন্দ্ব করিয়া রাখে এবং সেই জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া আছে । দেব দেবীগণের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না । যত দিন সামান্য অনিত্য সূত্রে কামনা মনুষ্য হৃদয়ে প্রবল থাকিবে ততদিন তিনি নিত্যসুখদাতা ঈশ্বর যে কি অনির্লচনীয় পদার্থ তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না । সেই জন্য যিনি প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা করিতে চান তাঁহাকে প্রথমতঃ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে । যে পাদরি মহাশয় সপ্তাহের সমস্ত ঘণ্টাই অনিত্য ধন মানের সূত্রে কামনায় মুগ্ধ হইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন

এবং এক ঘণ্টা গির্জাঘ পিরা চোক বুজিয়া নিরাকার ঈশ্বর ভাবিতে-
ছেন, তিনি ঈশ্বর কি তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না । সকাশ
কর্মই দেব দেবীর উপাসনা এবং নিরাকার কর্মই ঈশ্বরোপাসনা ।

১৪। উপাসনার পথে চলিতে চলিতে শ্রম দয় উপরতি তিতিক্ষা
সমাধান ও যুগ্মক এই ছয়টি গুণ যখন ক্রমে ক্রমে উপাসনার অন্তরে
বিকশিত হইবে, তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পথে চলিতেছেন
বুঝিতে হইবে । এবং যে উপাসনা দ্বারা অন্তরে এই সকল গুণের ক্রম-
বিকাশ না হয় তাহা ঈশ্বরোপাসনা নহে । ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে আজ
যাহা সংক্ষেপে বলিলাম এবং পূর্বে তোমাকে যাহা বুঝাইতে চেষ্টা
করিয়াছি, ইহা সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের সার কথা । তুমি এইবারে বেদান্ত
সম্বন্ধে বেদান্ত সার গ্রন্থখানি এবং ভগবদ্গীতা খানি পাঠ করিও তাহা
হইলেই হিন্দুধর্মের ভিতর কি গভীর মনোহর ভাব আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম
করিতে পারিবে ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর প্রীতি ।

শিক্ষক । দেখ, ঈশ্বর প্রীতি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ প্রীতি কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে । আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি সেই ভালবাসার সুর সকল স্থলেই এক রকম নহে । পুত্র পিতাকে যে ভাবে ভাল বাসে, স্ত্রী স্বামীকে যে ভাবে ভালবাসে, ভাই ভগিনিকে যে ভাবে ভালবাসে এই সকল ভালবাসাব মধ্যে পৰস্পর প্রভেদ আছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন । আবার পাবিবারিক প্রেমের সহিত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ তুলনা করিয়া দেখ একটী প্রভেদ দেখিতে পাইবে । ভালবাসার সুর যখন সকল স্থলেই এক রকমের নয় তখন ঈশ্বর প্রেমের সুর কিরূপ তাহা প্রথমে সকলেবই ভাবিয়া দেখা কর্তব্য ।

ভালবাসার রহস্ত বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই সত্যটি বুঝিতে পারিবে । ভালবাসার যেরূপ সুরে আমার নিজের হৃদয় তন্ত্রী বাঁধা আছে আর একজনের হৃদয় তন্ত্রী যদি সেইরূপ সুরে বাঁধা থাকে তবেই পরস্পরে পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হব । এই জন্তই হিন্দুশাস্ত্র বলে দেবভাপন্ন না হইলে দেবতা পূজা দ্বারা দেবতার সহিত মিলন সম্ভবে না । (না দেবো দেবমর্চ্ছয়েৎ—বশিষ্ঠ) অসুর ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে অসুরগণ আকৃষ্ট হন, পিশাচ ভাবাপন্ন হইয়া পূজা করিলে পিশাচের সম্বন্ধেই থাকিতে হয় । যিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতে চান তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইতে হইবে ঈশ্বর প্রীতির সুরে আত্মাকে

বাধিতে হইবে তবেই ঈশ্বরের সহিত প্রীতি সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে পারিবেন ।

আমরা সাধারণ লোকে ভালবাসাব যে সকল সুরের সহিত পরিচিত ঈশ্বর প্রীতির সুর তাহাদের অপেক্ষা যে কত বেশী গভীর তাহা তুমি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না । স্বতাবতঃ অন্তরে যে সুরের অনুরাগ প্রবল, ঈশ্বর উপাসনা কবিত্তে গেলে সে সুর বদলাইতে হইবে । সচরাচর অন্তরে যে অনুরাগ বৃদ্ধি প্রকাশ পায় তাহাই প্রেরণ করিতে পারিলেই তাহার সুর বদলায় না । ঐশ্বরিক ভাব কি তাহা বুঝিয়া সেই রকম ভাবে জন্ম যত্ন বাধিতে হইবে তবেই নিরাকার ঈশ্বরের সম্বন্ধে আসিতে পারিবে ।

মহুয্য এই সংসার চক্রে পড়িয়া পত্নীপ্রেম পুত্রপ্রেম এই সকল সঙ্কীর্ণতার অনুরাগে বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিতে থাকে । কিন্তু যিনি ঈশ্বরানু-বাগের আশ্বাস পাইয়াছেন তিনি অল্প সকল ভুজ্জ প্রেমের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন জানিও । সর্বত্র সমদর্শীতা এই ভালবাসা আশ্বাসনের ফল । আমার পুত্রকে আমার পিতাকে আমার মাতাকে অল্প লোকের অপেক্ষা বেশী ভালবাসি এ জ্ঞান যত দিন থাকিবে ততদিন আমার জানা উচিত যে আমি ঈশ্বর প্রীতির আশ্বাসন পাই নাই । আমার দেশকে আমার ধর্মকে অন্য দেশ অন্য ধর্ম অপেক্ষা, আমার পূজা পদ্ধতিকে অন্যের পূজা পদ্ধতি অপেক্ষা যতদিন বেশী ভাল বাসিব ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি অন্তরে জন্মায় নাই ইহা নিশ্চয় জানিও । আবার ইহাও জানিও যে যতদিন আমার জী পুত্র অথবা অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষা ঈশ্বরকে বেশী ভাল বাসি মনে করিব ততদিন আমার সমস্ত জ্ঞান জন্মায় নাই ততদিন আমার ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই ।

ঈশ্বর প্রীতি যে বড় সুগভীর ইহা স্বরণ রাখিও । বাস্তবিক ঈশ্বর

প্রীতি অতি বিরল পদার্থ। অনেক কষ্টে অনেক যত্নে মনেব স্বাভাবিক প্রেমভাবের সূত্র ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া তবে ঈশ্বর ভক্তি ভাব অন্তরে উদ্ভিত করিতে হয়। ঈশ্বর প্রীতি যে কি পদার্থ তাহা প্রীত্বক বুদ্ধিবোধের দ্বারা লোকেই বুঝিতে পারেন, তুমি আমি তাহার কি বুঝিব বল।

যদি প্রীতি মার্গ অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাও তবে প্রেমের সঙ্গীর্ণতা ঘুচাইতে শিবে। প্রেমের প্রথমতা জন্মিলেই সঙ্গীর্ণতা ঘুচে না এটি যেন বেশ স্মরণ থাকে। প্রেম প্রধান উপাসনার যদি প্রেমের সঙ্গীর্ণতা যেমন তেমনি থাকে, যাহাদের ভালবাসি তাহাদের প্রতি ভালবাসাটাই প্রথম হইতে থাকে তবে উপাসনার কোন ফল ফলে নাই জানিও। প্রত্যহ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিও তোমার ভালবাসা-ভাব উন্নত হইতেছে কি না। ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নিজের ভালবাসা বৃদ্ধি সঙ্গীর্ণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর, যিনি ক্রমাগত আত্ম পরীক্ষা কবিতো চান না তিনি উন্নত হইতে সক্ষম হন না। নিজের ভক্তি বৃদ্ধি একটু তীক্ষ্ণ দেখিয়াই যিনি আপনাকে ঈশ্বর ভক্ত বলিয়া বুঝিয়া লন তিনি নিজের উন্নতির পথে কাঁটা দেন।

মনুষ্যের অন্তরের ভাব স্বপ্নাবস্থায় যেমন প্রকাশ পায় জাগ্রতবস্থায় সামাজিক নিয়মের বশে থাকা নিবন্ধন সেরূপ প্রকাশ পায় না। সুতরাং আপনাকে পরীক্ষা কবিবার সমর্থ নিজের স্বপ্নাবস্থার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবে। যে পূর্ণা পদ্ধতি অবলম্বনে প্রেম বৃদ্ধির সঙ্গীর্ণতা ঘুচে না তাহা কখনই ঈশ্বরোপাসনা নহে।

বেদান্ত শাস্ত্রে মনুষ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। মনুষ্য, অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই কয়েকটি পদার্থের সমষ্টি।

মনুষ্যকে তাঁহার। যেমন এই পাঁচভাগে ভাগ করিয়াছেন সেইরূপ মনুষ্যের অঙ্গুরাগ বৃত্তিও পাঁচ ভাগ করা যাইতে পারে । যেমন স্থূল শরীরান্ধুরাগ, প্রাণান্ধুরাগ, মনের অন্ধুরাগ, বুদ্ধির অন্ধুরাগ, আনন্দান্ধুরাগ বা ঈশ্বরান্ধুরাগ । এখন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাল বাসা সম্বন্ধীয় ভাগগুলি কিরূপ তাহা মোটামুটি বুঝাই গুন ।

পাতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রের সূত্রে অন্ধুরাগ কথাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে “সুখান্ধুরাগঃ ।” অর্থাৎ যাহা পাইলে আমাদের সুখ হয় আমরা তাহাকেই ভাল বাসিয়া থাকি । মাতৃব শাস্ত্রেই সুখ খুজিয়া বেড়ান এবং যিনি যে জাতীয় সুখ খুঁজিতে সদাই ব্যস্ত তাঁহার অন্ধুরাগ বৃত্তিকেও সেই জাতীয় অন্ধুরাগ বলা যাইতে পারে ।

যিনি স্থূল শরীরের সুখে মুগ্ধ, তাঁহার ভালবাসা স্থূল জাতীয় । যিনি গায়েব জোব বাডাইবার জগুই ব্যস্ত, দিন রাত ঘাঘের জোরের ন্যায় আহারের তদ্বির করিতেছেন, ব্যায়াম কবিত্তেছেন, আব কোনও বিষয়ে লক্ষ্য নাই তাঁহাও ভালবাসা স্থূল শরীরের ভালবাসা ।

প্রাণ প্রকৃতি পঞ্চ বায়ু এবং হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্মোজ্জ্বল লইয়া প্রাণময় কোষ ।

ছা । প্রাণ প্রকৃতি পঞ্চ বায়ু কি কি ?

শি । বেদান্ত মতে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যাধান ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু । প্রাণ বায়ুর স্থান বক্ষঃস্থল, অপানের স্থান পাশুদেশ, সমানের স্থান নাভি দেশ, উদানের স্থান কণ্ঠ এবং ব্যাধানের স্থান সর্ক-শরীর ব্যাপী । প্রাণ পূর্ক-গমন শীল, অপানের গতি অব্যাহিকে, উদানের উর্দ্ধদিকে, সমান বায়ুর দ্বারা সমীকরণ হয় এবং ব্যাধান বায়ু সর্কদেহে গমনক্ষম ।

হা। প্রাণ বায়ু প্রকৃতি কথা শুনিতে কি ভাব ঠিক বুঝায় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শি। বাতি ইতি বায়ুঃ। যাহা বহে তাহাৰ নাম বায়ু, আত্ম কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ animal electricity ও nerve aura কথায় যেৰূপ পদার্থ বুঝেন আমাদের শরীরস্থ বায়ু কথায় অনেকটা সেই রকম অর্থ বুঝায়। শরীরস্থ বায়ুর গতি এই কথাটি আর ইংরাজী nerve current এই কথাটির অর্থ একইরূপ। যেৰূপ জীববীজ ক্রিয়া হইতে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য হইতেছে তাহা প্রাণ বায়ুর কার্য্য। যেৰূপ জীবনীয ক্রিয়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভুক্ত পদার্থ সকল বস্তু পরিণত হয় তাহা সঞ্চার বায়ুর কার্য্য। যে জন্ত শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চাৰিত হইতেছে তাহা ব্যায়ান বায়ুর কার্য্য এবং বাক্য উচ্চারণ প্রকৃতি কার্য্যের চেষ্টা উদান বায়ু হইতে জন্মে। হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা বলেন যে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু একই পদার্থ তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কৰ্ম্মে চেষ্টা জন্মায় বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম পাইয়াছে এবং এই এক পদার্থ সাধাবণতঃ প্রাণ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাণ পদার্থটি কোন জাতীয় তাহা যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের কথানুযায়ী না বুঝাইলে বুঝিতে না পার তবে আমি সেই রকমে প্রাণ কথার অর্থটি বুঝাই শুন।

লোহা একটি স্থূল জড় পদার্থ, কিন্তু সেই লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিলে উহা লোহা হইতে ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। রিসনব্যাক নামে একজন পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে চুম্বকে এমন এক প্রকার নূতন রকমের পদার্থ আছে বাহা লোহাৰ নাই। এই নূতন পদার্থটি বায়ু অপেক্ষাও হৃদয় পদার্থ। বাহাদের অল্পভূতি শক্তি (sensitiveness) একটু হৃদয় তাঁহারা চুম্বকের দুই প্রান্ত হইতে দীপশিখার ন্যায় একটি

আলোক বহির্গত হইতে দেখিতে পান ; যদি সূঁ দেওয়া যায় তবে দীপশিখার ন্যায় এই আলোক শিখাও চঞ্চল হইতে থাকে । এইরূপ আলোক উদ্ভিদ শরীর হইতে এবং জীব শরীর উদ্ভিদ বহির্গত হইয়া থাকে । রিসনব্যাক্ এই উজ্জ্বল পদার্থের অর্ড এই নাম দিয়াছেন । আজ কালকার সাইকিক্যাল রিসার্চি সোসাইটির গবেষণায় এই অর্ড নামক সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । আমাদের প্রাণ পদার্থ আর রিসনব্যাকের অর্ড পদার্থ বোধ হয় একই । রিসনব্যাক বলেন যে এই অর্ড পদার্থই উদ্ভিদ ও জীবের জীবনী শক্তির কারণ এবং আমাদের প্রাণ কথ্যাতো ঐ অর্ধ বুঝায় । কোন কোন লোক এই পদার্থকে স্নায়বীয় আভা (nerve aura) নাম দেন !

হস্ত, পদ, পাখু উপস্থ ও বাগেন্সিয় ইহারা পঞ্চ কর্মেন্সিয় । এই সকল ইন্ড্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা প্রাণ হইতেই জন্মে । যে কর্মেন্সিয়ে এই প্রাণ পদার্থের আধিক্য উপস্থিত হয় সেই ইন্ড্রিয় তখন উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই ইন্ড্রিয় সঞ্চালনের চেষ্টা জন্মে । এবং সেই ইন্ড্রিয় সঞ্চালিত হইলে, উক্ত প্রাণ পদার্থ কখন বা স্ফুলাকাবে পনিণত হইয়া কখন বা স্তম্ভাকাবেই, কর্মেন্সিয় পথ দিয়া দেহ হইতে বাহির হইয়া থাকে । কর্মেন্সিয় উত্তেজিত হইলে কর্ম দ্বারা যে সুখ লাভ হয় তাহাই প্রাণময় কোষের সুখ (pleasures of organic sensations) । উচ্চহাস্য, অনর্থক বাক্যব্যয়, মাদক দ্রব্য সেবনে প্রাণের উত্তেজনা, ইত্যাদি হইতে যে সুখ লাভ হয় তাহা প্রাণময় কোষের সুখের উদাহরণ । যিনি এই জাতীয় সুখাশ্বেনেই রত তাঁহার অনুরাগ প্রাণের অনুরাগ ।

এইবারে মনোময় কোষের স্মরণে কিরূপ সুখেচ্ছা জন্মে তাহা বলি শুন । পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্রিয় ও মন এই লইয়া মনোময় কোষ ।

দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় । আমাদের সংকল্প ও বিকল্প বাহা হইতে জন্মে তাহার নাম মন । কি করিব কি না করিব এই বিষয়ে একটা মতলব ঠিক করার নাম সংকল্প, বিকল্প কথার অর্থ পাতঞ্জলি বলেন যে “শকার্ধ্য জ্ঞানাত্ম-পাতো বস্তুশূন্য বিকল্প” “অর্থাৎ বস্তু নাই অথচ শব্দের অর্থ জ্ঞানাত্মসারে চিন্তের যে অবস্থা জন্মে তাহার নাম বিকল্প । ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে আমরা বাহ্যকে কল্পনা বলি (imagination) দর্শনশাস্ত্রে তাহাকেই বিকল্প বলে ।

মনোময় কোষের ক্ষুরণে যে স্বেচ্ছা জন্মে তাহা তিন প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে, ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছা, সংকল্প স্বেচ্ছা এবং বিকল্প বা কল্পনার স্বেচ্ছা । রূপ বসাদি বিষয় হইতে যে স্বেচ্ছা জন্মে তাহার নাম ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছা, সংকল্পাত্মবাহী কার্য সমাধা করিতে পারিলে যে স্বেচ্ছা তাহার নাম সংকল্প স্বেচ্ছা, অ্যাব মনে মনে একটি সৌন্দর্য্য পড়ার যে স্বেচ্ছা তাহা কল্পনার স্বেচ্ছা । যে অমুরাগ যে জাতীয় সুখাত্মশয়ী তাহাকে সেই জাতীয় অমুরাগ বলিতে পারি । ছেলেটি দেখিতে ভাল বলিয়া তাহাকে যে ভাল বাসি তাহা ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা, কিন্তু একাট ছেলেকে আমি এই ধরণে শিক্ষা দিতে চাই, এই রকমে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাই—এইরূপ সংকল্প প্রথমে স্থির কবিয যদি ছেলেটিকে মনের মতন করিতে পারি তবে তাহার উপর যে ভালবাসা জন্মে তাহা সংকল্পাত্মক ভালবাসা আর কবির কল্পনাত্মক অমুরাগ বলিতে পারি । *মনোময় কোষের ক্ষুরণের পর বিজ্ঞানময় কোষের ক্ষুরণ হইয়া থাকে, বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া বিজ্ঞানময় কোষ অন্তঃকরণের নিশ্চবাস্ত্বিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি । বুদ্ধির ক্ষুরণে নিশ্চয় কি, সত্য কি এই অনুসন্ধিৎসা প্রবল হয়, একটা জ্ঞানলালসা জন্মে, তখন অন্য

কোন প্রকার নিম্ন দরের সুখে বড় আস্থা থাকে না, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করিবার জন্য উৎসুক থাকে না, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান করাই বুদ্ধির কাজ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখাইয়া দেয় এবং বুদ্ধি দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে একতা অনুসন্ধান ব্যাপ্ত হই, এবং এইরূপে ব্যাপ্ত হওয়ার নামই বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞানময় কোষের সুরূপে বিদ্যান চর্চাতেই সুখ এবং যাহা এই বিজ্ঞান চর্চায় অমূল্য আমরা তখন তাহাদেরই ভাল বাসিয়া থাকি। এই বিজ্ঞানময় কোষের অনুরাগও সর্বোৎকৃষ্ট নহে। বিজ্ঞানময় কোষের সুরূপে পর আনন্দময় কোষের বিকাশ হইয়া থাকে, তখন চিন্তের যে অবস্থা জন্মে তাহা সধানন্দ অবস্থা, এই আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলে।

বুদ্ধি ও আত্মা লইয়া আনন্দময় কোষ। যে সূত্রে কুলদেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি একত্রে গাঁথা আছে, যে শক্তি নিবদ্ধন উহাদেব মধ্যে পরস্পর একটি ধনিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিয়া রহিয়াছে তাহারই নাম আত্মা। মনুষ্যের আনন্দময়কোষের সুরূপে বুদ্ধি আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানে উৎসুক হয়। আমি কি, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার কৰ্ম ইহাদের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ, আমার অন্তরের সহিত বহির্জগতের কি সম্বন্ধ—এই সকল বিষয়ের নিশ্চিত সত্য জানিবার জন্য আগ্রহতা জন্মে। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইলে অন্য সমস্ত পিপাসা দূরে চলিয়া যায়, সমস্তভূতে সম্মান অনুরাগ উপস্থিত হয়। তাঁহার সহিত চেতন অচেতন পদার্থ সকলের কি সম্বন্ধ এই বিষয়ক জ্ঞান দেখানে পান সেই ধানেই তাঁহার অনুরাগ জন্মে অন্য কোনরূপ অনুরাগে তিনি মুগ্ধ হন না,

এইরূপ জ্ঞান চর্চা করিতে কবিত্তে ক্রমে তিনি বুদ্ধিতে পারেন যে তাঁহার সহিত সকল পদার্থেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে সুতরাং সকল পদার্থ হইতেই তিনি তাঁহার আনন্দদায়ক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহার জ্ঞান পিপাসা নিবারক অমৃত সকল পদার্থেই দেখিতে পান, যদি কেহ তাঁহার শত্রুতাচরণ করে তবে শত্রুর মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া সেখান হইতেও জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, তাঁহার অভিলাষিত সুখ প্রদানে সর্বদুঃখই অল্পকুলাচরণ করে সেই জন্য সকল পদার্থকেই তিনি সমান ভাল বাসেন। তাঁহার ভালবাসার ইতর বিশেষ থাকে না এইরূপ সমদর্শীতাকেই ঈশ্বরানুরাগ বলা যায়। এইরূপ আনন্দময় কোষের সুরণ জনিত আনন্দ নাকি অনির্বচনীয়।

পবিত্রতাময় শাস্তিসুখময় এই আনন্দ যে কিরূপ তাহার আন্বাদন পাইবার জন্ত যত্ন করি এস, এই আনন্দের নাম গুনিয়া মন মাঝে মাঝে উহার জন্ত ব্যগ্র হয়, কিন্তু চঞ্চল মন অন্য অমুরাগে আবার ফিরিয়া আসে, এস চুজনে মিলিয়া অগ্রসব হইবার চেষ্টা করি, আমি যদি হতাশ হইয়া ফিরিতে চাই-তবে তুমি আমাকে উৎসাহ দিবে আর তুমি যখন হতাশ হইবে আমি তোমাকে সাহায্য করিব। যে আনন্দের আন্বাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জগৎ যাতায়াত করিয়াছেন তাহার কণামাত্র পাইলেই আমরা চরিতার্থ হইব। এই আনন্দময় কোষের শাস্তিময় ভাব যতদূর কল্পনা করিতে পারা যায়, ঈশ্বর কথাটির সহিত সেই ভাব সংশ্লিষ্ট করিতে শিখ, যখন সঙ্কীর্ণ অমুরাগের প্রাধান্য অন্তরে জন্মিবে তখন ঈশ্বর বা ঈশ্বর কে ইহা ভাবিতে ভাবিতে যেন বিষয়ানুরাগ দূরে চলিয়া যায়, আর পবিত্র সমদর্শীতা ভাব বুদ্ধির ভাব অন্তরে উদয় হয়। ইহারই নাম ঈশ্বর যত্ন সাধনা।

হা। আপনি অনুবাগ বুঝিকে বে কয় একাব লাগ করিলেন তাহা আমি বড় ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না।

শি। ভালবাসার দুটি অঙ্গ একটি বিবহ ও অঙ্গটি মিলন, বিবহের ভিতরে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, মিলনে সেই চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়। প্রীতিতত্ত্ব আলোচনা কবিবার জন্য নিজেব ভিতরের চাঞ্চল্য কখন কিরূপ-মিলনে শান্তিভাবে পায় তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবে।

যখন দেখিবে যে শবীরে কোন রোগ নাই অথচ অন্তর চঞ্চল হইতেছে এবং কোন না কোন কর্ণেল্লির চালনানায় সেই চাঞ্চল্য নিবাসিত হইল তখন উহাকে প্রাণময় কোণের চাঞ্চল্য বুঝিবে। কিন্তু যখন তাহাতেও চাঞ্চল্য পামে না কিন্তু রূপ দর্শন বা সঙ্গীতাদিতে ব্যাপৃত থাকায় সে চাঞ্চল্য মিটিয়া যায় তখন উহাকে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, যখন তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা মিটে না, নিজের সংকল্পানুযায়ী অপব কাহাকেও চালাইতে ইচ্ছা জন্মে—এবং তাহা না কবিত্তে পারিলে বিরক্তি জন্মে—তখন মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যখন দাস দাসী পুত্র কলত্র বন্ধু সকলেই তোমার সংকল্পানুযায়ী চলিতেছে অথচ নিজের কল্পনায় নিজে আর তৃপ্ত হইতেছে না—একটা জ্ঞান পিপাসা ভিতরে উদয় হইয়াছে, কাহার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে পার, সেই অবেষণে ব্যস্ত হইয়াছে তখন বুদ্ধির অনুবাগ উদয় হইতেছে বুঝিতে হইবে। শেষে সেই অনুবাগ উৎকর্ষতা পাইলে ঈশ্বর প্রীতি জন্মে। বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিলে কিরূপ চাঞ্চল্যকে বুদ্ধির চাঞ্চল্য বলে তাহা বুঝা যায়।

ক্রমে ক্রমে নিরনিকের ভালবাসার চক্র হইতে উপরের চক্রে উঠিতে হয়, যিনি মাথের কোন চক্রে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকেন তিনি ঈশ্বর প্রীতির আশ্বাদ পাইতে সক্ষম হইবেন না। যদি ঈশ্বর

প্রীতি কি তাহা শিখিতে চাও তবে প্রেমের স্বপ্নন যে চক্রে পতিত হইবে তাহাতে আসক্ত হইও না, নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে চেষ্টা কর। কিরূপে সেই চক্র হইতে উদ্ধার হইতে পার সতত তাহারই অন্বেষণ কর, সম্ভবতাব ভিন্ন অন্য সকল প্রকার প্রেমে বৈরাগ্যই ঈশ্বর প্রীতির লক্ষণ। ঈশ্বর প্রীতি ভিন্ন আর সকল প্রকার প্রীতিই সাকার, সম্ভবতাব ভিন্ন অন্য প্রেম চাকল্য উদ্দীপিত করিয়া যে উপাসনা করা যায় তাহা নিরাকার ঈশ্বরের কাছে পহঁছায় না।

ছা। প্রীতি আবার সাকার নিরাকার কি?

শি। বাহার রকমভেদ আছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন আকার আছে, আর বাহ্য একাকার তাহাই নিরাকার। আ=সম্যক জিগ্মসে অভিযুক্তে অনেন ইতি আকার। বাহ্য দ্বারা একটি পদার্থকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক ভাবে ভাবা যায় তাহাট আকার। যেখানে পৃথক্য আছে তাহারই আকার আছে। ইংরাজী ফরম (Form) কথাটির আর আকার কথাটির অর্থ একই রূপ। এক জনের উপর তোমার যে আকারের ভালবাসা, আর একজনের উপর সে আকারের ভালবাসা নাই, এইরূপ কথা বখন প্রয়োগ করি তখন এই অর্থ বুঝি যে তোমার ভালবাসার রকম ভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর প্রীতির রকম ভেদ নাই, ঈশ্বর প্রীতি একাকার, বাহ্য একাকার তাহাই নিরাকার। দেখ বুদ্ধির কাজ বিভিন্নতার মধ্যে একতা অনুসন্ধান কর। প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন আকার সকল আলোচনা করিয়া তাহাদের ভিত্তি যিনি একাকার দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি ঈশ্বর প্রীতি কিরূপ বুঝিতে পারেন।

এই সকল বুঝিয়া ঈশ্বরোপাসনার পথে অগ্রসর হইতে শিখ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ।

ছাত্র । আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এ দুইটি কথার অর্থ কি একই রকম ?

শিক্ষক । আজ কাল ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুই কথাতে অনেকে একইরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এই দুটি কথায় বড় প্রভেদ আছে, এবং এই প্রভেদটি সকলেই জানা আবশ্যিক । এই প্রভেদটি বুঝিলে সাংখ্যিকার বাপিগদেবকে আর কেহ নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না । বেদান্তশাস্ত্রের ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ কথাটির ‘একং’ কথাটি যে অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম । সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং আনন্দ স্বরূপ যে পদার্থ তিনি অল্প কোন নিত্য পদার্থ নাই তাহারই নাম ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম পদার্থটি কি ইহাই অন্বেষণ করা সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । এই জগতে নিত্য পদার্থ এক ব্যতীত আর দুই নাই ইহাই বেদান্তের মত এবং নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম । সাংখ্যিকার বাঁহাকে পুরুষ বলেন তিনিই ব্রহ্ম । ইনি নিগুণ, সৰ্ব্বরস তম এই তিন গুণের অতীত । ইনি সৃষ্টিকর্তা নহন কিন্তু ইহার আভা প্রকৃতিগুণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতেছে । হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সকলেই মতে জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, আর প্রকৃতি অনিত্য পদার্থ, কেন না কালের বশে প্রকৃতির অনবরত পরিবর্তন হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের কখনও কোন পরিণাম নাই । আমি তোমাকে

বিশ্বের সমষ্টি শক্তি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলিয়াছি সেই সমষ্টি শক্তিই ব্রহ্ম। এইবারে ঈশ্বর কথাটিতে দার্শনিকগণ কি অর্থ কবেন তাহা বলি শুন। যোগী পাতঞ্জলিৰ যোগশাস্ত্রের নামই সেস্বর সাংখ্য শাস্ত্র, তিনি ঈশ্বর কথাটির এইরূপ অর্থ করেন।

ক্লেশ কর্মবিপাকশব্দৈব পরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।

স পূর্ববায়পি শুকঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।

প্রণবস্তস্য বাচকঃ।

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশ্ব কৰ্ত্তৃক যিনি পরামৃষ্ট হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

তিনি জগতের আদিগুরু, কাল কৰ্ত্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব মন্ত্র সেই ঈশ্বরের বাচক।

এক্ষণে দেখ পাতঞ্জলির ঈশ্বর কথায় জগতের সৃষ্টিকর্তা বুঝায় না। যিনি অজ্ঞান জীবগণের শুক স্বরূপ, যিনি জীবের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন সেই জগৎ শুকব নাম ঈশ্বর। হিন্দুদর্শনকারগণ বলেন যে অজ্ঞান হইতেই জীবের সৃষ্টি হয় এবং এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়, যাহার আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর হয় সেই সূর্যাস্বরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

সাংখ্যকার কপিলদেবের সাংখ্যক শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে, কিন্তু কেন যে তাঁহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পাতঞ্জলি ঈশ্বর কথার যে রূপ অর্থ করিয়াছেন, সাংখ্যকার ও ঈশ্বর কথার সেইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলেন যে সকল পুরুষ অজ্ঞানমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, যাহারা পূর্বে ভিন্ন পুরুষ ছিলেন কিন্তু মুক্ত হইয়া যাহারা একাত্ম

হইয়াছেন, (তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাকে বলাই যুক্তি-যুক্ত হয়) ঈশ্বর নাম দেওয়া যায় । ইনি যুক্তাবস্থা প্রাপ্ত সূতরাং ক্লেশ কর্দ বিপাক এবং আশয় কর্তৃক অপরাহুট, সূতরাং পাতঞ্জলি যাহাকে ঈশ্বর বলেন কপিলদেব ঈশ্বর কথাতে সেই অর্থই বুঝিতেন তথাপি তাঁহার শাস্ত্রকে নিরীখ্য সাংখ্য কেন বলা হইয়াছে তাহা বলি শুন ।

পাতঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন-প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একটি অঙ্গ । কিন্তু কপিলদেব এই কথা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্ত ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে । কপিলদেব বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ যুক্ত পুরুষ-গণের আভা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য যোক্তের পথ কি তাহা বুঝিতে পাবে, চিত্ত নির্মল কবিত্তে পাবিলে ঈশ্বরের আভা তাহাতে পতিত হইবেই হইবে, সূতরাং যে কোন উপায়ে হউক চিত্ত নির্মল করিতে পারিলেই যুক্তির পথ দেখিতে পাওয়া যায় ; ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত যে অন্য উপায়ে চিত্ত নির্মল হয় না একথা তিনি বলেন না , যোগী পাতঞ্জলি ও তাহা বলেন না বটে, তবে পাতঞ্জলির সাধন প্রণালীতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ প্রণবার্ঘ চিন্তা এবং প্রণব জপ একটি প্রধান অঙ্গ কপিলের মতানুযায়ী ঈশ্বর প্রণিধানের বেশী দরকার নাই । এই জন্যই কপিলের শাস্ত্রকে নিরীখ্য সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রকে সেখর সাংখ্য বলা হয় ।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত পক্ষে আসল কথায় সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন ।

ঈশ্বর অর্থে জগৎ গুরু, আদি গুরু। যখন দেখিবে যে মোক্ষ লাভের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে তখন জানিও যে তোমার চিন্তে ঈশ্বরের আত্মা পড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে সাধক শয দশ উপরতি তিতিক্কা শ্রদ্ধা সমাধান এই ষট্‌গুণে ভূষিত হইলে তবে তাঁহার মুমুক্শুত্ব জন্মে। ষাঁহার এই মুমুক্শুত্ব জন্মে নাই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী নহেন।

যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মাব তাহার নাম যোগ। এই যোগ আবার প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক অব্যক্তের উপাসনা এবং অন্যটি ঈশ্বরোপাসনা। এট দুই প্রকার উপাসনাবই প্রশংসা গীতাশাস্ত্রে করিত আছে। অধিকারী ভেদে একপ্রকার উপাসনা অন্য প্রকার উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিবাছেন যে—

ক্লেশোধিকতরন্তেবাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং ।

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবন্তিব বাপ্যতে ॥

ষাঁহারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা অব্যক্তাসক্ত চেতা হইলে অধিকতর কষ্ট পান, বাহ্য ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভিমानीগণের চিন্তা প্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনা দ্বারা তাহারা দুঃখই পাইয়া থাকে। দেহ আমরা এইরূপ দেহাভিমानी লোক সুতরাং আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুঃস্থ ব্যাপার সেই জন্য ঈশ্বর উপাসনাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত।

হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের মতে জগৎ গুরু ঈশ্বর অব্যক্ত-ভাবে সদাই বিরাজমান আছেন কিন্তু অব্যক্তের আত্মা সাধারণের চিন্তে প্রতিবিম্বিত হয় না বলিয়া সময়ে সময়ে কোন দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ জনকে ধর্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃকৃতাং ।

ধর্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবানি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা গীতাব বলিয়া দিয়াছেন । বৌদ্ধগণের এই-রূপ বিশ্বাস যে ধ্যানীবুদ্ধ সময়ে সময়ে কোন মনুষ্যদেহে আশ্রয় করিয়া জীবগণের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন । ঈশ্বর যখন এইরূপ কোন দেহাশ্রয়ী হন তখন তিনি ব্যক্তভাবে মনুষ্যজ্ঞান সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলা যায় । এইরূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের সাহায্যে মোক্ষের পথ অসুসন্ধানের নাম ব্যক্ত উপাসনা ।

একটি কথা তোমাকে এইখানে বলা কর্তব্য যে ঈশ্বর কোন দেহ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন বলিয়া সেই দেহকে যেন ঈশ্বর বলিয়া বুঝিও না । শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইহারা ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরাত্মক কিম্বৎ যদি কৃষ্ণ উপাসক বা বুদ্ধ উপাসক হইতে চাও তবে তাঁহাদের দেহের রূপকেই যেন ঈশ্বর জ্ঞান করিও না । ঈশ্বর, দেবকী পুত্রের শরীরে অবতীর্ণ হইলে ও দেবকী পুত্রের মনুষ্যরূপকে ঈশ্বরের রূপ মনে করিও না । দেবকী পুত্রের বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও । এইটি শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করিতে শিখ তবেই ঈশ্বর তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিবেন, ব্রহ্ম কি পদার্থ তখন বুঝিতে পারিবে ।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করা কথাটির অর্থ একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন ।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি সত্য স্বরণ রাখিও, তাহার পর যে অবতারের নামে তোমার সহজেই ভক্তি আসে, তাঁহাকেই গুরু জানিয়া,

জ্ঞান উপার্জনের চেষ্টা কর ক্রমে সেই গুরুকে বিশ্বরূপ জানিয়া বিশ্বকেষ্ট শুক স্বরূপ দেখিতে শিখ। যতদিন না শুককে বিশ্বব্যাপী বলিয়া অন্তরের প্রত্যয় জন্মিবে ততদিন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয় নাই জানিও।

যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার শুক। জগতের সর্বত্রই বিজ্ঞমান আছেন, ফলে ফুলে, নদীতে সমুদ্রে, মনুষ্য-দেহে মনুষ্যচিত্তে সর্বত্রই আমার শুক বিজ্ঞমান আছেন। গাছের ফুলটি আমায় শিক্ষা দিয়া থাকে, ফুলটির নিকট হইতে চের শিথিতে পারি, একটি পাঁচ মাসের শিশুর নিকট হইতে কত জ্ঞান পাই, যে দিকে দেখি সেই দিকেই সকলে আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যয় চিন্তে জন্মিলে তবেই শুকদেব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। জ্ঞান লাভের প্রকৃত ইচ্ছা যদি অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে কোন পদার্থই চিন্তের অবলম্বন হউক না তাহা হইতেই সত্য তথ্য কত জানিতে পারা যায়। যখন হুই বৎসরের একটি ছেলের দিকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে চাহিয়া দেখি, তখন সেই হুই বৎসরের ছেলেই আমার গুরু, কেন না তীব্র জ্ঞান লাগসাবশতঃ সেই ছেলের দেহেই তখন ঈশ্বরের অবির্ভাব হয়। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কিন্তু সকলে তাহা দেখিতে পায় না। জ্ঞান লাগসার তীব্র সংবেগ উপস্থিত হইলে আমাদের এমন একটি ইন্দ্রিয় ক্ষুরিত হয় যাহার সাহায্যে জগৎগুরু ঈশ্বরকে সর্বভূতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই পদার্থকে যখন যে ভাবে দেখিবে তখন উহা সেই অনুযায়ী আকার ধারণ কবে। ক্ষুধার্ত হইয়া যখন একটি সুপক্ক ফলের দিকে দৃষ্টি কব তখন উহা তোমার ক্ষুধা শক্তির উপযোগীতার আকার ধারণ করে, আবার যখন জ্ঞান পিপাসার কাতর হইয়া ঐ ফলের দিকে দৃষ্টি

কর তখন উহাই জ্ঞানদাতার আকার প্রাপ্ত হয় । জগতে শত্রু নাই, মিত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেহ নাই, কেবল গুরু আছেন এই প্রত্যয় দৃঢ় কবিত্তে চেষ্টা কর তাবই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা কবিত্তে শিখিবে । যদি প্রকৃত জ্ঞানলালসা জন্মিয়া থাকে তবে স্পষ্টবুদ্ধিতে পারিবে যে তোমার পবন শত্রু যে তোমার শত্রুতাচরণ করিতেছে তাহার ভিতর হইতে একজন তোমাকে জ্ঞান দান করিতেছে ।

দেখ, আমার গুরুর রূপ তোমাকে বলি শুন । অব্যক্ত ব্রহ্ম আমার গুরুব আয়া, আদিত্যলীন ঋষিগণ তাঁহার চিত্ত, এই পৃথিবীতে যে সকল মহাশয় বা ধর্মশাস্ত্র সকলের গুণ্যতাব বহন কবিত্তেছেন তাঁহাবাট তাঁহার মুখ, বুদ্ধলতা যথুয্য সমাকীর্ণ ভূতশ তাঁহার দেহ, কর্মীগণ তাঁহার হাত ইত্যাদি ।

ছা । মহাশয় ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্যাপী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইহাদের ঈশ্বরবাব অবতার বলিয়া মানিবাব প্রয়োজন হয় ।

শি । শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব যোদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগতের হিত-সাধন জন্য যে সকল জ্ঞান বিতরণ কবিয়া গিয়াছেন, সেই জ্ঞান লাভেচ্ছায় তাঁহাদেব শরণাপন্ন হইতে ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ দেয় । মানুষ যবে না এটা জানিয়া বাধিও । শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব স্থল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা আমাদের ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা আপনাদিগকে সর্বভূতস্থ দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাই স্থল দেহ ত্যাগ করিয়া সর্বভূতস্থ হইয়া আছেন । সাধারণ মানুষে, মানুষকে যত ভাল বাসিতে পারে, অন্য কোন পদার্থ কিম্বা অব্যক্ত পদার্থকে তত ভাল বাসিতে পারে না, সেই জন্যই ঈশ্বর সমখে সমখে মানুষ দেহ আশ্রয় কবিয়া মোহিনী শক্তি আশ্রয়

করিয়া সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া মনুষ্য বিশেষের প্রতি তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই উন্নত মনুষ্যেব মুখ দিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান পূর্ণ অমৃতময়ী বাক্য সকল বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, অবতাব বিশেষের প্রতি ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসব হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং ব্যক্ত ভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপাসকগণকে ঘৃণা করিও না, বরং অধিকারীভেদে এইরূপ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া জানিও। কেন না—

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহন্তি রবাণ্যতেঃ।

কিন্তু একটি কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, যে অবতাব বিশেষে মানুষের ভক্তি সহজেই উদয হয়, তাঁহার মনুষ্য মূর্তিকেই ঈশ্বরের, মূর্তি বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের মূর্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার, তিনি জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য অবতার বিশেষের শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। আসল কথা এই যে ঘাঁহার চিত্তে ঐশ্বরিক আলোকের আভা নির্মলতাব প্রতিবিম্বিত হইতে পায়, তাঁহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারা যায়।

ছা। কোন ব্যক্তির চিত্ত পূর্ণ নির্মলতা পাইয়াছে এবং কোন ব্যক্তির তাঁহা হয় নাই ইহা কেমন কবিয়া বুঝিতে পারা যাইবে ?

শি। ইহাত তোমার একবার পূর্বে বলিয়াছি যে, যিনি “সর্ব ভূতহৃদায়ানং সর্বভূতানিচাস্তনি” আপনাকে সর্বভূতস্থ এবং সর্ব ভূতকে আপনাতে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্ত প্রকৃত নির্মলতা পাইয়াছে। যিনি ক্লেশ শূন্য, ঘাঁহার কর্ম নিষ্কাম, যিনি সদানন্দ তাঁহারাই চিত্ত নির্মলতাবাপন্ন হইয়াছে বলিয়া বুঝিও।

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা বাহ্যাব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের প্রথমে নামে ভক্তি স্থাপন করিতে শিখা কৰ্ত্তব্য। যখন দেখিবে নামে ভক্তি হইতে জ্ঞান লালসা ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন জানিও যে ভক্তির পরিপক্বতা উপস্থিত হইয়াছে, জ্ঞানময়ী ভক্তিই প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তি, এইজ্ঞান লালসা পবিত্র করিবার জন্য যখন ঈশ্বর তত্ত্বভিজ্ঞ সাধুজনের সঙ্গ কামনা প্রবল হইবে, যখন সৰ্ব্বভূতেই গুরু অধিষ্ঠান দেখিতে পাইবে, তখন তোমার ভক্তিবীজ হইতে অকুর জন্মিয়াছে জানিও ক্রমেই সেই অকুর হইতে জ্ঞানময় আনন্দময় বৃহৎ অখণ্ডবৃক্ষের উৎপন্ন হইয়া, চারিদিকে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া গৌমার্ত্তজনকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইবে।

ঈশ্বর প্রীতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে চাই। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম জন্মিয়াছে কিনা ইহা জানিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উপায় বলিতেছি তুমি। দেখ যেকোন ভাল বাসাকে সাধারণতঃ প্রেম মেহ বা ভক্তি বলা যায়, ঈশ্বর প্রীতি সেরূপ ভাল বাসা নহে। প্রীতি তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে বাহ্যকে অহুরাগ বলি, যেহেতু তাহার আত্মসঙ্গিক। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই রাগ এবং তাহার আত্মসঙ্গিক যেহেতু ক্রেশের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যেহেতু সেরূপ ভাল বাসাব আত্মসঙ্গিক সেরূপ ভাল বাসা বাহ্যতে অন্তরে না আসিতে পায় তাহারই চেষ্টা কৰ্ত্তব্য। পাতঞ্জলির মতে ঈশ্বর প্রণিধানের আসল উদ্দেশ্যই তাই। যখন ঈশ্বর প্রীতি নিবন্ধন কাহারও প্রীতি বিবেচ্যতাব আর থাকে না তখনই প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি জন্মিয়াছে বলা যায়। ত্রিষ্টিবান যদি হিন্দুর প্রীতি বিবেচ্যতাবাপন্ন হন, নিরাকার উপাসক যদি সাকার উপাসকের উপর বিবেচ্যতাবাপন্ন হন, তবে তাঁহাদের ঈশ্বর প্রীতি জন্মায় নাই বলিতে

হইবে। ঈশ্বার অস্তর একেবারে ঘেঁষশূন্য হইয়াছে তাঁহাকেই প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত বলিয়া জানিও। যে অশ্রুবাগ হইতে গোঁড়ামী জন্মে সে অশ্রুবাগ ত্যাগ করিতে হইবে, কেন না গোঁড়ামী জন্মিলেই নিজের মত ছাড়া অন্য মতের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। এই সব কথা বুঝিয়া ঈশ্বর প্রীতি কি পদার্থ তাহা শিখিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরে অশ্রুবাগ এবং গোঁড়ামী ও ঘেঁষ ভাবের উপর সমস্ত ঘেঁষ বাধিয়া দিয়া, ঈশ্বর প্রীতি শিখিতে চেষ্টা কর।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

নিষ্কাম কর্ম ।

ছা। ভগবদগীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যে সকল কর্ম কামনা শূন্য হইয়া করা যায় তাহা আমাদের বদ্ধের কারণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যে কাজ করিবে, তাহাতে বেন আসক্তি না থাকে, কর্মফলে যেন স্পৃহা না থাকে। একটি ছেলে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি সেই লেখা পড়ার আসক্তি না থাকে সে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি লেখা পড়ার এলাকাডা দিবে একপ এলাকাডা দেওয়াকে কি ধর্ম বলিতে পারা যায়।

শি। তুমি নিষ্কাম কর্ম কথাটির অর্থ ঠিক বুঝ নাই। কর্তব্য কর্মে এলাকাডা দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নিষ্কাম কর্ম করা হয় না। উৎসাহের সহিত কর্তব্য কর্ম সাধন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে অথচ কর্ম ফলে স্পৃহা থাকিবে না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমি একটি উদাহরণ দিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন ছেলেরা ছুটাছুটি খেলা করিতেছে দেখিতেছিলাম। খেলায় হার হউক বা জিৎ হউক সে বিষয়ে কেহই উৎকণ্ঠিত নহে, তাহাবা খেলা করিবার জন্য খেলা করিতেছে। এরূপ খেলায় ছেলেদের বড়ই উৎসাহ তাহা তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ। এই ছেলেদের খেলাব বিষয় মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে কর্মফলে স্পৃহা না থাকিলে যে কর্মে উৎসাহ থাকিবে না ইহা কোন কাজের কথা নয়।

অনেকে এরূপ অলস যে তাঁহাদের কোন কৰ্মেই গা নাট। অদৃষ্ট বলে যা হইতেছে হউক এইরূপ ভাবিয়া সকল কৰ্মেই, যত্ন ও উৎসাহ বিহীন হইয়া চুপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলে না। কর্তব্য কৰ্ম না করাই এক কৰ্ম। কর্তব্য কৰ্ম সাধন করিয়া তাহার ফললাভে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও অলস ব্যক্তি কর্তব্য কৰ্ম না করায় যে ফল তাহাতে আসক্ত। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুক। কর্তব্য কৰ্ম সাধন করিতে অনেক যত্ন অনেক চেষ্টা করা রূপ কষ্ট আছে সেই কষ্ট বাহাতে না পাইতে হয় অলস ব্যক্তির সেই আকাঙ্ক্ষা। এইরূপ অকৰ্ম অর্থাৎ কৰ্ম না করাকে, বন্ধের কারণ কৰ্মের ন্যায় দেখিবে—ঐহিক এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।—

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যোযু স যুক্তঃ কৃত্ব কৰ্মকৃত্ব ॥

কর্তব্য কৰ্মকে অকৰ্ম বুক্তিতে হইবে অর্থাৎ কর্তব্য কৰ্ম সাধন করিতে হইবে কিন্তু আমি ঐ কৰ্মের কর্তা এইরূপ অভিমানশ্রুত হইতে হইবে। আমি করিতেছি না, এইরূপ জ্ঞান জন্মাইলেই ঐ কৰ্ম আমার পক্ষে অকৰ্ম হইবে। এবং অলস হইয়া কর্তব্য কৰ্ম সাধন না করা যে অকৰ্ম তাহাকেই কৰ্ম জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ অকৰ্ম ও বন্ধের কারণ।—অর্থাৎ চরম উন্নতি বুক্তির পথের কটক বুক্তিতে হইবে। যিনি এইরূপ বুঝেন তিনি বদৃদ্ধা প্রাপ্ত সমস্ত কৰ্ম করিয়াও পরম পদে যুক্ত।

এই সংসারক্ষেত্রে আমরা খেলা করিতে আসিয়াছি। বাহার যেরূপ কর্তব্য কৰ্ম তাহা করিয়া যাই এস। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কৰ্মের যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখা যায়, সে ফলের উপর কোন লক্ষ্য রাখিয়া

কাজ নাই। সকল কর্ম সাধনের এক চরম ফল আছে সেই ফল আত্মজ্ঞান বা মোক্ষপদ বা ঈশ্বরে লীন হওয়া, সদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে অভ্যাস করি এস। কোন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন it is not the goal but the course that makes us happy ভিন্ন ভিন্ন কর্মের ভিন্ন ভিন্ন কর্মফল স্বত্বে এই জ্ঞানটি রাখা উচিত, যে কর্ম করাটিই সুখ, কর্মফল পাওয়াটি সুখ নহে।

যে ছেলে লেখা পড়া শিখিতে এলাকাডা দিবে সে তাহার ঐ এলাকাডা দেওয়া কর্মের ফল পাইবে। লেখা পড়া শিখিয়া উপাধি পাব পুরস্কার পাব বা পবে ধন উপার্জন করিতে পারিব, এই সকল সম্বন্ধস্থিত ফলের প্রত্যাশী হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে যাওয়া নিষ্কাম কর্ম নহে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে বদ্ধ করা কর্তব্য কর্ম এই জন্য লেখা পড়া শিখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করাই নিষ্কাম কর্ম। সকল প্রকার কামনা শূন্য হইবে, কর্মফলে কখন আসক্তি রাখিবে না—গীতাশাস্ত্রে এই উপদেশ বরাবর কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই কর্মফল কথায়, মোক্ষ ফল ব্যতীত অন্যান্য কর্মফল—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কামনা অর্থে ভেগৈশ্বর্য্য সুখে কামনা, মোক্ষফল পাইবার আগ্রহকে কামনা বলে না। নিষ্কাম হও এই কথার অর্থ সমস্ত অনিত্য সুখের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ পাইবার জন্ত লালারিত হও।

এমন অনেক অজস্র ব্যক্তি আছেন যাহারা মনে করেন যে তাঁহাদের কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেটি ভ্রম। আমাদেরই ইচ্ছাবৃত্তি কোন না কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিবেই থাকিবে। সাধারণতঃ এই ইচ্ছাবৃত্তি নানারূপ ভোগ্য বিষয়েই লিপ্ত থাকে। নিষ্কাম বশে এই শিক্ষা দেয় যে তোমার ইচ্ছাবৃত্তি বাহ্য এখন নান্য বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাকে সেই সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া কেবল

একমাত্র নিত্য পদার্থ ঈশ্বর প্রীতিতে সংযুক্ত কর। যেমন সূর্য্য রশ্মি আস্তশি কাচের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়া একটি বিন্দুতে জমা হইয়া প্রথরতর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের সমস্ত ইচ্ছা, এক ঈশ্বরপদ জাতে যোজনা করিয়া, সৎ ইচ্ছাব প্রথরতা বৃদ্ধি করাই, নিষ্কাম ধর্মের উদ্দেশ্য ।

ছা । এখন বুঝিলাম যে চূপচাপ করে, যা হচ্ছে হউক এতরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকিলেই নিষ্কাম হওয়া হয় না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কোনটি আমার কর্তব্য কর্ম আর কোনটিই বা কর্তব্য নহে তাহা কেমন করিয়া বুঝিব।

শি। ঐ বুঝা একটু শক্ত কথা। মনুষ্যের কি কর্তব্যকর্ম এবং কোন কর্মই বা কর্তব্য নহে এই বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে কিছু বলিতে চাই। কিন্তু এই বিষয়টি আমি যে তোমাকে কোন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব সেরূপ সাধ্য আমার নাই। শ্রীমদ্ভগবৎ বলিয়া গিয়াছেন ‘গহণা কর্মণোগতিঃ’। (৪র্থ অ, ১৭ (গীতা) কর্মের গতি বুঝিতে পারা অতি দুর্জের। যিনি কর্মের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এ জগতে তাঁহার আর কিছুই জানিতে বাকি নাই। যে কর্ম বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা কর্মের গতি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা কবিয়াছেন জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তিনি বুঝিয়াছেন কেননা কর্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই এই জগৎ চক্র ঘুরিতেছে।

কর্ম সম্বন্ধে প্রথমে ইহা জানা উচিত যে তোমারও পক্ষে যে সকল কর্ম কর্তব্য আর একজনের পক্ষেও যে সেই সকল কর্মই কর্তব্য তাহা নহে। আজ তুমি যেক্রপ অবস্থায় আছ তাহাতে তোমার পক্ষে যেক্রপ কর্ম কর্তব্য, কাল হরত সেই কর্মই তোমার কাছে অকর্ম। অর্থাৎ দেশ

কাল ও পাত্রানুযায়ী কর্মের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিচার করিতে হইবে ।
আমার পক্ষে বাহা ধর্ম তোমার পক্ষে হয়ত তাহাই অধর্ম ; সেই জন্যই
শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন যে,

“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ” ।

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটির অর্থ যত দূর বুঝাইতে পারি তাহাই
বুঝাইব ।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য পূর্বসঞ্চিত কর্মানুসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি
লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল বিশেষ বিশেষ
দৈবঘটনা স্রোতে পতিত হইয়া থাকে তাহাও তাহাদের পূর্বসঞ্চিত
কর্মের ফল । আমাব ইচ্ছা না থাকিলে ও আমাকে যে ঘটনাব অধীন
হইতে হয়, যে সকল ঘটনাকে অকস্মাৎ ঘটনা দৈবাৎ ঘটনা বলিয়া থাকি
সেই সকল ঘটনায় যে আমাকে পতিত হইতে হয় তাহা আমার পূর্ব-
সঞ্চিত কর্মের ফল জানিও, আমাব পূর্বসঞ্চিত কর্মের সহিত ইহ
জীবনের যে কন্মশৃঙ্খলের একতান সম্বন্ধ (Harmony) আছে সেই
কর্মই আমাব স্বধর্ম । এবং এই স্বধর্ম সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া
গিযাছেন,

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্যাং সমুশ্রিতাৎ ।

স্বধর্মো নিধনং শ্রেয় পরধর্মভয়াবহঃ ।

ছা । আপনি স্বধর্ম সম্বন্ধে আমাকে বাহা বলিলেন আমি তাহা
বড় বুঝিতে পাবিলাম না ।

শি আমি তোমাকে বাহা বলিলাম, তুমি নিজের মনে সেই সকল
কথা লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলে পর আমার কথার অর্থ বুঝিতে
পারিবে, যে, যে বিষয় লইয়া নিজে কখন ভাবে নাই সে বিষয়ের কথার

ভাব সহজে তাহার মনে অঙ্কিত হয় না। স্বধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি কথা তোমাকে প্রথমে বলি শুন।

আমি যে ঘটনাস্রোতে ভাসিতেছি, মূল প্রযুক্তি অনুযায়ী কর্তব্যারা সেই ঘটনাস্রোতে সত্তরূপ দিয়া, কুল পাইবার চেষ্টা করাই স্বধর্ম। ঈশ্বরপদ অর্থাৎ নিত্য সুখময় ঘটনাস্রোতের কুল। সর্বদা সেই কুলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঁতার দিতে যাইও, নচেৎ আবর্তে পড়িয়া ডুবিয়া যাইবারট অধিক সম্ভাবনা।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার অর্জুনকে যে জ্ঞান বুঝে রত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলে স্বধর্ম কথাটির অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

কুরুক্ষেত্র বুঝে উপস্থিত হইয়া আত্মীয় নাশ-জনিত শোকে মোহ প্রাপ্ত হইয়া অর্জুন যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন সেই সময় তাঁহার কি কর্তব্য ইহা বিচার করিতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্ম সম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল ভগবদগীতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা গীতার পাতা উলটাইয়া উহার মর্ম সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছেন মনে করেন, তাঁহার গীতাকে নানা কারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু গীতার গুহ্যতাবের ভিতর যাহারা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারেন আর নাই পারেন, গীতার কথঞ্চিৎ রসান্বাদনেই তাঁহারা মোহিত হইয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রের সাহায্যে আমি এইরূপ বুঝি যে, যে ঘটনার অধীন হইয়াছি সেই ঘটনানুযায়ী এবং নিজের মূল প্রযুক্তি অনুযায়ী কর্তব্য করাই মনুষ্যের স্বধর্ম। অর্জুনের মূল প্রযুক্তি ক্ষত্রিয়-বৃত্তি। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইলেই যে তাঁহাকে কেবল যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে তাহা কর্তব্য নহে। কুরুক্ষেত্র সময়ে অর্জুনের যুদ্ধ করাই যে কেন কর্তব্য তাহার প্রধান কারণ গীতার ২য় অধ্যায়ের

৩২ শ্লোক হইতে বুঝা যায় । শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিতেছেন যে এই বুদ্ধ “যদৃচ্ছায়া উপপন্নঃ ।”

শ্লোকটি এই—

যদৃচ্ছায়া উপপন্নঃ স্বৰ্গধ্বংসপাতকঃ ।

সুখিনঃ কজ্জিরাঃ পার্শ্ব লভতে বুদ্ধযীদৃশং ॥

এই ‘যদৃচ্ছায়া উপপন্নঃ’ কথাটির ভিতর যে কত গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অনেকেই ভাবেন না । যদৃচ্ছায়া উপপন্নঃ অৰ্থাৎ যে ঘটনা আমি খুঁজি অথচ বাহা আমার সম্মুখে উপস্থিত, পূৰ্ণসঞ্চিত কৰ্ম্মই তাহার কারণ । এইরূপে অপ্ৰাৰ্থিত ঘটনার সাহায্যে ইহজীবনের কৰ্ম্মদ্বারা পূৰ্ণ-জন্মকৃত কৰ্ম্মকৰ্ম্ম করাষ্ট স্বধৰ্ম্ম ।

প্ৰযুক্তির শাস্তিতেই সুখ এবং প্ৰযুক্তির শাস্তি করাষ্ট ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম । এবং যদৃচ্ছা প্ৰাপ্ত বিষয়ের সাহায্য লইয়া প্ৰযুক্তির শাস্তিভাব আনয়ন করিতে যাওয়াই স্বধৰ্ম্ম । যুদ্ধ বিষয়ে অৰ্জুনের স্বভাবিক প্ৰযুক্তি । কুরুক্ষেত্রে সময়ের সময়ে অৰ্জুনের সেই প্ৰযুক্তি শাস্তিভাব ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি কুরুক্ষেত্রে সময় বিষয়ে আকুল হইবাই বুদ্ধে প্ৰস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং এইরূপ অযাচিত বুদ্ধ অবলম্বন করিয়া, কৰ্ম্মফল লক্ষ্যে সমৰ্পণ করিয়া প্ৰযুক্তি অশুভায়া কাৰ্য্য করাই অৰ্জুনের পক্ষে কৰ্ত্তব্য, ইহাই গীতার অভিপ্ৰায় ।

হা । অৰ্জুন যখন বুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধবিষয় হইতে বিরত হইবার অভিপ্ৰায় প্ৰকাশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বুদ্ধে যে প্ৰযুক্তি ছিল ইহা কিরূপ বলা যাইতে পারে ? পূৰ্বে তিনি বদ্ধবধ-জনিত অনিষ্ট সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই, সেই জন্ত বুদ্ধের জন্ত প্ৰস্তুত হইয়াছিলেন, সেই অনিষ্ট বিষয় চিন্তা দ্বারা তাঁহার বুদ্ধবিষয়ক প্ৰযুক্তি শাস্ত

হওযাতেই তিনি বুদ্ধে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন স্মৃতরাং তাঁহার পক্ষে বুদ্ধ কবা কিরূপে ধর্ম হইতে পারে।

শি। মহুষ্যের প্রবৃত্তি অগ্নিব স্বরূপ। পূর্বজন্মার্জিত কর্ম এই অগ্নিব ইন্ধন, বিষয় বায়ুর সংস্পর্শে এই অগ্নি জ্বলিতে থাকে। এই কর্ম রূপ ইন্ধন সদাই জ্বলিতে চায়। যতক্ষণ না উহা ভস্মসাৎ হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তি শাস্তি সম্ভব নহে। প্রবৃত্তি অগ্নি কখন কখন ধূমাবৃত্ত বা ভস্মাচ্ছাদিত হয় এবং সেই সময়ে উহার আভা বাহিবে প্রকাশ পায় না বটে কিন্তু আভা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেই প্রবৃত্তি যে শাস্ত হইয়াছে একপ বিবেচনা করা ভুল। মনে কর তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আহাবে বসিবার উদ্যোগ করিতেছ, এমন সময়ে কোন আত্মাঘেব বিপদ সম্বাদ আসিল। তোমার খাওয়া দাওয়া যবে গেল, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ক্ষুধা যে উপশম হইল ইহা ঠিক কথা নহে। অর্জুনের পক্ষেও সেইরূপ বহুনাশ-জনিত অনিষ্ট চিন্তায় তাঁহার যে মোহ উপস্থিত হই-
যাছিল সেই মোহ ধ্মে তাঁহার ক্রিয় প্রবৃত্তির আভা আচ্ছাদিত হইয়া-
ছিল মাত্র, তাঁহার প্রবৃত্তি উপশম হয় নাই। অর্জুনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার এই মোহ অপমোচন করিয়া তাঁহার মূল প্রবৃত্তির আভা তাঁহার
সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাই ভগবদগীতার আসল কথা। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন
যে কালচক্রের বশে দুর্ব্যোধানাদি নিহত হওবাই নিশ্চয়, জগতের হিত
সাধন জন্য দুর্ব্যোধানাদির নিধন সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন অর্জু-
নের মোহ দূর হইল, তাঁহার ক্রিয়বৃত্তির আভা পুনঃ প্রকাশিত হইল।
তখন তিনি গুরুধর্ম সাধনোদ্দেশে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির
নিবৃত্তি সাধন জন্যই কুরুক্ষেত্রেব মহা সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
গীতার মর্ম যতই বুঝিতে চেষ্টা করিবে ততই নূতন নূতন ভাব সকল

মনোমধ্যে উদয় হইবে । আমার নিকট মাঝে মাঝে গুটিকতক গুটিকতক কথা শুনিয়া কিছুই শিখিতে পারিবে না । নিজে না ভাবিতে শিখিলে কেহ কিছু শিখিতে পারিবে না । “পড়, দেখ, এবং নিজে ভাবিতে আরম্ভ কর” এই উপদেশটি, আমি যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিযাছি সেই সময় আমার একজন শিক্ষকেব নিকট হইতে পড়িযা-ছিলাম, আমি ও তোমাকে এই উপদেশ উপদিষ্ট দেখিতে চাই । দেখ, কৰ্ম সম্বন্ধে বুঝিবার অনেক কথা আছে এবং এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আর একদিন উত্থাপন করা হইবে ।

“এখন এস প্রকুল । একবার লোকালয়ে দাঁড়াও আমরা তোমায় দেখি । একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি ‘আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন । আমি সেই বাক্য মাত্র, কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমার ভুলিযা গিয়াছ তাই আবার আসিলাম ।

পরিজ্ঞাপ্য সাধুণ্যং বিনাশ্য চ হুঙ্কতাম্

ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাধি যুগে যুগে ।”

গ্রন্থকার এই কটি কথা বলিয়া দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন । এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবাব পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে । কথাটি পুরাতন সেই একটি কথার ভিতবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নিহিত রহিয়াছে সেই একটি কথার ভিতরে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, শাস্ত্র সমুদায় লুকারিত রহিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণের মধ্যে যে বিবাদ বিবাদাদ, সমুদায় সেই একটি কথার আশ্রয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়, মৃত সঞ্জীবনী রস যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা সেই কথাটির ভিতর আছে ।

কথাটি—“নিষ্কাম কৰ্ম্ম ।”

এক একটি কথা কে জানে কেমন সময় বুঝিরা, সমাজের সম্মুখে

আসিয়া গীড়াইয়া, কত কি কার্য্য সমাধা করিয়া, আবার চলিয়া যাব। এক Liberty, Fraternity, Equality তিনটি কথা ক্রান্তে কি কাণ্ড না করিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমি ইহা বুঝি যে, এক একটি বাক্যেই এক একটি দেবতা। হিন্দুরা বলেন বেদের বাবশক্তিই দৈব-শক্তি, এবং সেই দৈবশক্তি হইতেই জগৎ চলিতেছে, প্রেটো ও ঐরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রেটো বলেন যে “Ideas rule this world” মনুষ্যসমাজচক্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এক এক সময়ে এক একটি বাক্যই যেন সমাজের রাজা স্বরূপ হইয়া আধিপত্য করিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে এক একটি বাক্যই এক একটি দেবতা। আজ কাল যে বাক্যটি আমাদের সমাজের সমক্ষে আসিয়া গীড়াইয়াছে, তাহা হইতে কালে যে কত অমৃতবর ফল ফলিবে তাহা এখন কে বলিতে পারে? কিম্বা এখনও হইতে পারে যে, কথটি সমাজ আদর না পাইয়া হ্রস্বত অল্পদিন মধ্যেই সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এক একটি কথা এক একটি বীজ স্বরূপ। সমাজ জল সেচন না করিলে বীজ প্রায়ই শুকাইয়া যায়, কিন্তু চিন্তা স্রোতের জলে বাক্য বীজ অক্ষুরিত হয়, তাই বলি যে বধন সুন্দর, শুভফলপ্রদ বাক্য তোমাদের সাঙ্গাতে দেখা দিবে, তখন তাহাকে জুদবে করিয়া, মনের মধ্যে স্থান দিয়া, তাহার সমাজ উপাসনা করিও। সকলে যিনি একটি কথা লইয়া সদাই মনোমধ্যে বিচার করিতে থাক, তবেই দেখিবে যে, অল্পদিন মধ্যেই সেই কথা কতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে। ভয়ানক ঝড়ের পরে আকাশ যে শান্ত ভাব ধারণ করে, পতিব্রতা রমণীর মুখের যে মাধুর্যময় ভাব, মদন ভঞ্জন করিতে উদ্বত মহাদেবের যে রৌদ্র ভাব, যে বিশ্বব্যাপী করুণ ভাবের বশে বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া জগৎ যাতাইয়া গিয়াছেন, সেই সকল ভাব গুলি একত্রিত হইয়া এই “নিষ্কার কণ্ঠ”

কথাটির ভিতর সুস্থিরাছে দেখিতে পাই। এমন সুন্দর কথাটি যখন আমাদের সমক্ষে আসিবাছে, তখন এস আমবা সকলে মিলিয়া এই কথার উপাসনা করি। এই “নিষ্কাম কৰ্ম” কথাটির অর্থতাবনা, এবং সেই ভাবনামুযায়ী কৰ্ম্মস্বাভাৱে নিজের জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, সুতরাং ইহাৱই নাম ঈশ্বৰোপাসনা।

যখন কোন একটি বড় প্রয়োজনীয় কথা মনে আসিবাও আসিতেছে না, তখন মনের ভিতর কি একটা যত্নপূৰ্ণ উপস্থিত হয়। তাহাৱ পর কিছুকণ বাদে হয় ত কথাটির গোড়াব অক্ষৰটি মনে আসিলে আবার সেই অক্ষৰটি অবলম্বন করিবা ভাবিতে ভাবিতে হাবান কথাটি পুনৰায় মনে ফিরিবা আসিতে পাবে। আমাদের হিন্দু সমাজ কি একটি বড় প্রয়োজনীয় সত্য মনে অনিয়াও মনে আনিতে পাৱিতেছে না। কি কতকগুলি পুৱাতন কথাৱ উপর ভিত্তি স্থাপন কবিবা দৃঢ়বদ্ধ সমাজ গঠিত হইয়াছিল সেই গুলি সমাজ ভুলিবা গিবাছে। আজকাল জ্ঞানেৱ চৰ্চ্চা আৱন্ত হওবাৱ সৈত কথাগুলি মনে আনিবাৱ ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু মনে আসিতেছে না—সমাজেৱ বড়ই যত্নপূৰ্ণ উপস্থিত হইয়াছে। সমাজেৱ ভিতর কেবল দলাদলি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময় এই যে “নিষ্কাম কৰ্ম্ম” কথাটি আমাদের সমক্ষে আসিবা উপস্থিত হইয়াছে, এইটি সেই সমস্ত হাৱান বাক্যেৱ আন্ত অক্ষৰ স্বৰূপ। এই গোড়ার কথাটি কেহ মন হইতে ছাড়িয়া দিওনা, এই গোড়ার কথাটি অবলম্বনে পুৱাতন কথাগুলি স্মৰণ কৰিবাৱ চেষ্টা কৰিতে থাক, তাহা হইসেই বাহাদেৱ ভুলিয়াছি তাহাৱা ক্ৰমে ক্ৰমে দেখা দিবে, ভাবতেৱ পূৰ্ণ-পৌৰৱ আবাৱ ফিৱিয়া আসিবে।

আজি “দেবীচৌধুৱাণী” অবলম্বন কৰিবা নিষ্কাম কৰ্ম্ম সম্বন্ধে গুটি-কত বলিতে চাই। নিষ্কাম কৰ্ম্ম কাহাকে বলে তাহাৱই বৰ্ণনা

আভাস দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মের বীজ ফলপ্রসূ হয় তাহাই এই প্রথম পরিচ্ছেদে বৃকান আছে।

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মার কথোপকথন লইয়া গ্রন্থের আরম্ভ। ইহার কাকালিনী। না মেঘকে ঘোবেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে আনিতে বলিল।

প্রফুল্লমুখী বলিল, “আমি পারিব না, আমার চাইতে লজ্জা করে।”
মা। তবে খাবি কি ? আজ যে ঘরে কিছু নাই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা ?

কিন্তু শুধু ভাতও জোটে না—ঘরে চাল নাই। কাজেই মা ধার করিতে চলিল। কন্ডা বলিল “আমরা কত লোকের চাল ধারি, শোধ দিতে পারি না আর ধার কবিও না। আজ যাবে ঝিবে পৈতা ভুলি, কাল বিক্রয় করিয়া চাল কিনিব।” কিন্তু পৈতার পঁজটি পর্য্যন্ত গৃহে নাই—তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা আবার ধুচুনি লইয়া চাল ধাব করিতে যার দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল—“মা আমি কেন ধার করে খাব ? আমার ত সব আছে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে স্বত্তবেব অন্ন খাইতে পাইনা ? শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি যে স্বত্তরের অন্ন কপালে জোটে তবে খাইব, নহিলে আর খাইব না। যাহাদের উপর আমার ভরণ পোষণের ভার তাহাদের কাছে অন্নের তিক্তা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব তাহাতে লজ্জা কি ?”

এই প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে আমরা কি শিখিলাম ?

যদি মরিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি যে ধার শোধ দিতে পারিব না সে ধার করিতে মনে বাঁহার সদাই সজোচ উপস্থিত হয়, তাঁহার চিন্তা নিষ্কাম ধর্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। একদিন দুখুঁটা চাল ধার করিয়া

সেই ধার শোধ দিতে না পারিলে যে কেহ একেবারে ধৰ্মে পতিত হয়, এ কথা যদি ঠিক নহে, কিন্তু যে জনের চিত্তের গঠন এরূপ সুন্দর, যে তিনি কোন সামান্য বিষয়ে ও খণী থাকিতে ইচ্ছা কবেন না, নিষ্কাম কৰ্ম তাঁহাকেই আশ্রয় করিবা থাকে। ঋণ পরিশোধ কবিবার জন্যই এ জীবন ধারণ করিয়াছি, নূতন কোন ঋণে আবদ্ধ হইতে যেন না হয়, এইরূপ মনে কবিবা কার্য করিতে শিখাই নিষ্কাম কৰ্মেব প্রথম আরম্ভ। অপ্রতিগ্রহ নিষ্কাম কৰ্মেব প্রধান অঙ্গ।

২৮। প্রকুল্লব লজ্জা। পাড়া পড়সীব নিকট হইতে একট বেগুন চাইতে প্রকুল্লব লজ্জা কবে। কিন্তু যে খন্তর বাড়ীতে কখনও তাহার নাম করে না সেখানে উপবাচিকা হইবা যাইতে প্রকুল্লব লজ্জা নাই। ইহার কারণ বাহ্যদেব উপব ধৰ্মতঃ তাহাব ভরণ পোষণের ভাব তাহা-দেব কাছে অগ্র তিক্ষা করিতে প্রকুল্লমুখী লজ্জিত নহেন।

লজ্জা দুই প্রকাবের দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার লজ্জা ধৰ্মচৰ্চার অমুকুণ এবং অন্ত প্রকার লজ্জা ধৰ্মচৰ্চার প্রতিকূল। আমি এ কাজটা কেমন করিবা কবিব, পাঁচজনে আমার নিন্দা করিবে এবং সেট ভয়ে কোন কাজ করিতে যে সঙ্কোচ হয় তাহা এক প্রকারেব লজ্জা এবং যে কাজ আমার নিজের মনে অবদ্বন্দ্ব বলিয়া বুঝি তাহা করিতে যে সঙ্কোচ, তাহা অন্ত প্রকারেব লজ্জা। বাহ্যদেব লজ্জা কেবল লোক নিন্দার উপর নির্ভর করে তাহারা গোপনে অধৰ্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, কিম্বা সমাজে যে সকল অধৰ্ম প্রাশর পাইবাছে সেই সমস্ত অধৰ্মাচরণে তাহাদের লজ্জা হয় না। কিন্তু উন্নত চেতাদের লজ্জা অন্তরূপ। বাহ্যতে চিত্তের সঙ্গীর্ণতা জন্মিতে পারে, এরূপ ভাব মনে আসিলেই তাহাদের চিত্ত আপনা আপনি কেমন সম্বুচিত্ত হইবা পড়ে এবং সেই বিষয়ে কেমন লজ্জা উপস্থিত হয়। এরূপ লজ্জাই ধৰ্মের সহায়। প্রকুল্ল

গরিব কান্দাল একটা বেগুন চাইতে গেলে পাঁচজনে তাহাকে লজ্জা দিবে না বটে, কিন্তু ঐ ভিক্ষা করিবার নামেই তাহার প্রশস্ত মনে কেমন লজ্জা উপস্থিত হইল। “দারিদ্রদোষহি গুণরাশিনাশী” এই একটি কথা প্রচলিত আছে, কথাটি অধিকাংশ স্থলেই সত্য, কিন্তু প্রফুল্লের দারিদ্র তাহার মানসিক তেজ নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, প্রফুল্ল পৈতা তুলিয়া খাইবে, তবু ভিক্ষা করিতে রঞ্জি নহে। যিনি নিকাম ধর্ম অত্যাশ করিতে চান, তাহার চিত্তকে প্রথমে এরূপ গভিরা লইতে হইবে যেন গুণ রাশিনাশী দারিদ্রদশা উপস্থিত হইলেও তাহার চিত্তের প্রশস্ততা না কমে।

প্রফুল্লের লজ্জার কথা বলিতেছিলাম। প্রফুল্ল যখন উপবাচিকা হইয়া শগুর বাড়ী যাইবে, তখন তাহার কত কি কথা কহিবে, পাঁচজনে কত কথা নিন্দা করিবে, তাহাকে কত লোকে বেহারা বলিবে, এ সব কথা মনে আসিলে প্রফুল্লের উন্নত চিত্তের কোন সংকোচ জন্মাটতে পারে নাট, কেন না ধর্মতঃ তাহার বাহ্যতে অধিকার আছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করার তাহার চিত্তে কোনরূপ সংকীর্ণতা জন্মিতে পারে না, ইহা তাহার অন্তরের দেবতা তাহার মনকে বুঝাইয়া ছিল।

নিকাম ধর্ম শিথিতে গেলে প্রথমতঃ অন্ত্যার লোক লজ্জা ভ্যাগ করিতে শিথিতে হইবে। সামান্ত লোকলজ্জা ভয়ে ধর্মকর্মের যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়। মান অপমান বোধটি দূরন্ত করিয়া লইতে হইবে। পাঁচজনের কাছে ছোট হইয়া দাঁড়াইতে হইলে আমাদের অপমান বোধ হয়—কিন্তু উন্নতচেতা কেবল নিজের অন্তরের সাক্ষী দেবতার নিকট সংকীর্ণ মন লইয়া দাঁড়াইতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

৩য়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার বলিয়া গিয়াছেন—

“স্বধর্মো নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ।”

এই স্বৰ্গ্য প্রতিপালনই নিষ্কাম ধৰ্ম্মের সার কথা ।

এই ধৰ্ম্মপ্রতিপালন কথাটি চিত্রিত করাষ্ট দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের মূখ্য উদ্দেশ্য এবং এই প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই গ্রন্থের নারিকা অশিক্ষিত অবস্থাতেও স্বতঃই স্বৰ্গ্য প্রতিপালনে তৎপর। বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার স্বামীর উপর । স্বামীর অগ্নে স্ত্রী সেই দেহ পোষণ করিয়া স্বামী সেবায় সেই দেহ পাত করিবে, ইহাই বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ধৰ্ম্ম । আপনা হইতেই প্রকৃষ্ণের মনে এই কথা উদয় হইয়াছে যে, আপনার ধন আপনি চাহিয়া থাইতে লজ্জা করা অকৰ্ত্তব্য ।

ভিক্ষা করিও না, যে গুণ পরিশোধ করিতে পারিবে না সেদুঃখ গুণে বদ্ধ হইও না, এবং আপনার ধন যদি পরের নিকট থাকে তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না নিষ্কাম কৰ্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে এই কয়টি কথাগুলিসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে । এই কয়টি কথার ভিতরেই নিষ্কাম ধৰ্ম্মের সমস্ত রহস্ত লুকাইত রহিয়াছে । নিজের ধন অর্থাৎ নিজের নিজের কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে কখনও সম্মুচিত হইও না, কেন না কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া কৰ্ম্মক্ষয় করাই নিষ্কাম ধৰ্ম্মের উদ্দেশ্য । পরের ধন অর্থাৎ পরের কৰ্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কখনও প্রবৃত্তি না হয়, কেন না তাহা হইলে তেমাকে নূতন গুণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদিন সেই গুণ-যুক্ত না হও ততদিন তোমার মুক্তি হইবে না ।

এই সংসারটা একটা ভাতি বাজার । আমরা সকলেই এক একজন ব্যাপারী । পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেনা পাওনার ব্যাপারে জড়াইয়া রহিয়াছি । এ বাজারে ব্যাবসা করে লাভটা যে কি তাহা কিছুই খুঁজে পেলাম না, তাই এক এক দিন দোকান পাঠ বন্ধ করে পালাবার

মতলব হয়। কিন্তু পালাবার যো নাই। দেনা পাওনা না চুকাইয়া ঘাইবার যো নাই। যিনি এই সংসারের বাজারের দেনা পাওনার খাতা পত্র লইয়া হিসাব রোকশোধ করিবার মতলব করিয়াছেন, তাঁহার ধর্মকেই নিষ্কাম ধর্ম বলা যায়। বাজার দেনার আবার এক এক সময় বড়ই অস্থির হইতে হয়, তোমরা কেউ বাজার দেনা রাখিও না। যেখানে একটু ময়লা একদিন জমে তাহা যদি তখনই পরিষ্কার না কর, তবে পরদিন আর একটু ময়লা জমিবে। বাজার দেনা ও সেই রকম। সেই জন্য আমি এক পরামর্শ বলি তোমরা শুন, যখন কিছু খরিদ করিতে হইবে তখন উহা নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া আনিয়া খরচ করিও। এক একজনের এমনি স্বভাব আছে যে তাঁহারা ধারে হাতী কিনিতে পারেন একপ লোক শেষ মশায় বড়ই কষ্ট পান। যিনি নগদ মূল্যে খরিদ করিয়া খরচ করেন তাঁহাকে দেনা পাওনার হিসাবে গোলমালে পড়িতে হইবে না। কর্মের খাতায় যা লেখা আছে তাহা আবার এমনি মুহুরীর লেখা, যে বোঝে কার সাধ্য। এই লেখা পড়িতে শিখার নাম জ্ঞান-চর্চা। এসব কথা সমায়াত্তরে তুলিব।

এইবারে দেবীচৌধুরাণীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লমুখী কি গুণের পবিচয় আছে তাহা দেখা যাউক। প্রফুল্লমুখী মাকে সঙ্গে লইয়া শস্তর বাড়ীতে পঁহুছিল। প্রফুল্লের মার এক মিথ্যা অপবাদ প্রচাৰ হওয়া অবধি প্রফুল্লব শস্তর তাহাদিগের সহিত অনেক দিন সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রফুল্ল তাঁহার মাকে সঙ্গে লইয়া উপযাচিকা হইয়া শস্তর বাড়ীতে আসিবাছে দেখিয়া গৃহিণী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। গৃহিণীর সহিত দু'চারি কথা হওয়ার পরই মা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। প্রফুল্ল গেল না, যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তডী বলিল “তোমার মা গেল তুমি

ও যাও । নভ না যে ? কি জ্বালা আবার কি তোমার সঙ্গে লোক দিতে হবে না কি ? ”

নিবভিমানিনী প্রফুল্লমুখী এখন মুখের ঘোমটা খুলিল, চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দর দর ধারা বহিতেছে । শাওভী মনে মনে ভাবিলেন, “আহা ! এখন চাঁদপানা বোঁ নিয়ে ঘর করিতে পেলেন না ।” মন একটু নরম হইল ।

প্রফুল্ল অতি অশ্রুট-স্বরে বলিল “আমি যাইব বলিয়া আসি নাই ।”

গিল্লি । তা কি করি মা—আমার কি অসাব যে তোমাদে না নিয়ে ঘর করি ? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমার ত্যাগ করিতে হইবে ।

প্রফুল্ল । মা, একঘরে হবার ভরে কে কোথায় সন্তান ত্যাগ করেছে । আমি কি তোমার সন্তান নই ?

শাওভীর মন আরও নরম হইল । বলিলেন, “কি জান মা, জেতের ভয় ।”

প্রফুল্ল পূর্ববৎ অশ্রুট-স্বরে বলিল “হলেন যেন আমি অজ্ঞাতি কত শূত্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি ?

গিল্লি আর বুঝিতে পারিলেন না । বলিলেন “তা যেখোঁটি লক্ষী, কপেও বটে, কথায়ও বটে । তা যাই দেখি কর্তার কাছে তিনি কি বলেন । তুমি এখানে বসো মা বসো ।” প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল ।

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা ইহা দেখিতে পাই, যে, যে ব্যক্তি দাক্ষ কঠোর ভাব ধারণ করিয়া প্রফুল্লকে বাটী হইতে বহিস্কৃত

করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি প্রফুল্লের ছুটি গুণে একেবারে নতম হইয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গুণ দুটি এই প্রফুল্লের মুখ-শ্রী বড় সুন্দর এবং কথা বড় মিষ্ট। যদি কেহ তোমরা নিষ্কাম ধর্মবতাবলম্বী হইয়া সমাজে আদর্শ স্বরূপ দাঁড়াইতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে প্রফুল্লের জায় মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ এবং মিষ্ট কথায় (তা বলিয়া যেন কথা মিথ্যা না হয়) লোককে তোমার পক্ষাবলম্বী করিতে শিখ। মুখের শ্রীব এবং মুখের কথার সৌন্দর্য্যরজ্জুতে সমাজকে বাঁধিয়া ধর্মের দিকে টানিতে শিখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশু, চৈতন্য সকলেই মুখশ্রী এবং বাক্যের মধুরতার মোহিনী শক্তির সহিত ধর্মের পবিত্রতা মিশাইয়া জগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন।

মুখশ্রী সুন্দর করিতে শিখ—এই কথা বলায় অনেকে হয় ত বলিবেন যে, ওটা কি নিজের হাত, যে নিজের চেষ্ঠার মাসুখ মুখের শ্রী-সুন্দর করিতে পারিবে? যে যেমন মুখ লইয়া জন্মিযাছে সে মুখ কি সে বদল করিতে পারিবে? আমি এইরূপ কথার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে আমাৎ যা কিছু সবই আমার কর্মের ফল, আমাতে যা কিছু কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিবা আনা ও আমার চেষ্ঠার উপর নির্ভর কবে। আমি যদি এ জন্মে কুৎসিৎ মুখ লইয়া জন্মিয়া থাকি তাহা আমার পূর্ব জন্মের কর্মের ফল, এক্ষণে আবার, উপযুক্ত কর্ম ও অত্যাগ দ্বারা পরজন্মে সুন্দর মুখ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। যিনি পরজন্ম পূর্বজন্ম মানিতে চান না তাঁহাকে এই কথা বলিতে পারি যে যাহাকে মুখশ্রী বলা যায় এই জন্মেই তাহার পরিবর্তন করা মজুম্যের নিজের আয়ত্তাধীন। একই মুখের শ্রী তিন্ন তিন্ন সময়ে তিন্ন তিন্ন রূপ দেখিয়াছ কি?

হাসিতরা আশা মাথা যে মুখের শ্রী একদিন বড় সুন্দর দেখিয়াছি, সেই মুখে যখন অসন্তোষ ব্যঞ্জক তার প্রকাশ পায় এবং মুখ হাসি শূন্য হইয়া গোমড়া পানা হইয়া হইয়া থাকে তখন সেই মুখই আবার কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয় । মনের ভাব যে আকারে মুখে প্রকাশ পায় তাহাকে মুখের শ্রী বলিতে পারা যায় । ক্রমাগত সুন্দর ভাব মনোমধ্যে আনিতে অভ্যাস করিতে করিতে মুখের শ্রী ও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইতে থাকে । মনে আনন্দ ভাব উদয় হইলে মুখ যেন হাসি হাসি হয় । কিন্তু অসন্তোষ ভাব মনে আসিলে মুখের ভাব অশ্লীল হইয়া যায় । আনন্দ ভাবের উদয়ের সঙ্গে মুখের পেশী সকলে এক প্রকার টান পড়ে, পেশী গুলি যেন ভ্রূর গোড়ায় কুঁচ-কাষ এবং ঠোঁট দুখানিকে যেন একটু বেশী চাপিয়া দেয় । এখন দেখ যিনি ক্রমাগত চিন্তে আনন্দ, আশা, সন্তোষ এই সকল সুন্দর ভাব আনিতে চেষ্টা করেন তাঁহার মুখের মাংস পেশী সকল ক্রমাগত সুন্দর ভাবে টান পাইতে থাকে, এবং সুন্দর ভাবব্যঞ্জক মুখের শ্রীটুকু মুখ মণ্ডলে স্থায়ী হইয়া পীড়ায় । মনের অসন্তোষে আবার কত সুন্দর মুখ শ্রীদ্রষ্ট হইয়া যাব ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সুন্দর মুখ শ্রীদ্রষ্ট হইতে পারে তখন যাহা সুন্দর নয় ও তাহা চেষ্টা ও অভ্যাসে সুন্দর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

মনে সুন্দর ভাব উদ্ভিত করিয়া সেই ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে এবং এই অভ্যাস দ্বারা মুখশ্রী সুন্দর হইবে । নিষ্কাশ কর্ণ শিখিতে গেলে ভিতর ও বাহির দুই সুন্দর করিতে হইবে । এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি—মুখে পাউডার মাখিলে মুখশ্রী সুন্দর হয় না ।

এইবারে মিষ্টকথা সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব । যথাতি পুরুষে

রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার এই কটি কথা আছে ।

“যে কথায় অস্ত্রে উদ্ভিগ্ন হয় এমন কথা উচ্চারণ করা অনুচিত । যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পুরুষ-ভাবী ও বাক্যরূপ কষ্টক দ্বারা অস্ত্রে হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে । তাহার মুখে অলক্ষ্মীক চিহ্ন সকল সূক্ষ্মষ্ট প্রতীক্ষমান হয় । অসন্তোষ আপন মুখে হইতে নির্গত বাক্যরূপ স্বায়ক দ্বারা অস্ত্রকে আহত করে । আহত ব্যক্তি ঐ সূতীক্ণ শব্দাবাতে জর্জরিত হইয়া অহর্গণ বস্ত্রণা ভোগ করে । অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কখন কালে ও অস্ত্রের উপর নিক্ষেপ করেন না । জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান, ও মধুর বাক্য প্রয়োজন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না । অতএব সর্বদা সান্ত্বন্যবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য । কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ কবিও না ।”—

(মহাভারত কালীসিংহের অনুবাদ) ।

মিষ্ট কথা উন্নত চিন্তের পরিচায়ক । কিন্তু মিষ্ট কথা কহিবার জ্ঞান কেহ যেন মিথ্যাবাদী না হন । মিথ্যার ন্যায অধর্ম্ম আর নাই ।

অন্তরে ভালবাসার ভাব যত বাড়িবে মুখের কথা ও সেই অনুযায়ী সূক্ষ্ম হইতে থাকিবে । অন্তরে প্রেম, দয়া, এবং মৈত্রীভাব বাহিরে মিষ্ট কথায় প্রকাশ পায় । যদি অন্তরে ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাব না থাকে তবে কেবল মিষ্ট কথা কহা কপটাচার । প্রকৃত মুখীর হৃদয় ভালবাসা, দয়া, ও মৈত্রীভাবে পূর্ণ, তাই তিনি মিষ্টভাবী হইয়া মিষ্ট কথায় শান্তির মন নরম করিতে পারিবার্ছিলেন । প্রকৃত মুখীর

প্রকৃত অন্তকরণে, দয়া, মৈত্রীভাব ও ভালবাসা যে কত স্রোতবাহী তাহা পবে প্রকাশ পাইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতাৰ বলিয়াছেন—

“লোকেষ্বিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পূরা প্রোক্তা যযানঘ ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনাং ॥”

এই লোকে ধৰ্মনিষ্ঠা দুই প্রকার, ইহা বেদে আমা বৰ্ত্তক উক্ত হইয়াছে । নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের অধিকারী সাংখ্য যোগীরা জ্ঞান যোগে বৃত্ত হন এবং প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী যোগীরা কৰ্মযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন ।

যাঁহারা আত্মবিষয়ে বিবেকবান্ তাঁহারা সংসার আশ্রমাদি পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থ প্রতীক্ষা অবলম্বন করিয়া জ্ঞান যোগ দ্বারা যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন তাহাই নিবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা, এবং কৰ্ম্মিগণ কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া যে নিষ্ঠা লাভ করেন তাহাই প্রবৃত্তিমার্গ নিষ্ঠা । যিনি যে মার্গ অবলম্বনে অধিকারী তাঁহাব সেই পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য । যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে অধিকারী, সংসারাত্মক ত্যাগরূপ সম্যাস তাঁহাদিগেব ধৰ্ম নহে, এই কথাটি দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থেব মুখ্য উদ্দেশ্য ।

যাহাব চিত্ত, শূন্য লাভেচ্ছায় বাহ্য বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি যদি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল মনে মনে স্ববণ করিতে থাকেন তবে সেই বিমূঢ়াত্মকে মিথ্যাচারী বলা যায় ।

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আন্তে মনসা স্ববন্

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে । গীতা ৩।৮

এরূপ কপটাচার প্রকৃত ধৰ্ম চৰ্চার ব্যাঘাত স্বরূপ । কেন না,

মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর করাই ধর্মচর্চার উদ্দেশ্য, বাহ্য কর্ম সম্যাস্ত্র অবলম্বনে মনে তৃষ্ণা দূর হয় না। প্রবৃত্তি অল্পমাত্রী ধর্মকর্ম আচরণ ব্যতিরেকে মনের তৃষ্ণা দূর করা দুঃসাধ্য। সেই জন্য ধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহাদের পক্ষে বিধি। এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকিবার কৌশলকেই কর্মযোগ বলে। “যোগ কর্মসু কৌশলং।” এইরূপ কর্মযোগ অবলম্বন কবিবা কর্ম করার নামই নিষ্কাম কর্মোচরণ। দেবী চোমুবাণী গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

বাহ্য বিষয়েব সহিত সম্পর্কে আসিয়া পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। এই সুখ দুঃখের স্বতি চিত্তপটে সংস্কাররূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কোন কোন লোকের মনে সুখের স্বতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে সেই সুখের আনুসঙ্গিক দুঃখের স্বতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না, অপব অপর লোকেব মনে দুঃখের স্বতিটি যত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া থাকে, সুখের স্বতি তত দৃঢ়াঙ্কিত হয় না। যেখানে সুখের সংস্কারের প্রাধান্য, মনুষ্য চিত্ত সেইখানে সুখপ্রদ বিষয়ে স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং ইহা হইতেই কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যেখানে দুঃখের সংস্কারের প্রাধান্য, সেইখানে মনুষ্য বিষয়বিষয়েব ইহা ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়। প্রসূতি, প্রসবের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াই প্রসব যন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া যায়। যাহারা এইরূপ সুখপ্রদ বিষয়েব সম্পর্কে আসিয়াই আনুসঙ্গিক দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া যায়, তাহাদের অন্তঃকরণে বিষয়বস্তী প্রবৃত্তির প্রাধান্য অধিক বৃদ্ধিতে হইবে। প্রবৃত্তিমার্গবিহিত স্বর্গ পালনই তাহাদিগেব কর্তব্য কর্ম। এক কথা, চিত্তে বাসনাব বীজ যত দিন থাকিবে, ততদিন মনুষ্য নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনে নৈষ্কর্ম্য লাভ কবিতে সমর্থ হইবে না।

দেবীচৌধুরাণীর ঘট পরিচ্ছেদে প্রকৃষ্ণের প্রথম স্বামীসন্মিলন ঘটিল। একটি অপূর্ণ আনন্দ ভাব প্রকৃষ্ণের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল। পতি ভক্তি রূপ যে চিত্ত বৃত্তি প্রকৃষ্ণের অন্তরে অব্যক্ত ভাবে ছিল, তাহা এই পতিসন্মিলনে ফুটিয়া উঠিল। প্রকৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, প্রকৃষ্ণ কখন ও কাহাবও নিকট আদর পায় নাই সেই প্রকৃষ্ণের স্বামী আজি আদর করিয়া প্রকৃষ্ণের মুখ চুম্বন করিল, প্রকৃষ্ণ তখন মনে মনে ভবিতোছিল যে “বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।” এই দিন প্রকৃষ্ণ যে সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহা সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই দিন প্রকৃষ্ণ পতিভক্তি কি পদার্থ তাহা বুঝিল। এই পতিভক্তি বৃত্তিই প্রকৃষ্ণের চিত্তের মূল প্রবৃত্তি, এই মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করাই অর্থাৎ পতিসেবায় জীবন যাপন করাই প্রকৃষ্ণের ধর্ম, এবং অহংকাব শূন্য হইয়া স্বধর্ম প্রতিপালনেব নামট নিষ্কাশ কর্মানুচরণ।

এই বাবে মূল প্রবৃত্তি ও অহংকাব এই দুইটি কথার অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান প্রয়োজন। সমুদ্রবাব প্রবৃত্তি সুখানুযায়ী ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একই রূপ বিষয়ে, সকলে কিছু সমান সুখ অনুভব করে না, সেই জন্য আমাব যে বিষয় সম্পর্কে সুখ হয়, আর একজন তাহাতে যে কি সুখ আছে তাহা বুঝিতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন লোকেব চিত্তেব বর্তমানবস্থায়, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ইহা বুঝিতে হইবে। তাহার পর, ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আমাব ভিন্ন ভিন্ন সুখের সংস্কার সকলের মধ্যে, বিশেষ কোন একটি সংস্কার সর্বোপেক্ষা দৃঢ়াঙ্কিত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহাকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। যে সুখ ভাবনা উপস্থিত হইলে ইতর সকল সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় সেই সুখের প্রবৃত্তিকেই মূল প্রবৃত্তি বলিতে পারা যায়। শত্রুব সম্পর্কে

আসিয়া শত্রু সহিত যুদ্ধ করিতে অৰ্জুনেব যে তৃপ্তিশাত হইত, সেট মূল সংস্কার অৰ্জুনেব চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত ছিল এবং সেই জন্তই তাঁহার মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ধর্মবিহিত যুদ্ধকার্যই অৰ্জুনেব স্বধর্ম ছিল, ভগবান্ এই জন্তই তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পবামর্শ দেন নাই ।

চিত্ত বড় চঞ্চল পদার্থ, এক ভাবে স্থিতি থাকিতে চায় না চিত্তেব চাঞ্চল্য হেতু যদুয্য তাহার কর্তব্যাকর্তব্য ঠিক বুঝিতে পাবে না এবং সেই জন্ত নানাক্রম কষ্ট ভোগ কবিয়া থাকে । এই জন্ত জ্ঞানীগণ দুঃখ নিবৃত্তিবি জন্ত প্রথমতঃ চিত্তেব চাঞ্চল্য দূর করিতে পবামর্শ দেন । ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,

“তৎ প্রতিশোধার্থম্ একত্বাত্মনাম্” ।

চিত্তচাঞ্চল্য দূর কবিবাব জন্ত কোন এক তত্ত্বে চিত্ত স্থিতি বাঞ্ছিতে সতত অভ্যাস কবিবে ।

মূল প্রবৃত্তিতে চিত্ত স্থিতি রাখিব সেই প্রবৃত্তি যদুয্যকে যেক্রম ধর্ম-কর্মে প্রেরণ কবে তাহাই যদুয্যেব স্বধর্ম । মনে কর, শত্রু সংহারে একজনের লড়াই আনন্দ হয়, শত্রু সংহারবাসনা তাহার মূল প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি তাহাকে শত্রু সংহারে প্রেরণ করে এবং সেই জন্ত শত্রু দেখিলেই সংহার করাট কি তাহার কর্তব্য কর্ম ? শত্রুসংহার বৃত্তি মূল প্রবৃত্তি হইলেই যে শত্রু দেখিলেই সংহার করিতে হইবে এক্রম নহে । যেখানে শত্রু সংহার ধর্ম কর্ম সেইখানেই কেবল তিনি তাঁহার চিত্তেব বৃত্তি ব্যক্তভাবে প্রকাশ করিতে অধিকারী, অন্তত্ব নহে ।

ধর্ম কাহাকে বলে ? আমি একাট চৈতন জীব, বাহ্য চৈতন জীবে আছে কিন্তু জড় পদার্থে নাই তাহাই চৈতন জীবের ধর্ম । জড় পদার্থ সকলের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমার স্বাধীন, ইচ্ছা আছে ; এই

স্বাধীনতাই মনুষ্যের ধর্ম । সাংখ্যাকার কপিলদেব মতে প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি যে চতুর্কিংশান্ত তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের সংযোগ দেখা যায়, এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং কেবল একমাত্র পুরুষই চেতন পদার্থ । এই সমস্ত জড় পদার্থের যে ক্রমপরিণাম দেখা যায় তাহা এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশে হইতেছে । অর্থাৎ জড় পদার্থ আত্মবশে নাই কিন্তু পুরুষের যে সূত্র ছুঃখ ভোগ আছে ইহা তাহার আত্মাধীন পুরুষের সূত্র-ছুঃখ ভোগ তাহার নিজের কর্ণের অধীন এবং ছুঃখ-নিবৃত্তিই সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থ । ছুঃখ নিবৃত্তি কবা এবং না করা চেতন পুরুষের আত্মাধীন এবং এই হেতু পরবশ প্রকৃতিকে জড় এবং পুরুষকে চেতন পদার্থ বলা যায় ।

আমাব যে টুকু আমাব নিজের বশে আছে সেই টুকুই চেতন পদার্থ, সেই টুকুতেই আমাব আমিষ বা পুরুষ আছে । অর্থাৎ স্বাধীনতাই চেতনের ধর্ম ।

সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে পুরুষ সংখ্যাব অনেক আছেন । আমি একজন পুরুষ, তুমি একজন পুরুষ, তিনি একজন পুরুষ ইত্যাদি । স্বাধীনতাই সকল পুরুষের সাধাবণ ধর্ম ।

আমাব সূত্র ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের আয়ত্তাধীন বাধিতে চেষ্টা করাই যেমন আমার পুরুষত্ব, সেইরূপ তোমাব সূত্র ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে তোমাব নিজের আয়ত্তাধীন বাধিতে চেষ্টা কবা তোমাব পুরুষত্ব । আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থাৎ আমাব স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমাব ও সেইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, সকল চেতন জীব মাত্রেবই এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে । মনুষ্য সকল পরম্পর পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বন্ধাব রাখিয়া যে কার্য করে, তাহাই মনুষ্যধর্ম । অর্থাৎ আমার যে ব্যক্তিগত স্বাধী-

নতা আছে, আমার দুঃখ নিরন্তর অল্প যে স্বাধীন চেষ্টা আমার আছে সেই স্বাধীনতার একটি সীমা আছে, আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিতে গেলে যেখানে অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে আমার স্বাধীনতা ব্যক্ত করিবার স্থল নহে। আমার যে কন্মের অন্তের সুখ দুঃখ জন্মে, সেই সুখ-দুঃখ-ভোগ যদি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিবোধী হয়, তবে আমার সেই কন্ম অধম্ম অর্থাৎ চৈতন মনুষ্যোচিত কন্ম নহে।

এইভাবে শত্রু সংগ্রাম কোন স্থলে ধম্ম কন্ম, কোণাথ বা অধম্ম তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। শত্রু যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অধম্ম নহে।

এইভাবে অহংকার কথাটির অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণাণি গুণৈঃ কন্ম্মাণি সৰ্গশঃ।

অহংকার বিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাছমিতি মনুতে ॥

আমার ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে সকল কন্ম সাধিত হয়, তাহা প্রকৃতির গুণ দ্বাবাই সাধিত হয়; কিন্তু আমি যে আমাকে ঐ সকল কন্মের কৰ্ত্তা জ্ঞান করি ইহাই অহংকার। সত্ত্ব-রজঃ ও তম এই তিন পদার্থের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, পুরুষ সম্পর্কে প্রকৃতির গুণ ক্রান্ত হওয়ায় প্রকৃতির যে ভাবান্তর হয়, তাহার নাম মহৎতত্ত্ব অথবা বুদ্ধি।

এই বুদ্ধির বিকারে অহংকার উৎপত্তি, ইহারা সকলেই জড় পদার্থ সাংখ্য শাস্ত্রে এইরূপ কথা আছে।

জড় পদার্থ কাহাকে বলে? যাহা পবনম তাহাই জড়পদার্থ। বায়ু শক্তির বশে বাহা চালিত হয়, তাহাই জড়পদার্থ। যোহিনী-

শক্তিব বশে (mesmeric power) মুক্ত ব্যক্তির কৰ্মে প্রযুক্তি আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যত্নের বৃদ্ধি এবং অহংকার বাহ্য শক্তির বশে চালিত হইয়া থাকে। যাদু-কবের ইচ্ছা শক্তির বশে মুক্ত ব্যক্তির মনের ভাব পরিবর্তন করিতে পাবা যায়; এবং সেই মুক্ত ব্যক্তি এই শক্তিব বশে কৰ্ম করিয়া, কৰ্মে প্রযুক্তির কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকায় আপনাকেই কৰ্মের কৰ্তা জ্ঞান করে। কোন লোককে যাদুবিজ্ঞা দ্বারা মুক্ত কবিয়া যাদুকর যদি মনে মনে তাহাকে এই কথা বলিয়া দেয় যে “তুমি অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তিকে প্রহার করিবে, ইহার যেন অশ্রুধা না হয়,” তবে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি সেই নির্দোষিত সময়ে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে, এবং কৰ্ম সমাধা কবিয়া আপনাকেই কৰ্মের কৰ্তা জ্ঞান কবিয়া থাকে। সে ব্যক্তি বেন ঐরূপ কৰ্ম কবিল তাহা জিজ্ঞাসা কবিলে কাৰণ কিছুই বলিতে পাবে না, কেবল এই মাত্র বলে যে ঐ কৰ্মে তাহার একটা বড় ইচ্ছা হওয়ায় সে ঐরূপ কৰ্ম করিয়াছে। সম্প্রতি ইটালিতে ঐরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে শুনি-যাছি। একটি লোক খুন অপবাধে বিচারালয়ে আনীত হয়, সে ব্যক্তি জানে যে সে খুন করিয়াছে কিন্তু শেবে প্রমাণ হইল যে যাদু বিজ্ঞায় পারদর্শী (mesmerist) কোন লোকের মোহিনীশক্তির বশে তাহার ঐ খুন করিবার বৌক উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সে ব্যক্তি খালাস পাইয়াছে।

আমরা ও মাজুব মাত্রেই যে সকল নানাবিধ কার্যে প্রযুক্ত হই তাহাও একটা একটা মনের খেয়ালের বশে করিয়া থাকি। এক এক সময়ে অন্তরে এক একটা ভাব ঝুটিয়া উঠে এবং তাহারাই

ইঞ্জিয় সকলকে কৰ্মে প্রবৃত্ত করে। ভাবময় জগৎ আলোচনা করিয়া যিনি বুঝিয়াছেন যে প্রাকৃতিক জড়শক্তির নিয়ম শূন্যতা বশেই ঐরূপ ভাব সকল প্রকাশ পায়, তিনি আর আপনাকে কৰ্ত্তা জ্ঞান করেন না। তখন তিনি কৰ্ম্মকৰ্ত্তা অহঙ্কারকে জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখন তাঁহাব অন্তরে কোন কৰ্ম্ম করিবার কোন উপস্থিতি হইলে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে বাহিরের কোন জড় শক্তির বশে তাঁহাব এই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে কৰ্ম্মকৰ্ত্তাকে জড় শক্তি বুঝিয়া, কৰ্ম্মকৰ্ত্তা অহঙ্কার হইতে চেতন পুরুষকে যিনি পৃথক্ ভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন অর্থাৎ কৰ্ম্মকৰ্ত্তা পরবশ কিন্তু চেতন পুরুষ আত্মবশ এই প্রভেদ যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই অহঙ্কার শূন্য। যিনি কৰ্ম্মের হেতু অহঙ্কারকে জড়শক্তি বশতাপন্ন পরবশ জড় পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বাধীন আপনাকে চেতন পুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন অহঙ্কারের কৰ্ম্ম নিবন্ধন তিনি দাবী হন না। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে নীত হইলেও তিনি খালাস পাইয়া থাকেন।

দেবী চৌধুরাণীর ঐহিকার প্রকুরকে এই নিবহঙ্কাবিত্তা শিক্ষা দিবার জন্য পবিত্র যোগ শাস্ত্র ভগবদগীতাগ্রন্থ রহস্তবিৎ পণ্ডিত ভবানী ঠাকুরের কাছে জ্ঞান শিক্ষার্থে পাঠাইয়াছেন। কেন না, এই জ্ঞান না জন্মাইলে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কৰ্ম্ম নিষ্কাম হইতে পারে না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

তত্ত্বমসি ।

“তত্ব-মসি” বেদেব এই মহা বাক্যেব প্রকৃত অর্থটি কি ইহা অদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদীগণের মধ্যে বিবাদ আছে, সে বিবাদ যেমন আছে তেমনি থাক, সে বিবাদ তত্ত্বন কবা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নহে। আমি “তত্ত্বমসি” কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র স্বরূপ বুঝি।

তত্ব-মসি অর্থাৎ তুমিই তাই। আমি যাবে খুঁজি, সে সূন্দর্যেব সৌন্দর্য্যে আমি মিশিতে চাই, তুমিই তাই—এই জ্ঞানটি যিনি পরিঘূট কবিত্তে শিখিযাছেন, তিনি ষপার্থ ভালবাসা শিখিযাছেন, আমি বলি তিনিই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের মর্থ প্রদর্শন কবিত্তে শিখিযাছেন।

“মনেব মানব খুঁজিত্তে এসে

হলেম দিশে হারা

প্রাণে যাবা বাইলো শেষে”

বাউলদেব এই একটি গান আছে। এই গানটির এই কথাগুলিব তিত্তর বড় গভীর তাব আছে এটী জীবনে জানেব সঞ্চার হওয়া অবশি সনাই যেন কাহাকে খুঁজিত্তেছি, কি যেন একটা বড়ই অভাব রহিযা-যাছে, কিন্তু কিসে যে সে অভাব পুরিবে বুঝিত্তে পারিত্তেছি না। মাহেত্তাব বিরহে পুণ্ডরীর আচ্ছাদ সববরের তীরে প্রাণ হারাইযা পর জন্মে বৈশম্পায়ন নাম ধারণ করিয়া যখন ঘটনাক্রমে আবার সেই আচ্ছাদ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনেব যে অবস্থা হইয়াছিল, মাহুদ মাত্তেরই জীবনে সেই রকম একটা

ভাব অজ্ঞাত কাবণ বশে মনেব একটা চাক্ষুশ্য ভাব সদাই বিরাজমান রহিয়াছে দেখিতে পাই। তবে কোন চিন্তে বা সেই ভাব প্রস্ফুটিত কোথাও বা লুপ্তাশিত। মানুষের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ইহাই মনে হয়, যে এই সংসারে আসিবা মনের মানুষ খুঁজিয়া লওবাই মানুষের প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষ খুঁজিতে জানেনা বলিয়া খুঁজিয়া পাব না, শেষে দিশে হারা হইয়া প্রাণে মারা যাব।

আমার মনের মানুষ আমার মনেব ভিতর রহিয়াছে, আমি বাহিরে চাষিনিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু মনেব ভিতর কখনও খুঁজি নাই তাই মনেব মানুষ পাই নাই। তোমবা যদি কেহ মনের মানুষ খুঁজিবাব জন্য অবীর হইয়া থাক, তবে অন্তবেব ভিতবে অন্বেষণ করিতে থাক, ভিতবেব অন্ধকার যতই দূব করিবে, ততই দেখিবে যে তোমার কল্পনাপটে একটি সুন্দর পুরুষের প্রতিবিম্ব ক্রমে ক্রমে পবিস্ফুট হইতেছে। ইহাকে ভাল করিয়া চিনিতে শিখ। এই দেবতাই তোমাব মনেব মানুষ, ইহাকে অন্তরের আড়াল করিও না।

মন্ত্রবলে মনোময় দেবতাকে শবীরী পদার্থে আবির্ভূত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। মনেব মানুষকে যদি বাহিরে আবির্ভূত করিতে চাও তবে “তত্ত্বমসি” এই মন্ত্র সাধনা করিতে শিখ।

কল্পসূত্রে যাহার সহিত বাধা থাকা নিবন্ধন, এজন্মে যাহা সঙ্গী হইয়া চিরজীবন কাটাইবে মনস্থ করিয়াছে, সেই মূর্তি সমক্ষে বাধিয়া, তোমার ইচ্ছাবলে সেই মূর্তিতে তোমার দেবতা আবির্ভূত হইয়াছেন তাবিয়া লইবা ‘তুমিই সেই’ ‘তুমিই সেই’ ‘তুমিই সেই’ এই মন্ত্র জপ করিতে থাকে। এই পূজা পদ্ধতি অমুযায়ী কর্ম করিলে তোমার দেবতা বাহিরে আবির্ভূত হইবেন।

মনের মতন সুন্দর বাহিবে মিলে না। যদি বাহিবের সুন্দরের সহিত কথা কহিতে সাধ থাকে তবে সুন্দর গড়িয়া লইতে হইবে। যাহার সঙ্গে সদাসর্বদা থাকিতে হয় কথোপকথন কহিতে হয় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে মন থাকিলেও ভাল হইয়া পড়াই এবং তাহাকে মন ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইলেও মন হইয়া পড়াই। যদি তাহাকেও তোমার ভালর আদর্শের জায় ভাল কহিতে চাও তবে তাহাকে সেই রকম ভাল বলিয়া ভাবিয়া লইতেও হইবে। যাহাকে ভাল বলিয়া ভাবিলে, তাহার সহিত ব্যবহার, কথাবার্তাও ভাল ভাবেই হইয়া থাকে। আদর্শ সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে তুমি যে রূপ ভালবাসা মাথা কণাও ব্যবহার করিতে ভাল বাস, বাহিবেব সঙ্গী সহিতও যদি সেইরূপ ভালবাসা মাথা ব্যবহার ও কথা কহিতে শিখ, তবে তোমার সেই ভালবাসা, সেই কথা ও সেই ব্যবহারের গুণে তোমার সঙ্গী বদ্ধ হইয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহাকে আন্তে আন্তে তোমার মনের মতন কবিয়া গড়িয়া লইতে সক্ষম হইবে। শেষে দেখিবে যে তোমার মনের মাহুৎ বাহিরে প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে তুমি তাহাকে “তব-মসি” বলিয়া তোমার জীবনের চিবসংগ পুসাইতে সক্ষম হইবে। যিনি এইরূপ ‘তব-মসি’ শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই যথার্থ ভালবাসা শিখিয়াছেন।

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে বলাইয়া বুঝিতেছি, তাহাকে ভাল ভাবিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব এরূপ ব্যবহার কপটাচার কি না? এরূপ ব্যবহারের তির্যক অসত্য আছে কি না? যদি কিছু অসত্য থাকে তবে এরূপ ব্যবহার কখনও মন-সঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে চাই যে

এই জগতে মানুষ কখনও মন্দ হইতে পাবে না আমবা মানুষকে যে মন্দ বলিয়া বুঝি সেইটিই আমাদের ব্রহ্ম, সেইটিই মিথ্যা । মানুষ যাত্রাই সুন্দর তবে নানাবিধ ময়লায় জড়িত থাকায় আদর্শ মানুষকে আমবা চিনিতে পারি না । কাল মাথা কিছুকণ ভিতর মুক্ত আছে, যিনি মুক্তার আদর বুঝেন তিনি এই ময়লা কিছুকণও আদর করেন ।

যে ময়লায় মানুষকে কুৎসিত করে সেট মলাকে ঘৃণা করিও কিছু মানুষকে ঘৃণা করিও না । মানুষকে ভাল বাসিয়া, মানুষকে আদর করিয়া, মানুষকে মনের ময়লা দূর করিতে সতত সচেষ্ট থাক ।

কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় । তুমি যদি এক জনকে উন্নত দশায় তুলিতে সচেষ্ট থাক তবে কর্মের ফলে তোমার আপ-নার উন্নতি ক্রমশই সাবিত হইতে থাকিবে । পরকে আদর্শ পুর-ষের দ্বারা সুন্দর কবিত্তে গিয়া আপনি সেইরূপ সুন্দর হইয়া দাঁড়াইবে । ‘তত্ত্বমসি’ মূলিতে বলিতে “সোহং” বলিতে শিখিবে, অর্থাৎ ‘আমি যারে খুঁজি ‘তুমিই সেই’ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিবে যে আমি যারে খুঁজি আমি নিজেই সেই দেবতা ।

“কর্মলাকান্ত একদিন কোকিলের ডাকে মুক্ত হইয়া বোকিলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন “তবে কুহরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক দেবিরে । কর্ম নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পারিলাম না । যদি তোর ও ভুবনভুলান সুর পাইতাম ত বলিতাম ।” আমি এই কথাগুলির উপর আরো দুটি কথা বেশী বলিতে চাই ।

“শ্রোতা পাইনা বলিধা কর্ণের চর্চা কখনও হইল না, গলা সাধা হইল না বলিয়া আমার শ্রোতা ও জুটিল না, এখন কি করি কোকিল বল দেখিবে। পাখী তোয় ডাকে ভালবাসা মিশান আছে, তাই তোব সুন্দর ডাকে লোকে আকৃষ্ট হয়, আর আমার নিরস কর্কশ কথা কেউ শোনে না, পাখী একটু ভালবাসা দে দেখিবে।”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

একমেবাদ্বিতীয়ং ।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বিবাদ, অনেক কাল হইতে চলিতেছে, এই বিবাদের গোড়াটি কোথায় ইহা একবার অনুসন্ধান করা কর্তব্য। দ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম এই দুই এর মধ্যে আমাদের যে ভেদ জ্ঞান আছে ঐ ভেদ জ্ঞান নিত্য কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা জ্ঞানি মূলক, এই ভ্রম দূর হইলেই জীব আপনাকে ব্রহ্মরূপ বলিয়া বুঝিয়া, যুক্তি লাভ করিতে পারে।

“তৎ সৎ অসি” বৈদের এই মহাবাক্য অদ্বৈতবাদীরা যেমন মান্য করেন, দ্বৈতবাদীরা ও সেটরূপ মান্য কবিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা উহার যে রূপ অর্থ করেন দ্বৈতবাদীরা সে রূপ অর্থ করেন না।

বেদান্ত জ্ঞানান্তিল্যবী শিষ্য গুরুর নিকট যখন দীক্ষা লাভ করেন তখন গুরু তাঁহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম এই কথাটিতে অন্বরে কি অর্থ বোধ হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া শিষ্যকে “তৎ সৎ অসি” এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মন্ত্র জ্ঞালোচনা দ্বারাই শিষ্য পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

অদ্বৈতবাদীদের মতে “তৎ সৎ অসি” এই মন্ত্রের অর্থ এই—
তৎ অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

তৎ তমসি অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিতে থাকিবেন যে আপাততঃ ‘আমি’ বলিলে আমাকে যেসকল উপাধিযুক্ত বলিয়া বুঝি বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে, আপাততঃ আমি ব্রহ্ম কথার যে অর্থ বুঝিতেছি প্রকৃত পক্ষে আমিই তাই, কেবল ভ্রমবশতঃই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধিযুক্ত জ্ঞান করিতেছি। শুকদেবের নিকট হইতে ব্রহ্ম বিবরণক পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও উপাধিশূন্য স্বরূপ বুঝিয়া “ব্রহ্মই আমি” এই ধ্যান করিতে থাকিব তাহা হইলেই ক্রমে ব্রহ্ম বিবরণক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বৈশ্বানরীর মতে “তৎ স্বম্ অসি” এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ তৎ স্বম্ অসি অর্থাৎ তত্ত্ব স্বম্ অসি। হে শিষ্য তুমি তাঁহার। সত্য স্বরূপ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছাও জানিও। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন, যে—সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মের সহিত আমি একটি নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। আমি তাঁহার। শাস্ত্র দাস্ত সখ্য বাৎসল্য মধুর ভাবের কোমল কোমল সম্বন্ধে আমি তাঁহার সহিত গাঁথা। তাঁহার সহিত আমার এই যে সম্বন্ধ এ সম্বন্ধ নিত্য সম্বন্ধ;

* যিনি মধু খাইয়াছেন তিনি যদি আমার বলিয়া দেন যে মধু মিষ্ট তবু তাহা কথার বিশ্বাস করিয়া মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান আছে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু মধু খাইয়া মধুর মিষ্টতা অনুভব করিলে পর, মধুর মিষ্টতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান।

আমি আমার নহি, আমি তাঁহাব । শুধু আমি নহি জীব মাঝে সকলেই সেই আমি পুরুষের । আমি তাঁহাব তুমিও তাঁহার, গুরুদেব যিনি আজ এই উপদেশ দিলেন তিনিও তাঁহাব, ইহা বুঝিয়া আজি গুরুপদে নমস্কার করি ।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মেব যে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে সেই ভেদ যদি নিত্য বল, তবে, জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যেব স্বরূপতঃ একটি ভেদ স্বীকার করিতে হ'ব কিন্তু তাহা হইলে “ও একমেবাদ্বিতীয়ং” এই মহাবাক্যের সঙ্গে বিবোধ ঘটে । “একমেবা দ্বিতীয়ং” কথাব অর্থ এই যে, চৈতন্য পদার্থের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলে ও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই । এই জগতে যাহা এক এবং অদ্বিতীয় তাহাষ্ট ব্রহ্ম । ব্রহ্ম সৰ্ব্বকে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে গেলে, সেই এক এবং অদ্বিতীয় পদার্থ কি তাহাই অনুভব করিতে হইবে । বাহার পরিণাম আছে অর্থাৎ আজ যাহা এক রকম আকার ধারণ কবে, অন্য সময় অন্য রকম আকার ধারণ কবে তাহা এক এবং অদ্বিতীয় নাম পাইতে পারে না । এই জগতে যত জীব আছে এই জীব সমূহের মধ্যে পরস্পরের যে যে বিষয়ে বিভিন্নতা আছে সেট সেই বিষয় চৈতন্য পদার্থ নহে কিন্তু এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে বিষয়ে একতা আছে তাহাই চৈতন্য পদার্থ । এইরূপে, এক এবং অদ্বিতীয় কি তাহাই অন্বেষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় । সূতবাং দ্বৈতবাদী, জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে যদি পৃথক ভাবে ভাবেন তবে তিনি ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে কখনই সমর্থ হইবেন না । নিজের চৈতন্য সৰ্ব্বদেই যাত্নের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব, কেন না পুরুষ নিজের চৈতন্যই নিজে অনুভব করিতে পারেন ; চৈতন্য

উল্লিখ্য গ্রাহ্য পদার্থ নহে স্মৃতরাং পবের চৈতন্য সঙ্ক্ষে তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না, স্মৃতরাং নিজের চৈতন্যকে ব্রহ্ম চৈতন্যকে ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভিন্ন ভাবিলে ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান কখনও সম্ভবে না। স্মৃতরাং নিজের চৈতন্য বিষয়ক যে অপ-
রোক্ষ জ্ঞান আছে অর্থাৎ “আমি” এই জ্ঞানকে, উপাধি শূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া, উপাধি শূন্য চৈতন্যের অপবোক্ষ জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের অল্প উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্ত হয় না স্মৃতরাং বৈতবাদে মুক্তিলাভ হয় না। বৈতবাদীর মতে, জীবের উপাধি নিত্য স্মৃতরাং সেই উপাধি ঘুচাইতে বৈতবাদীর চেষ্টা ও হয় না, অবৈতবাদীর মতে চৈতন্তের জীব—উপাধি অজ্ঞান মূলক, আত্মজ্ঞান জন্মাইলেই সেই উপাধি ঘুচিয়া যায়।

‘উপাধিগত ভেদ’—এই কথাটির অর্থ একটু বুঝান আবশ্যক। মনে কর একটা কাচের পুতুল আছে, কাচ এই কথাটিতে বাহ্য বুঝায়, কাচের পুতুল কথাটিতে তাহাই কিছু বুঝায় না, কিন্তু কাচ ও কাচের পুতুলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, উপাধিগত একটি ভেদ আছে, এখনে কাচ-বস্তু পুতুল উপাধি পাইয়া অল্প অল্প কাচ হইতে একটু ভিন্নতা পাইয়াছে। সেই বাহার কোন বিশেষ নাম নাই তাহা উপাধিশূন্য কিন্তু বাহ্য কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে তাহাট উপাধি মুক্ত। বাহ্য না থাকিলে আমার ‘আমি জ্ঞান’ থাকে না তাহাই আমার চৈতন্য; বাহ্য না থাকিলে অন্যান্য জীবের ‘এই আমি জ্ঞান’—‘অন্ততঃ জ্ঞান’ থাকে না তাহা তাহা-
দিগের চৈতন্য, ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলেন যে সেই আদি পুরুষ চৈতন্য ময় পুরুষ; যেখানেই চৈতন্য দেখিব সেইখানেই যখন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্য পদার্থ সর্বত্রই এক তখন আমার চৈতন্য-

কে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ আমার অহংজ্ঞানের উপাধি আছে। আমি জানি যে আমি মনুষ্য, ইতর জন্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। আমার মনুষ্যের মধ্যে আমি একটা বিশেষ দেহ-ধারী মনুষ্য, অর্থাৎ এই দেহ ছাড়া অন্যান্য মনুষ্য-দেহাধারী মনুষ্য হইতে আমার প্রভেদ জ্ঞান আছে সুতরাং আমার একটি বিশেষ নাম আছে। এট নামটিই আমার উপাধি। আমি এখন, ‘আমি’ কথায় যাহা বুঝি এবং ব্রহ্ম কথায় যাহা বুঝি এই দুইটা জ্ঞানের (Idea) মধ্যে প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ জ্ঞান নিবন্ধন এখন আমি, আমাকে ব্রহ্ম বলিতে পারি না এবং আমি, চেতন পুরুষ হইলেও, আমাকে জীব এবং ব্রহ্মকে ব্রহ্ম নাম দিয়া থাকি। জীব যতদিন আপনাকে উপাধিশূন্য চৈতন্তময় পুরুষ বলিয়া না বুঝিবে ততদিন জীবের জীব উপাধি থাকিবে। ভেদ জ্ঞান হইতেই উপাধির সৃষ্টি। বৈতবাদীর মতে চৈতন্তের সহিত জীব চৈতন্তের কোন ভেদ নাই কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্তের সহিত ভেদ আছে এবং সেই ভেদ নিত্য, সুতরাং জীব তাহার জীব উপাধি ত্যাগ করিয়া কখনও নিরূপাধিক হইতে পারে না। অবৈতবাদী বলেন জীব নিরূপাধিক না হইলে তাহার মুক্তি লাভ হয় না অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যায়ী হইলে ও স্বর্গাদি ভোগের পর তাহার ইহলোকে পুনরাবুত্তি হয়।

অবৈতবাদী ‘একধেবাধিতীয়ং’ কথার বৈরূপ অর্থ করেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের মতে চৈতন্ত পদার্থ সর্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্ত সোপাধিক এবং ব্রহ্ম চৈতন্ত নিরূপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা করা কিম্বা বুচাইয়া দেওয়াই পুরুষার্থ। বৈতবাদী ‘একধেবাধিতীয়ং’ বাক্যটির কিরূপ অর্থ করেন তাহা

দেখা যাক্। বৈতবাদী বলেন যে জীব নিবৃত্ত উপাসক, বেদোক্ত দেবতা সকল উপাস্ত পদার্থ। কিন্তু এই দেবতা সকল বিশেষ বিশেষ কণ্ঠের অধিষ্ঠাতা হওয়ার বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন, দেবতার। নিত্য পদার্থ নহে সুতরাং তাহারা নিত্য সুখ প্রদানে সক্ষম নহে, যে চৈতন্তের স্বরূপ নিবন্ধন দেবতার। কর্মফলাভ্যুদয়ী সুখ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়াছে। দেবতা—উপাধিগত চৈতন্ত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্ত, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে এক অধিতীয় চৈতন্তময় পুরুষই নিত্য পদার্থ, জ্ঞানবার্ণাবলম্বনে তাঁহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্তময় পুরুষ বিহয়ক মানসব্যাপারের নামই তাঁহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্রই সেই পুরুষের বাচক। ইহাই ‘একমেবাধিতীয়ং’ কথার অর্থ।

অবৈতবাদী পুরুষার্ঘসাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন পূর্বক, নিজেই নিগুণ পুরুষের পদ পাইতে অভিলাষ করেন, বৈতবাদী নিত্য নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইবা উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছিলেন “চিনি হতে চাই না মা, চিনি যেতে চাই” ইহাই বৈতবাদীর মনের ভাব।

অবৈতবাদী ও বৈতবাদী উভয়েই বলেন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই অর্থাৎ জন্ম জরা মরণাদি ব্যাপার ভ্রমিত হৃৎযতোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য পথ নাই। এখন একটি কথা তাহাতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে সেইখানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয় ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। বৈতবাদী বলেন যে যখন ব্রহ্ম আবার জ্ঞেয় বিষয় হইলেন

তখন ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানেব জ্ঞাতা হইবে। কে ? অবশ্যই আমিই হইব। তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে পৃথক সন্দ্বন্দ্ব, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক সন্দ্বন্দ্ব রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্ম জ্ঞান থাকিবে স্মৃতবাং ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য জ্ঞেয় হইলেন তাহা হইলেই ব্রহ্মের সচিত আমার একটি নিত্য ভেদ রহিল স্মৃতবাং বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ, তাহার অহংপদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাহার কাছে ‘আমি’ জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সন্দ্বন্দ্ব তাহাই ব্রহ্ম জ্ঞান।

অবৈতবাদী যে পদ্ধতির অবলম্বনে ধ্যান করেন তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং ‘আমিই’ জ্ঞেয় বিষয়, অর্থাৎ জীব যে আমি তাহা কি পদার্থ তাহাই জ্ঞেয় বিষয়, এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অন্তর্য সন্দ্বন্দ্ব তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান।

গত বারের ভারতীতে শ্রীবৃক্ষ বিজ্ঞান নাথ ঠাকুর বলেন যে “এখন জিজ্ঞাস্য এট যে ইন্দ্রিয়ের সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত হইয়া অহংবৃত্তি একাকী থাকিতে পারে কি না ? যদি বল “হাঁ পারে” তবে তুমি অবৈতবাদী ; যদি বল “না—পারে না” তবে তুমি বৈতবাদী। এট একটি হাঁ ও না’য়ের উপর অবৈতবাদ এবং বৈতবাদ অবলম্বিত রহিয়াছে।” এই একটি ‘হাঁ ও না’য়ের উপর ‘অবৈতবাদ ও বৈতবাদ’ কেমনে অবলম্বিত রহিয়াছে তাহা একটু বুঝাবার চেষ্টা করিব। ইন্দ্রিয় বলিতে আমার অহং প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যয়, এই ইন্দ্রিয় ছাড়া যদি অহংবৃত্তি থাকিতে না পারে তবে স্থানের যতই কেন উৎকর্ষতা জন্মাক না, অহংজ্ঞান

ধাকিলেই অহংজ্ঞান ভিন্ন যে ইদং জ্ঞান তাহা থাকিবে স্মৃতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের একটি প্রভেদ নিতাই রহিল, শাস্ত্রে কথিত আছে যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ধ্যানের উপযুক্ত নহে কেন না ব্রহ্ম ভিন্ন আর সব অনিত্য পদার্থ স্মৃতরাং ব্রহ্মই আমাদের নিত্য জ্ঞেয় এবং তাহা হইলেই ‘অহং ও ব্রহ্ম’ এই দুই এর একটি নিত্য প্রভেদ রহিল অর্থাৎ দ্বৈতবাদ সমর্থন হইল। কিন্তু যদি এমন হয় যে ধ্যানের চরম অবস্থায় ‘আমি জ্ঞান’ ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান না থাকিলে ও ‘আমি জ্ঞান’ থাকিতে পারে তবে অহং ও ইদম্ এর সহিত যে ভেদ তাহা অনিত্য হইল স্মৃতরাং অদ্বৈতবাদীর মত সমর্থন হইল।

আমি এতক্ষণ দ্বৈতবাদীর কথা ও অদ্বৈতবাদীর কথা যাহা বলিলাম তাহার কাহার কথা সত্য কাহার কথা অসত্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই, কেন না কেবল তর্ক দ্বারা আমাদের ন্যায় লোক এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারেন না। ‘তৎ স্মৃশি’ ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ’ ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি অর্থাৎ বেদকর্তা ঐ সকল কথার ঠিক কি অর্থ বোঝনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন স্মৃতরাং আমরা কেবল ঐরূপ বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের কথার উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াই ঐ সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তাহাই বলিতে পারি। তাহার পর আবার,—সমাদির চরম অবস্থায় আমাদের অহং জ্ঞান অবলম্বন শূন্য অবস্থায়,—অর্থাৎ অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকিতে পারে কি না, এ কথার উত্তর পরমযোগী ব্যতীত আর কেহই দিতে সমর্থ নহেন স্মৃতরাং এই সকল দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে মহাপুরুষ-

পনের বাক্যকেই প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় হেঁথি না।

পরম যোগী—পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে জ্ঞেয়া তাহার নিজের স্বরূপ বৃত্তিতে পারিলেই কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে জীব চৈতন্য বলা হইয়াছে পাতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রে তাহাকেই জ্ঞেয়া নাম দেওয়া হইয়াছে। পরম যোগ সমাধা হইলেই জ্ঞেয়া কৈবল্য পাইয়া থাকেন, এই যোগ কাহাকে বলে? যোগ-শাস্ত্রের ২য় ও ৩য় ও ধর্ম্ম সূত্র এই—

যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধঃ। ১

চিন্তবৃত্তি সমূহের নাম যোগ।

তদীজ্ঞেয়ঃ স্বরূপেহবস্থানং ॥ ২

সেই সময় অর্থাৎ যোগবস্থার জ্ঞেয়া তাহার স্বরূপে অবস্থান করে।

বৃত্তি সাক্ষপমিতর জ্ঞ ॥ ৩

অন্য সময় বৃত্তি সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়।

অজ্ঞান বা শব্দ প্রমাণ পতঞ্জলি শাস্ত্রের ভিত্তি নহে, যোগমার্গ অবলম্বনে যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অল্পভূতি জন্মে সেই সকল কথাই যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে। পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে যে সকল কথা আছে তাহা হইতে ইহা পাওয়া যায় যে চিন্তের বৃত্তি সমূহ নিবন্ধন জ্ঞেয়া অর্থাৎ জীব, যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা জ্ঞেয়ার স্বরূপ নহে; চিন্তবৃত্তি নিরোধাবস্থা পাইলে, জ্ঞেয়া, উপাধিশূন্য হইয়া 'তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থিতি করে। যোগমার্গ অবলম্বনে মনুষ্য যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন যে চিন্তের বৃত্তি সমূহের লহিত তাহার সম্পর্ক একেবারে খুচিয়া যায় তখনই পুরুষ কৈবল্য পদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে

দেখা যাইতেছে যে পরমযোগী পতঞ্জলির কথার জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য, এই উপাধি ঘটানই মোক্ষ এবং ইহাষ্ট পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য যে যে উপায় অবলম্বন প্রয়োজনীয় তাহাই তাহার যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতবাং পতঞ্জলির কথা খানিতে হইলে বৈদান্তিক বৈতবাদ দ্রম্যাক বলিতে হয়। সাংখ্যকার কপিলদেবের মতে পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মুক্ত, এই পুরুষতত্ত্বই তাহার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পথম তত্ত্ব। দেহী অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও দেহাভিমান নিবন্ধন তাহার দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এ দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় অবিবেক নিবন্ধন, পুরুষ আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান কবে, সেই অবিবেক দূর করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়। স্মৃতবাং সাংখ্যকার মতেও জীবাঙ্কা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, জীব যে আপনাকে সাকার ও সোপাধিক জ্ঞান কবে তাহাই তাহার বন্ধের হেতু সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করেন অথচ তিনি অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন যে পুরুষ অসংখ্য হইলেও, আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ, তিনি পুরুষ ইত্যাদি কাহারও মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই স্মৃতবাং পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য এক এবং অদ্বিতীয়।

মহানির্ঝাণ তন্ত্বেব যে ব্রহ্ম স্বেত্র ইদানী ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করা হয় তাহাতেও ব্রহ্মকে অদ্বৈত তত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করণ আছে।

নমস্তে স্তে তে জগৎকারণায় ।

নমোঃদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার অৰ্জুনকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে জীব যোদ্ধা লাভ করিলে ব্রহ্ম সারূপ্য লাভ করে, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে ভেদ জ্ঞান আছে তাহা নিন্দ্য নহে।

ব্রহ্মভূতং প্রসন্নাত্মা ন শোচন্তি ন কাঙ্ক্ষতি ।

নমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু যদ্বক্তি লভতে পৰাং ॥

ভক্ত্যা যামেতি জানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জাতা বিশন্তে তদনন্তবং ॥

গীতা, ১৮।৫৪-৫৫।

ঈশ্বর ভক্ত শ্রীধর স্বামী ইহাব এইরূপ অর্থ করেন—

ব্রহ্মাংশু ইতি নৈশ্চল্যানাবস্থানস্ত কলমাহ ব্রাহ্মতি ।

ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবাস্তবঃ, প্রসন্নচিত্ত, নষ্ট ন শোচন্তি ন চ অপ্রাপ্ত কাঙ্ক্ষতি দেহাদি আভ্যাস্য ভাবাৎ। অতএব সর্বোৎকৃষ্ট ভূতস্য সমঃ সন্ রাগ ঘেবাদি কৃত বিক্ষেপাভাবাৎ সৰ্বভূতস্য যদ্বাবনা লক্ষণাং পৰাং যদ্বক্তিং লভতে।

ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তথা চ পৰবা ভক্ত্যা তদ্বতো যামতিজান্নাতি কণভূতং যাবান্ সৰ্বব্যাপী যশ্চান্মি সচ্চিদানন্দনন্ততাত্বতঃ, ততশ্চ যামেবং তদ্বতো জাতা তদনন্তবং তস্য জ্ঞানসোপপত্তে সতি মাং বিশন্ত, পৰমানন্দরূপো ভবতি।

‘আমি ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানে, নিশ্চল ভাবে অবস্থানের ফল বলিতে-ছেন। যদ্ব্যুত ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলে কোন কারণে শোক করেন না এবং কিছুই চাহিয়া কবেন না। অতএব সৰ্বভূতে সমজ্ঞানী হইয়া, সৰ্বভূতে ঈশ্বর ভাবনা রূপ যে ঈশ্বর ভক্তি, সেই পৰা ঈশ্বর ভক্তি লাভ করেন।

আমি (ঈশ্বর) যেভাবে সর্বব্যাপী এবং আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহা এই পরাভক্তি দ্বারা তবৃতঃ বৃদ্ধিতে পারা যায়। তজ্ঞ এই-রূপে আমাকে তবৃতঃ জানিয়া পবে সেই জ্ঞানের চরম অবস্থায় আমাতেই প্রবেশ কবে অর্থাৎ পবমানন্দরূপ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তি প্রধান শাস্ত্র ভগবদগীতা অনুসারে ও দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। গীতার কথাানুসারে ভক্তের পরা-ভক্তির চরম ফল ব্রহ্মসাক্ষ্য লাভ এবং ইহাই মুক্তি। সুতরাং দ্বৈতবাদী যে বলেন যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য, সে কথা ঠিক হইতেছে না।

অদ্বৈতবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ঔটুকত কথা বলা হইল কিন্তু বিবাদেব মূলটি কোথায় সেটি এখনও বলা হয় নাট।

দ্বিতীয়-প্রসঙ্গ ।

মহ্মদ্য চিন্তের প্রীতিভাব প্রধানতঃ দুই প্রকারেব দেখা যায়, চিন্তের প্রীতিভাব দুই প্রকারেব হওয়াব সমাজে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বৈত-বাদ ও অবৈতবাদ প্রচলিত হইয়াছে ।

আমি তাঁহাকে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিবা বুঝি, তাঁহাব আদর্শ-জুয়ায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভক্তি করি, সেই ভক্তি অবৈতভাবেব ভক্তি । দয়্যাবান্কে ভক্তি কবি বলিবা যখন নিজে দয়্যাবান্ হইতে ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন সেই ভক্তিকে অবৈত ভাবেব ভক্তি বলা যায় । এইরূপ স্থলে “দয়্যাবান্” হইতে চাই—এই সংবেগ অন্তরে উপস্থিত হয় ।

কিন্তু দয়্যাবান্কে দয়্যাবান জানিবা তাঁহাব নিকট হইতে দয়্যাইবার অভিলাষে তাঁহাকে যে ভাল বাসি, তাহা বৈত-ভাবেব ভক্তি । এই স্থলে ভক্তিব আধাবেব যে নাম, তক্ত সেই নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছুক নহেন, ভক্তিব আধাবেব নাম “দয়্যাবান্” তক্তেব নাম “দয়্যাপ্রার্থী” । অবৈতভাবেব ভক্তিতে তক্ত ভক্তিব আধাবেব উপাধি এবং নিজের উপাধি এক করিতে চাহেন, কিন্তু বৈতভাবেব ভক্তিতে তক্ত ভক্তিব পাত্রেব নামে নিজে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন না ।

তুমি একজন মহৎ লোক, যে যে গুণ আছে বলিবা তুমি মাহাত্ম্য লাভ করিবাছ, আমাকে সেই সেই গুণে ভূষিত কবিবাব জন্য তুমি আমাকে যে স্নেহ কবিবে, তাহা অবৈত ভাবেব স্নেহ । মনে কব তুমি স্বাধীন পুরুষ, তোমাব মনের স্বাধীনতা আছে বলিবা

তোমার স্বাভাবিকতা। তুমি যদি আমাকে স্বাধীন কবিবার অভিলানে আমাকে স্নেহ কর, তবেই তাহা অদ্বৈতভাবে স্নেহ। কিন্তু তুমি স্বাধীন অথচ আমাকে স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা তোমার নাট, আমি তোমার অল্পগত বলিয়া তুমি আমাকে স্নেহ কর, তোমার স্বাধীন হইয়া থাকি, এই ক্ষণেই তুমি আমাকে স্নেহ কর, এইরূপ স্নেহ দ্বৈত-ভাবে স্নেহ। তোমার “স্বাধীন” নাম এবং আমার “পরাধীন” নাম, এই দুইএব প্রভেদ দ্বারা কবিবার জন্য যে ভালবাসা তাহাট অদ্বৈতভাবে স্নেহ, কিন্তু যেখানে এটি প্রভেদ দ্বারা কবিবার অভিলান নাট অথচ ভালবাসা আছে, তাহা দ্বৈতভাবে ভালবাসা।

আমি বাঙ্গালী, তুমি ও বাঙ্গালী, তোমার উপাধি এবং আমার উপাধি সমান হওয়ায় আমি তোমাকে ভালবাসি, তাহা দ্বৈত-ভাবে প্রণয়। আমি বাঙ্গালী—হীনবল প্রজা, আর তুমি ইংবেজ প্রতাপশালী বাজা, অথচ তোমার আমার ভালবাসা আছে, আমি প্রতাপশালী বাজা হই—এ ইচ্ছা আমার ও নাই, তোমার ও নাই, কিন্তু তর্পাণ আমি তোমার প্রতাপে মুগ্ধ, সেই জন্য তুমি আমার ভালবাস, একপ ভালবাসা দ্বৈতভাবে ভালবাসা।

আমি ও হাঁহাব পুত্র, তুমি তাহাব পুত্র, এইজন্য তোমার আমার যে ভালবাসা—তাহা অদ্বৈতভাবে ভালবাসা। ভ্রাতৃত্বের অদ্বৈত-ভাবে প্রীতি।

আমি পুরুষ এবং তুমি স্ত্রী, এজন্য তোমার আমার যে ভালবাসা—তাহা দ্বৈতভাবে ভালবাসা। দাম্পত্য প্রণয়ের দ্বৈত-বাদ। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান দ্বারা হইলেই দাম্পত্য প্রণয়ের দ্বৈতবাদ। স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ জ্ঞান দ্বারা হইলেই দাম্পত্য প্রণয়ের দ্বৈত-বাদ হইতে দ্বৈত হইয়া যায়।

পিণ্ডাগোরগের দর্শন মতে “এক” এই কথাটিতে চিন্তের যে ভাব বুঝায়, তাহাই “ঐক্যভাব” এবং “দুই” এই কথাটিতে চিন্তের যে ভাব বুঝায় তাহাই “দ্বৈতভাব।”

চিন্তে যখন দ্বৈতভাব প্রবল থাকে তখন মনুষ্য “আমি” ছাড়া আর একজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন চিন্তে মিথুন ভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায়—অর্থাৎ বৃত্তি দুগুণে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী হইয়া চিন্তে উদয় হয়। যেমন এক ষষ্ঠ, লৌহ চূড়ক প্রস্তরের নিকটেবাধিলে সেই লৌহটিতে মিথুন-ভাবাত্মক ম্যাগনেটিজম্ শক্তির প্রকাশ পায়, সেইরূপ স্মৃতিভোগ কামনা থাকায়, মনুষ্য চিন্তে মিথুনভাবাত্মক, দ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিন্তের এক প্রান্ত আত্ম-ভিমুখী ও অপটু প্রান্ত বিষয়ভিমুখী হইয়া পড়ে। যাহুব তখন নিজেকে ও ভালবাসে এবং স্মৃতিপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাসে।

ভোক্তা ও উপভোগ্য এই দুইটি জ্ঞানের একটি জ্ঞান আর একটি ছাড়া থাকিতে পারে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথার অর্থ নাই, এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে, ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটি এবং উপভোগ্য কথাটি একটি জ্ঞানের দুটি প্রান্ত স্বরূপ। চিন্তে দ্বৈতভাবের প্রীতি যখন দেখা যায়, তখন মানুষ নিজেকে প্রীতি স্মৃতির ভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং সেই জন্যই “আমি” ছাড়া আর একজনকে উপভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পূর্বে বলিয়াছি যে কবি বামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন যে “চিনি হইতে চাই না যা চিনি খেতে চাই” এবং ইহাতেই দ্বৈতবাদীদের মনেব ভাব বৃদ্ধিতে পাবা যায়। দ্বৈতভাবে ভক্ত হইয়া আপনাকে প্রীতিস্মৃতির ভোক্তা জ্ঞান করেন, স্মৃতিবাং তাঁহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থ স্বরূপ দেখিতেই ভালবাসেন।

আরাধ্য পদার্থকে ভাবনা করিয়া যে প্রীতিসুখ পাওয়া যায়, সেই সুখ-
ভোগের জন্যই দ্বৈতবাদী আরাধ্য পদার্থকে দ্বৈতভাবে ভক্তি করেন ।
দ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম-প্রীতি সকাম কেন না দ্বৈতবাদী যদি নিজের মনোব-
ভিত্তির ভাল করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন
যে তিনি নিজেকে সুখভোক্তা জ্ঞান করেন, এবং সেই সুখভোগেচ্ছা
ঠাগ করিতে তাঁহার অভিলাষ না থাকতেই তিনি জীবন জীব
নাম ঘূচাইতে কখন ইচ্ছা করেন না । বর্তমান আমি সুখ চুখ
দোক্তা, ততদিনই আমার জীব উপাধি থাকিবে, কেন না যিনি
সুখ চুখ ভোগ করেন তাঁহারই নাম জীব । বাঁহান ব্রহ্ম-প্রীতি নিকাম,
‘তিনিই অদ্বৈতবাদী ।

দ্বৈতভাবের ভালবাসা এবং অদ্বৈতভাবের ভালবাসার মধ্যে
যেদূর প্রভেদ আছে তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইব । মনে
কর দুইজন লোক বেড়াইতে বেড়াইতে, একটি প্রশস্তিত পদ্মফুল
দেখিতে পাইল, সেই পদ্মটির শোভা ও সংগন্ধে উভয়েরই মনে
বড়ই তৃপ্তি উপস্থিত হইল, উভয়েরই সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট হইয়া পদ্মটিকে
দেখিতে লাগিল, সেই পদ্মটিকে দেখিতে দেখিতে একজন বলিল
“দেখ ভাই এই পদ্মের সংগন্ধে একপ মনোবশ যে, দিব্যরাজি এই
পদ্মের গন্ধ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয় ।” অপর জন বলিল যে “এই
পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ পদ্মের সঙ্গে
মিশাইয়া যাই, ঐ পদ্মটি যেমন সর্বোপরে ফুটিয়া যেমন হালিতেছে,
ঐ বকম ফুটিয়া পদ্মফুল হইয়া থাকিতেই আমার ইচ্ছা হয় ।” এই
দুই জনের মধ্যে প্রথম জন পদ্মটিকে দ্বৈতভাবে ভাল বাসিয়াছেন,
অপর জনের ভালবাসা ভাবকে অদ্বৈতভাবের ভালবাসা বলা যায় ।
একজন পদ্মের সৌন্দর্য্যে তাঁহার অহংজ্ঞানটি মিশাইয়া দিতে ইচ্ছুক,

কিন্তু অন্তর্জন নিজের অহংজ্ঞান বজাঘ রাধিবা পণ্ডের সৌন্দর্য্য উপ-
ভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিসর্জন
দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই অদ্বৈততাবের প্রীতি, যেখানে নিজের
পৃথক নাম বজায় রাধিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই দ্বৈততাবের
প্রীতিতে যত্নবোধের মনে সুখভোগ বাসনা প্রচ্ছন্ন লুকায়িত থাকে, সেই
জন্যই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীগণ দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এত তর্ক-বিতণ্ডা
কবিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বলেন যে “ব্রহ্মনাম” রূপ অগ্নিতে
নিজের ধর্ম্ম কন্ম নাম সমস্তই আহুতি প্রদান করাষ্ট ব্রহ্মোপাসনাব
পূর্ণাহুতি। বৈত্যবাদী ও ব্রহ্মাগ্নিতে সকল ধর্ম্ম কন্ম আহুতি দিয়া
উপাসনা করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটি দিতে চান না বাঁহারা দ্বৈততাবের
ভক্তি রসে সিক্ত হটরা আনন্দ উপভোগ কবিতে ভালবাসেন,
তাঁহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া, ব্রহ্মরূপা প্রার্থনা করিয়া
উপাসনা করিতেই ভালবাসেন কিন্তু অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাগ্নিতে আত্ম-
বিসর্জন করিবার জন্যই ব্রহ্ম নাম ভালবাসেন।

ତତ୍ତ୍ୱ-ଜିଜ୍ଞାସା ।



ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ।



তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ।

দ্বিতীয় ভাগ ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বেদ সম্বন্ধে গুটিকত কথা ।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেব কাছে বেদ আজকাল আদর্শীয় জীব্যাকে কিছু সে আদবে আসরা সন্তুষ্ট নহি। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদকে যে ভাবে দেখেন হিন্দু পণ্ডিতগণ বেদকে সে ভাবে দেখেন না। প্রাচীন আর্গাজ্যতি যখন সভ্যতাব সোপানে প্রথম উঠিতে আবস্ত কবিযাছে সেই সময়কার কবির কাব্য বলিযা ইয়ুরোপে বেদেন আদর, কিছু হিন্দুবা ভাবেন যে বেদ আধ্যাত্মিক তত্ত্বদর্শী ঋষিগণেব নিকট প্রকাশিত ব্রহ্মার বাক্য। হিন্দুবা ভাবেন যে বেদ জগতেব সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্র। বাস্তবিক বেদ ঋষিগণেব কপোল কল্পিত কাব্য না প্রকৃত সত্যমূলক বিজ্ঞান, এ বিষয়ে সকল হিন্দুবই একবার ভাবিযা দেখা কর্তব্য।

বেদ হিন্দুর কাছে মহাযাজ্ঞ। বেদের এই যাজ্ঞ আজ কতকাল ধরিয়া রহিযাছে তাহা কেহই জানে না। বেদকে হিন্দুবা এত যে

মান্ত করে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। কারণটা কি একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। সাধারণ হিন্দুজন সকলেই বলিবেন যে বেদ কি জিনিস তাহা আমরা কিছুই জানি না কিন্তু তথাপি বেদকে মান্ত করিয়া থাকি। বাহাকে চিনি না তাহার কি গুণ দেখিয়া তাহাকে মান্ত কর ? এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু এই কথা বলিবেন যে, হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা সকলেই বেদকে সত্যমূলক বলিয়া মান্ত করিয়া আসিয়াছেন তাই আমরাও জানি যে ইহা সত্যমূলক। আমাদের দর্শন শাস্ত্র ত কবির কল্পনা নব ইহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা বেদ বুঝি না বটে কিন্তু সত্যানুসন্ধাবী মহাত্মা কপিল যখন বেদ ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তখন তিনি যে বেদকে কবির কল্পনা বলিয়া বুঝেন নাট ইহা নিশ্চয়। সমাজ বাহাদিগকে সত্যানুসন্ধাবী মহাত্মা বলিয়া বঝিযাছিল তাঁহার সকলেই বেদকে সত্যমূলক বুঝিতেন তাই হিন্দু সমাজে বেদেব এত মান্ত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। সকলেই কি নিউটন বুঝিতে পারে কিন্তু নিউটনেব আদব এখন চারিদিকে যেকপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেইরূপেই বেদেব আদব হিন্দু-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দু দর্শনকারগণ বিশেষতঃ মহাত্মা কপিল যে অসাধারণ বীৰজ্ঞি সম্পন্ন লোক ছিলেন ইহা আত্মকাল অনেকেই স্বীকার করেন। এখন ভাবিতে হইবে কপিলদেব বেদকে সত্যমূলক সেই বুঝিয়া সেই বেদ ভিত্তি অবলম্বনে তাঁহার চিন্তা স্রোত চালাইয়াছিলেন, আর আত্মকালকার পণ্ডিতগণ সেই বহুস্ত বুঝিতে পাবেন না বলিয়া বেদকে সে ভাবে দেখিতে পান না। হিন্দুদেব কাছে

এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, গুরুদীক্ষা ব্যতীত লোকে বেদ রহস্য বুঝিতে পারে না, একথাটি যদি সত্য হয় তবে পাশ্চাত্যগণ যে প্রকৃত রহস্য বুঝেন নাই ইহা নিশ্চয় ।

যাই হউক পাশ্চাত্যগণ বেদকে কাব্যস্বরূপ দেখিতেছেন বলিয়াই আমরা ও যে সেট ভাবে দেখিতে আবদ্ধ করিব ইহা আমাদের উচিত নহে । যখন আমাদের মধ্যে এই কথা প্রচলিত যে গুরুদীক্ষা ব্যতীত প্রকৃত বেদ রচনা বুঝিতে পারা যায় না,—তখন সেই পথ অবলম্বন করিয়া বেদের কিছু রহস্য থাকে তাহা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া পবে বেদ সম্বন্ধে কোনরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য ।

যখন কব একটি গোলকধাঁধা আছে সেত সম্বন্ধে এই জনশ্রুতি চারিদিকে ব্যাপ্ত আছে যে তাহার মধ্যস্থলে এমন এক অপূৰ্ণ বাসস্থান আছে যে সেখানে যাইলে মানুষ দেবত প্রাপ্ত হয় । কিন্তু সেত স্থলে যে একবার গিবাছে তাহাব সাহায্য ব্যতীত অন্য কেহ পথ খুঁজিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত সক্ষম হন না । ঐ গোলক-ধাঁধাটি সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়া একদিন কোতুললাক্রান্ত হইয়া তুম তাহার নিকট যাইয়া দোধলে সপ্তখেই ভিতরে ঢুকবার একটি দ্বার বাতবাছে । এখন বল তুম কোন পথ পরিদর্শকের সাহায্য বিনা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে, এবং বানিক পথ যাইয়াই দেখিলে যে সম্মুখে পথ বন্ধ এবং সেই স্থানে কোন একটি ভাল রকম বাসবার স্থান আছে । এখন বল দেখ তুম যদি বাহিরে আসিয়া বল যে গোলকধাঁধাটি সম্বন্ধে যা কিছু জনশ্রুতি আছে সে সমস্তই মিথ্যা, ভিতরে একটি বেশ বসিবার স্থান আছে এই পর্যন্ত, তাহা হইলে উহা তোমার পক্ষে সুবিবেচকের কথা হয়

না। যখন সকলেই বলে যে উহার ভিতরে যাইবার পথ যে জানে তাহার সাহায্য ব্যতীত ভিতরে যাওয়া যায় না তখন প্রথমে সেইরূপ কোন লোকের সাহায্য লইয়া তবে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে যাওয়া উচিত ছিল তাহাব পব তুমি যেকপ প্রত্যক্ষ দেখিতে বাহিরে সেইরূপ বলিলেই ভাল ছিল। বেদ সম্বন্ধে আমি ও ঠিক ঐ কথা বলিতে চাই। তুমি আমি একটু সংকৃত শিখিয়া বেদ সম্বন্ধে যাহা বলিতে যাই সে কথার যে বর্ণা মূল্য আছে ইহা আমি মানিতে চাহি না। যিনি ঠিক পদ অবলম্বন কবিয়া অর্থাৎ গুরু-দীক্ষা লাভ করিয়া বেদ সম্বন্ধে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন তাঁহাব কথাই সর্বশেষ মান্ত।

বেদ সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে ঋষিগণ যে অবস্থায় যোগাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন বেদমন্ত্র সকল সেট সময় তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এবং যিনি সেই যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইতে শিখিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহই বেদ মন্ত্রেব প্রকৃত বহুস্ত বুঝিতে সক্ষম নহেন। এই সকল কথা গুলির বিষয় মনোমধ্যে একটু ভাবিয়া তবে বেদ সম্বন্ধে কথা কহা সকলেবটে উচিত।

ম্যাক্সমুলার বেদের যে সকল অংশ বুঝিতে পারেন নাই সেই সকল ভাগকে Theological twaddle অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধস্বকীর বাজে কচকাচ বলিয়া বুঝিয়াছেন। আমাদের কাব ভাবত চন্দ্র যদি ঠংরাজী শিখিয়া নিউটনের principle পড়িতেন তবে তিনি ও হয়ত বলিতেন যে উহার ভিতর কিছুই নাই বৈবল বাজে কথা আছে। কবি না হইলে কবির কথা বুঝা যায় না, বিজ্ঞান না শিখিলে নৈজ্ঞানিকের কথা বুঝিতে পাবা যায় না, সেইরূপ ঋষি

হইতে না শিখিয়া যিনি ঋষিদের ভাব জন্মদান করিতে চান তিনি মূর্খ ।

মনে কর তুমি এই ১৮৮৫ সালের এক দিনকার খবরের কাগজে দেখিলে যে *War between the Lion and the Bear is expected in winter*, তুমি যদি ইহা হইতে বুঝ যে কলিকাতায় জিওলজিক্যাল বাগানে শীতকালে সিংহের সাহিত ভল্লকের যুদ্ধ প্রদর্শনী হইবে তবে তুমি লেখকের ভাব কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলে না । পলিটিকসের ভাষায় এখানে সিংহ অর্থে ইংলণ্ড এবং ভল্লক অর্থে রুশিয়া বুঝিতে হইবে । সেইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ ঋষিদের ভাষায় কি কথায় কি ভাব বুঝায় তাহা না শিখিয়া বেদ বুঝিতে চেষ্টা করিলে তুমি যে বেদের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয় ।

ঋষি দীক্ষিত কোন লোকের সাহায্যে বেদ সম্বন্ধে আমার যেরূপ মনেব ভাব জন্মিয়াছে, সেট ভাব অবলম্বন করিয়া আমি বেদ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কথা বলিতে চাই ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেমন জড় জাতীয় শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে সেইরূপ বেদ মনোময় জগতের-শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত সৃষ্টি হইয়াছে । বেদের দেবতা সকল মনোময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি । জড় বিজ্ঞানে যেমন শিক্ষা দেয় যে ইলেক্ট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম্, ভেজ প্রভৃতি ভিন্ন একারের শক্তি সকল কোন একটি শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র, সেইরূপ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে মনোময় জগতের যে সকল শক্তি কৰ্ম্ম-কাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যক্ত হইয়া থাকে সকলই সেই এক ব্রহ্ম-শক্তির রূপান্তরিত অবস্থামাত্র ।

হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা দেয় যে, যে সকল জড়শক্তির ক্রিয়া জড়-জগতে দেখিতে পাই তাহারা আবার মনোময় জাতীয় শক্তিরই প্রতিনিধি মাত্র, সেই জড় আর্ধ্য ঋষিগণ জগৎ-তত্ত্ব অতুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমে মনোময় জগতে প্রবেশ করিয়া সেটখানকার শক্তি-তত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন । বেদ এই আলোচনার ফল ।

বেদের এক একটি মন্ত্র কোন না কোন মনোময় শক্তি বিষয়ক সত্যমূলক কথা, যেমন কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য ঠিক করিয়া বুঝিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয় এবং কিরূপে সেই পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা বিজ্ঞান শাস্ত্রে লিখিত থাকে সেইরূপ বেদের মন্ত্রমূলক সত্য সকল পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিবার জন্ত বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে সেই সকল পরীক্ষা পদ্ধতি বর্ণিত আছে । পাশ্চাত্যগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ সম্যক্ আলোচনা না করিয়া বেদের মন্ত্রভাগ বুঝিতে গিয়াছেন তাই বেদের প্রকৃত অর্থ কিকণ তাহার আভাস পর্য্যন্ত পান নাই ।

বেদ মনোময় জগৎ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, এক্ষণে মনোময় জগৎ কথাটির অর্থ একটু বুঝান চাই । যাহা চক্ষু আদি বাহ্য টাঙ্গিযেব গোচর তাহাট নুল জড় জগৎ, কিন্তু যাহা বাহ্য ইঞ্জিযের গোচর নহে অথচ অন্তরেঞ্জিযেব সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞান জগ্রে তাহাট সূক্ষ্ম জাতীয় বিষয় । এই সূক্ষ্ম জগৎকই মনোময় জগৎ বলিয়া আসিবাছি । ভাবতীতে ‘মনের কথা জানা, নামক প্রবন্ধ ধিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি মনোময় জগৎ কিরূপ তাহার কপঞ্জ আভাস পাইয়াছেন । একজনের মনেব ভাব আর একজনের বাহ্যেঞ্জিযের গোচর নহে কিন্তু আমাদের অন্তরেঞ্জিয় দ্বারা হইলে উহা যে সেই অন্তরেঞ্জিযেব বিষয় তইতে পাবে ইহা আদ-

কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পশ্চিমাংশ কেহ কেহ বুঝিতে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা স্থূল ইঞ্জির সকল যখন চালনা করি তখন যে শক্তি ব্যয় করি বাহ্য জগতে সেই শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি, সেই জগতই বাহ্য জগতে স্থূল শক্তির আধার আছে ইহা বুঝিতে পারি। আমরাদিগের কর্তৃক প্রযুক্ত শক্তির ক্রিয়া যাহাতে লক্ষিত হয় তাহাকেই আমরা পদার্থ (matter) বলি। গ্রহ। হাত নাড়িলাম, একটি স্থূল শক্তি বায় করিলাম, দেখিলাম সেই শক্তির বলে একটি ভাঁটা গড়াইয়া গেল, তখন বুঝি যে ভাঁটা একটি পদার্থ। কিন্তু আমরা ইচ্ছা প্রকাশ, মনে মনে বিচার কার্য ইত্যাদি কর্ত্ত্ব করিবার সময় যে শক্তি ব্যয় করিবার থাকি বাহ্য জগতে তাহার কোন ক্রিয়া দেখিতে পাট না, সেই জগতই বাহ্যজগতে যে আবার মানসিক শক্তির আধার ক্ষেত্র আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব কথিত ‘মনের কথা জানা’ নামক প্রস্তাব মীমাংসা একটু যত্নের সহিত পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত পক্ষে আমরা মানসিক কার্য করিবার সময় ব্যয় করিবার থাকি তাহা যে অমনি আমার মনেই লব পাষ তাহা নহে। বাহ্য জগতে মনোময় শক্তির আধার আছে এবং আছে বলিয়াই অন্তঃপ্রেরিত বাক্য হইলে একজন আর একজনের মনের ভাব মনের সাহায্যে বুঝিতে পারে। এই মনোময় শক্তির আধার ক্ষেত্রেই মনোময়জগৎ কহে (‘The substratum of thought energy’)। স্থূলোক্তির গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ ও সেইরূপ সত্য। পশ্চিমাংশ আপন আপন স্কলারের সকলের বিকাশ সাধন করিবার সেই সেই ইঞ্জিরের সাহায্যে স্বেচ্ছাজগতের তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বেদ সেই আলো

মনোর ফল । আমাদের এই ইচ্ছা লইয়া বেদের প্রকৃত অর্থ কেমন করিয়া বুঝিব ।

যে জন অল্প তাহাব অভ্যাস ইন্দ্রিয়ের প্রধরতা বৃদ্ধি পায় । বাহ্যেঞ্জিষ হইতে মনকে বতই সরাইয়া লইবে ততই অন্তরেঞ্জি-
য়ের বিকাশ হয় । স্বপ্নাবস্থায় যখন বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল বিশ্রাম
করে সেই সময় স্তম্ভ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমবা আমাদের
নিজের নিজের মনের ভাবের রূপ বসাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি
কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় আমবা নিমিত্ত থাকি স্বপ্নবহস্ত কিছু বুঝিতে
পারি না । নিমিত্তাবস্থায় যখন স্বপ্ন দেখি তখন আমবা আমাদের
ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সক্ষম হই না, বেকপ ভাবে দেখিয়া পদার্থ
-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হয় সেকপ ভাবে স্বপ্নেও সক্ষম হই না—
কিন্তু যেজন জাগ্রত থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছেন তিনিই
মানসিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ
করিয়াছেন । প্রথমে স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শিখিবে
হইবে, স্বপ্নাবস্থায় বিচার করিতে শিখিতে হইবে, তবে বেদ-
বহস্ত বুঝিতে যাওয়া উচিত । এইরূপ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় থাকিয়া
কোন এক বিষয় আলোচনা করিবার জন্য চিত্ত স্থির করা
নামট সনিকল্প সমাধি যোগ । অসিগণ এইরূপ যোগাবস্থায়
আবৃত্ত হইয়া জগতের মনোময় বাস্তব বিচরণ করিয়া বেদ
প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন । ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া বেদের
একটি মন্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে বেদে কিরূপ সত্য
আছে তাহা বুঝিতে পারিবে ।

হিন্দুবা বরাবর এই কথা শুনিয়া আসিতেছে যে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া
কথাটা বড় সহজ কথা নয় । কত কত বোগীর সমগ্র জীবন

অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে অথচ কোন একটি বিশেষ মন্তসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। যন্ত্রের প্রকৃত মর্থ টচ্ছা কবিলেই অন্তরে অনুভব কবিতে সক্ষম হওয়াব নামই মন্তসিদ্ধ হওয়া। সূত্ররাং ম্যাক্সমুলবেব ভাষ্য দেখিয়াই বেদ সম্বন্ধে সব বুঝিয়া লইয়াছি একপ মনে কর। আমাদের কর্তব্য নহে। হিন্দুদের এখন আর কিছুই নাই, হিন্দুদের সমাজ নাই বলিলেই হয়, ধর্মকন্ঠের সব লোপ পাইয়াছে, কেবল বাহিবেব অঙ্গহীন অস্থিচন্দ্র সাব দেহটি আছে। তবে যে হিন্দু সমাজ এখন ও বাঁচিয়া আছে। ইহাব কারণ এই যে, হিন্দুদের ঋষিদের নামে এখন ও ভক্তি আছে। সেই ঋষিদের অসন্ত্য ক্রমক বলিয়া যদি কেহ বুঝাইতে চান, হিন্দু ধর্মের গোড়া বেদকে যদি কাব্য বলিয়া কেহ প্রতিপন্ন কবিতে চান তবে তিনি যে অস্থিচন্দ্র সার হিন্দুসমাজের প্রাণহানিব চেষ্টা কবিতেন চেন টছা নিশ্চয়। হিন্দু সমাজের বন্ধন ধর্ম পলিটিকল্ ন্যাসনালিটি ইত্যাদিব বন্ধনে হিন্দুসমাজ টেকেবে না, তাই বলি ঠিক না বুঝিতে চেষ্টা করিয়া যা মনে আসিল বলিয়া কেলিয়া গাববেব সন্ধানাশ করিবাব চেষ্টা কেহ যেন না করেন। বেদে যে অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি দেবতাব কথা আছে তাহারা মনোময় জগতের শক্তি সকলের ভিন্ন নাম। মনোময় জগতের সূর্য্যদেবেব নাম সূর্য্যদেবতা। মনোময় জগতে আবার অগ্নি সূর্য্য কি কথা। বেদের একটি মন্ত লইয়া ইহা বুঝাইতে চাই।

ব্রাহ্মণের প্রথম দীক্ষা-মন্ত পায়ত্রীমন্ত ইহাব দেবতা জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য। এই মন্ত ও এই যন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে আমি বেকপ অর্প বুঝি তাহ। কথঞ্চিৎ বুঝাইতে চাই।

“তৎ সবিতুর্বাৰেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
দীযোবোনঃ প্রচোদয়াৎ।”

আইস সেই দীপ্তিমান্ সবিভা দেবের বহুগীয় ভগ্ন আমবা চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রদান করিবেন”।

বাহু জগতে সূর্য্য উদয় হইলে উহাব জ্যোতি আমবা চক্ষে দেখিতে পাই উহার তেজ আদি অন্যান্য গুণ আমাদের যোগে-
 দ্রিয় দ্বাৰা অনুভব কবিয়া থাকি। কিন্তু যোগী যখন বাহু-
 ইন্দ্রিয় হইতে বন সরাইয়া লন, যখন তিনি স্বপ্নাবস্থায় উপস্থিত
 হন তখন বাহুজগতীয় সূর্য্য উদ্যাব নয়নগোচর হয় না, কিন্তু
 সেই অবস্থায় থাকিয়া যে মানসিক শক্তির সাহায্যে তিনি অন্তর-
 চকুর সাক্ষাতে সূর্য্যতেজ প্রকাশিত দেখিতে পান, অর্থাৎ বাহু-
 দ্রিয়েব সাহায্যে উহার সূর্য্য সম্বন্ধীয় গুণ সকল যেমন প্রত্যক্ষ
 অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থায় যখন ঠিক সেই সকল গুণ প্রত্যক্ষ
 অনুভূত হইয়া থাকে তখন যে মানসিক শক্তিব ক্রিয়া প্রকাশ
 পায় তাহাই সূর্য্য দেবতা শাক্ত। যেমন সূর্য্যেব আলোকে আলো-
 কিত হইয়া বস্তুাদি পদার্থ সকল আমাদের বাহুেন্দ্রিয়ের নিকট
 প্রকাশিত হয় যখন দেখিবে যে অন্তর্জগতীয় পদার্থ সকল সেইকপ
 অন্তবেদ্রিয়েব নিকট প্রকাশিত হইতেছে, তখনই অন্তবে সূর্য্যদেব-
 তার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। বাহু জগতেব সূর্য্য-
 লোকেব গুণ মানুষকে জাগাইয়া বাধা, স্তম্ভজগতেব সূর্য্যেব গুণ
 যোগীকে স্বপ্নাবস্থায় জাগাইয়া রাধা। যোগী বাহু-ইন্দ্রিয় হইতে
 বন সরাইয়া লইয়া যে সময়ে যে মানসিক শক্তির সাহায্যে
 উহার ঠিক্কা-শক্তি ও বিচার ক্ষমতা প্রবুদ্ধ থাকে সেই মানসিক
 শক্তিব নামই সূর্য্য-দেবতা। এই দেবতাকে চিন্তা করিলে,
 এই দেবতাব সাহায্য পাঠিলে অর্থাৎ মানস ক্ষেত্রে সূর্য্য দীপ্তি

প্রকাশিত করিয়া আগন্ত থাকিতে শিখিলে বীশক্তিৰ প্রকাশ পায় । সাধারণ স্বপ্নাবস্থায় বীশক্তির বিকাশ থাকে না, কিন্তু সূর্য্যাদবকে চিন্তা করিয়া বিচার শক্তি প্রবুদ্ধ বাবা, তাই সবিতা যোগে “বীয়োয়োন প্রচোদযাৎ” সত্য মূলক কথাটি সন্নিবেশিত আছে । কিন্তু বেদের সূর্য্য-দেবতাকে যিনি অড়ভুগতীয় সূর্য্য নিবেচনা করেন তিনি এট ‘বীয়োয়োনঃ প্রচোদযাৎ’ কথাটিতে একটুখানি কবিত্ব বই আব কি দেখিতে পাটবেন ।

বেদ সম্বন্ধে এঃ ক্ষুদ্র প্রস্তাবে আব বেলী কিছু বলিয়া উঠিতে পারিলাম না । উপসংহারেব বক্তব্য এট যে, ঋষিদের গুপ্ত-ভাণ্ডার ঋষিদের সাহায্য বিনা খুলিতে চেষ্টা করা রূপা শ্রম মাত্র ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতি ।

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং ।
বহীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমাযঃ ॥
অজা যে তাং জ্বমানাঃ ভজন্তে ।
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ হুমন্তান্ ॥

(অমর—লোহিত, শুক্ল কৃষ্ণাং বহীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং একাং
অজাং প্রকৃতিং নমাযঃ । যে অজাঃ পূকবাঃ জ্বমানাঃ সন্তঃ তাং
প্রকৃতিং ভজন্তে তে এনাং প্রকৃতিং জহতি । ভুক্তভোগান্ তান্
পুত্রবান্ হুমঃ) ।

(লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা (সত্ত্বরজ ও তমোগুণময়ী) বহু প্রজাপ্রসবিনী
জন্মরহিতা একা প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। যে সকল পুত্রবোরা
এই প্রকৃতিকে ভক্তিভাবে ভজনা করেন তাহারা ইহাকে ত্যাগ
করিতে সমর্থ হন। ভুক্তভোগী (বাহাদের ভোগের অবসান হইয়াছে)
এই সকল যুক্ত পুত্রবগণকে আমরা নমস্কার করি। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমু-
দীর টিকাকার উপরে লিখিত নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহার
এই আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা ও সেই নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া
ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সম্বন্ধে ওটি কত কথা বলিব।

এই ভগবতে নিত্য পদার্থই কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি

ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়েই নিত্য পদার্থ কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি অচেতন। সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে অচেতন বলায় অনেকে প্রকৃতিকে, জীবন শূন্য জড়পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্রের স্রাব্য ভাবিয়া থাকেন কিন্তু সাংখ্য দর্শনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহা বুঝা যায় যে প্রকৃতি জীবন শূন্য নহেন।

প্রকৃতি কখনও পুরুষছাড়া থাকে না সাংখ্য দর্শনে এই একটি বিশেষ স্বরণ রাখিয়া তবে সাংখ্য দর্শনের “প্রকৃতি অচেতন” এট কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। দেহ ও দেহীব বো সম্বন্ধ উহাই প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। ওই সম্বন্ধের নাম স্বামী সম্বন্ধ।

আমার এই যে একটি দেহ আছে, আমি জানি যে উহা আমার দেহ, আমি এট দেহের স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ এই দেহের স্বামী। দার্শনিকগণের ভাবানুসারে এই দেহের যে সত্তা আছে উহাব স্বামীই আমাতে আছে। দেহের সাহিত চেতন জীবের এই সম্বন্ধের নাম স্বামী সম্বন্ধ। সেই জন্ত গীতা শাস্ত্রে চেতন জীবকে দেহী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহ শব্দের উদ্ভব স্বামী সম্বন্ধে ইন্দ্র প্রত্যয় করিয়া দেহী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেহের সহিত দেহীর এষ্ট স্বামী সম্বন্ধটি কি তাহা সত্যক বুঝিতে পারিলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মায় ইহাই সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের মূল কথা। এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। স্বামী সম্বন্ধ কথাটির অর্থ একটু পবিষ্কার করিয়া বলিব। একজন লোকেব একখণ্ড ভূমি আছে এ লোকটি ঐ ভূমিখণ্ডের স্বত্বাধিকারী,

অর্থাৎ ঐ ভূমিতে যে স্বব আছে, তিনি সেই স্ববের স্বামী।
 এট স্বাধিকারীত্ব নিবন্ধন উক্ত ভূমিজাত যাবতীর ভোগ্য বস্তুতে
 সেই ব্যক্তিরই অধিকার। উক্ত ভূমিখণ্ডের যে ভোগ্য উৎপাদিকা
 শক্তি আছে উহাট ভূমির স্বব বা স্বভাব এবং ভূস্বামী সেই
 স্বাধিকারী। ভূমির সহিত ভূস্বামীর এট সম্বন্ধেব নাম স্বস্বামী-
 সম্বন্ধ। আমার এই যে দেহ আছে এই দেহের সহিত আমি
 ঐরূপ স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত আছি, এট জনা এট দেহ সম্ভূত
 সুখ ও দুঃখাদি “আমি” ভোগ করিয়া থাকি, এট দেহে যে
 শক্তি থাকা নিবন্ধন উহা হইতে সুখ দুঃখাদি উদ্ভূত হইয়া
 পুরুষের ভোগ সম্পাদন কবেন উহাই দেহেব স্বব বা স্বভাব,
 দেহ এই স্বাধিকারী। দেহেব জীবন শক্তিট এট সুখদুঃখ প্রদা-
 যিনী-শক্তি। যিনি এট শক্তির স্বামী সাংখ্য দর্শন মতে তিনিই
 চেতন। বাহ্যতে স্বামীর বিদ্যমান সাংখ্য দর্শনে ঠাঁটাকেট
 চেতন বলা বাহ্যতে স্বামীর না বাঞ্ছিয়া কেবল স্বব বিদ্যমান
 তাহাকে অচেতন বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বামী উপ-
 মায় উৎপাদিকা শক্তিশালী ক্ষেত্র যেমন অচেতন পদার্থ এবং
 ক্ষেত্রস্বামী চেতন পদার্থ দেহ ও দেহী-সম্বন্ধে ও সেইরূপ, জীবনী-
 শক্তিবিশিষ্ট সজীব দেহকে সাংখ্যদর্শনে অচেতন বলা হইয়া থাকে
 এবং দেহীকে চেতন বলা হইয়া থাকে।

আমবা পূর্বে বলিযাছি যে দেহও দেহীর যে সম্বন্ধ উহাই
 প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। আমার দেহ একট নখব কব পদার্থ,
 সেইজন্য এট দেহস্বামী যে আমি, সেই “আমি” ও কব
 পদার্থ। যতক্ষণ এই কবদেহের স্বামী বলিযা আমাকে বুঝিব

ততক্ষণ আমি চেতন পুরুষ বটে কিন্তু ঐ চেতন ভাব কর ভাব,
ততক্ষণ আমি কর পুরুষ অর্থাৎ জীব ।

বাবিধৌ পুরুষৌ লোকে করশ্যাকব এবচ ।

করঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোক্ষব উচ্যতে ।

গীতা

এই কর পুরুষ ভাব ভিন্ন আর এক পুরুষ ভাব আছে
যাহা অক্ষর ভাব । এই অক্ষর পুরুষটো নিত্য প্রকৃতির সহিত
স্বায়মী ভাবে সম্বন্ধ । বিশ্বের বাবতীর্থ শক্তির একমাত্র আধার
স্বরূপ অনন্ত অসীম যে ক্ষেত্র সমস্ত জগদীশ্বর—রূপে বিস্তারমান
রহিয়াছে তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, এই জগতে পৃথিবী, চন্দ্র,
সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, পশু কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রভৃতি, যাহা-
কিছু আছে সমস্তই এটো একাধারে ভাবমান হইয়া রহিয়াছে ।
এই প্রকৃতি বাহ্যব দেহ, এটো প্রকৃতির সহিত স্বায়মী ভাবে
যিনি যুক্ত, তিনিই অক্ষরপুরুষ । এই অক্ষর পুরুষকে ছাড়িয়া
যদি কেহ এই একাধার সমুদ্ররূপা জগদাদিকাবণ প্রকৃতিকে
ভাবিতে চান তবে তিনি তাঁহার মনের সমক্ষে এক মহাদ্বকারম্ব
বিস্তৃত জড়পরমাণুর সমুদ্র ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিবেন
না । কিন্তু যিনি এই প্রকৃতিকে পরম জ্যোতিবিস্মরূপ অক্ষর
পুরুষের সহিত স্বায়মী সম্বন্ধে যুক্ত বলিয়া বুঝিয়া সেইরূপে
তাঁহার ধ্যান করেন, প্রকৃতি তাঁহার কাছেই আপন স্বরূপ প্রকাশ
করিয়া থাকেন । এটো প্রকৃতি তখন কথা কন ।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়পরমাণুর এক চরম
শব্দ অবস্থাকে (The ultimate essence of matter) জগতের
আধিকারণ বলিতেছেন । ভাববার্ট স্পেন্সার এই জড়ের চরম শব্দ

অবস্থাকে জ্ঞানের অগম্য অব্যক্ত পদার্থ (The unknown and unknowable) বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে জড় এবং অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্যের কথা এবং পাশ্চাত্য জড় পদার্থের কথা একই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের ভিত্তব প্রবেশ করিলে তাঁহাদের এই দ্বয় দৃব হইবে। যে চেতন অক্ষর পুরুষবাদ সাংখ্যের মূল ভিত্তি, সেই টুকুই পাশ্চাত্য জড়বাদে নাট এবং সেইজন্য সাংখ্য দর্শনে ও পাশ্চাত্য জড়বাদে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যের আকাশে সূর্য্য আছেন, পাশ্চাত্য জড়বাদীর পাতালে কেবল অন্ধকার।

সাংখ্যের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সঙ্গে একত্রে ভাবিতে হইবে, নাহিলে প্রকৃতি কথার অর্থ কিছুতেই চন্দ্রবদন হইবে না। প্রকৃতিকে চেতন পুরুষের সহিত যাহারা সম্পর্ক শূন্য ভাবেন, তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্র কথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগৎকে মূল কারণ অব্যেবণ করিতে গিয়া Chaotic cosmic matter কে জগতের আদি কারণ বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রেব প্রকৃতি কথার সেকণ জড়পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদিশক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্বরজ-তম শক্তি, কথা সেকণ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তি আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মাধ্য বড় একটি প্রভেদ আছে, এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আব প্রাচীন পণ্ডিতগণের শক্তি কথার এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবান সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকাল-

কার বিজ্ঞানবিদগণ তাহা ভাবেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তিব
সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ
চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ স্থত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়া-
ছেন। শক্তি কথার সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে
আসিত, কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদগণ যখন তড়িৎ শক্তিব
কথা ভাবেন তখন বালু জড়পদার্থের উপর তড়িৎশক্তির যেকোন
ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উদয়
হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎশক্তিব কথা ভাবিতে গেলে ঐ
শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সূক্ষ্মপ্রদ কি দুঃখপ্রদ, যদি সূক্ষ্মপ্রদ হয় তবে
সে সূক্ষ্ম কোন জাতীয়, যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সেই দুঃখই বা কোন
জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। ইংরাজী Force কথার
অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force
জড়ের গতি কারণের নাম Force। কিন্তু হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে কথিত
শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের
নাম শক্তি। জীব নামধারী যে “আমি” সেই আমার যে অবস্থান্তর
হয় সেই পরিবর্তনের কারণকেই হিন্দুশাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই
সমস্ত কারণে সাংখ্য—যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্তে ইংরাজী
force বা energy কথা ব্যবহার করিতে একটি বিশেষ সাবধান
হওয়া উচিত।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতিব কার্য আরম্ভ হয়, সাংখ্য
দর্শনের এই কথাটি বিজ্ঞান যত দিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন ঐক্য হইবে
না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি Chaotic cosmic matter নহে কেন
না সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের

আভ্যাস আভ্যাসিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি উপাধি অভিমানী হিবণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের Chaotic cosmic matter নিজীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বাট কিন্তু সজীব। আমাব সন্ধানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড়পদার্থ সেইরূপ হিবণ্যগর্ভ পুরুষের সন্ধানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণের মতে এই জগত কাহা-বও সম্বন্ধ প্রসূত নহে। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা-যায়, এই যে বাহ্য জগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থায় বীজ স্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদিপুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাংখ্য দর্শন অনুসারে সৃষ্টিব প্রাবল্যে আদিপুরুষের অন্তঃকরণের যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ, চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরিণামি কুটম্ব, যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতোছে, কিন্তু নিত্যপুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য কবিতো সমর্থ হন নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য কবিতো পাবেন না এবং এইজন্তই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা কবিয়া সৃষ্টিব প্রথমাবস্থা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পবমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে বহিরাছে। পবমাণু সকল গুণিতেছে মর্ডিতেছে একটি অপ-রূপিত কে আঘাত করিতেছে, আবার প্রতিহত হইয়া ফিবিয়া আসি-তেছে, পবমাণু সমুদ্রে নামাক্রম আবর্ত গুণিতেছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শন আলোচনা কবিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায় যে

সময় মহৎ-তত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়া সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ময় তেজঃপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন, প্রকৃতিব গুণকোভ হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জানময় ভাবেব স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টিব প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন পুরুষকে ধ্যান নিমগ্ন করানই তাঁহার শক্তির ক্রিয়া। এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধি তত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব প্রসব করিল এবং এইরূপে সৃষ্টি কার্য চলিল ।

এইরূপে যখনই একটু ভাগ করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তখনই উচ্চাচ স্পষ্ট বুদ্ধিতে পাওয়া যায় যে, সাংখ্যিকার সৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণ সে দিক দিয়াও যান নাই ।

সাংখ্যিকার প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এই জড় কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের *Inanimate matter* একার্থ বোধক নহে । প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্য নহেন, পুরুষ সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পান না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুদ্ধিতে পাবেন কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুদ্ধিতে পাবেন না এই জড়ই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায় ।

কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায়, কেন না উহার জন্ম বৃদ্ধি অবস্থান্তর পবিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্য হইলেও উহার ক্রম পরিণাম আছে, এবং সেই ক্রম পবিণাম প্রকৃতি অভ্যন্তরবস্থ শক্তিববশে একটি অবশ্যস্তাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায় । যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই প্রকৃতির অন্তর্বাহী শক্তি বলিয়া বর্ণনা

কবিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও ক্রমপবিনাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্ম মরণ ও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universe কে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরাপ্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন।

অপবেদ্যমিতচ্ছক্কাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপসাম ।

জীব ভূতাং মহানাহো ব্যবদং দার্য্যতেজগত ।

গীতা। ৭।৫

উহ হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরিক শক্তি। উদাহরণে একদমের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়কাল দার্শনিকগণ Atomism (The universal life) অর্থে বাতা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কণাবৎ তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হঠাত প্রথম যে জীব উৎপন্ন হয় তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান, সংশয় রহিত বুদ্ধিবিগ্নান ভিন্ন তাঁহাদের অনু কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কার্শ্বল্য নাই, এটুকু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেরূপ প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিবে সমর্থ হইবে।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা এটি,-

সদ্ব-বজন্তমসাং সাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ ।

প্রকৃতি কণার অর্থ বুঝিতে হইলে সদ্ব বজ ও তমো গুণ কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া ঐ ত্রিগুণের সমতা কিরূপ তাত্ দাবণা করিতে হইবে। যে পুরুষের চিন্তাক্ষত্রে ঐ ত্রিগুণের সমতা

উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারই চিন্তাক্ষেত্রে প্রকৃতিব সাক্ষ্য লাভ
কবিয়াছে। ত্রিগুণের সাম্যভাব বাহ্যিক চিন্তে সদাই নিগ্গমান
তিনিই শাস্ত তিনিই শিব। এবং এই শিবের চিন্তাক্ষেত্রেই প্রকৃতি ।

সদ্ব রজঃ ও তম গুণেব অৰ্প গীতান্তে যাহা কপিত হইয়াছে
তাহাই এই ধানে উদ্ধৃত কবিলাম ।

সদ্বং বজ্রসংশ্লেচি গুণাঃ প্রকৃতি সন্তবাঃ ।
নিবধন্তি মহাবাহো । দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫
তত্র সদ্বং নির্মলদ্ব্যং প্রকাশকমনামবম্ ।
শুধসঙ্গেন বধাংস্তি জ্ঞানসঙ্গেন যানব ॥৬
এভোবাগায়কং বিদ্ধি তুলাসঙ্গমুত্তমম্ ।
তন্নিবগ্ৰাতি কোত্তের কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম ॥৭
তমসজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাম ।
প্রমাদালগ্নিনিদ্রাভিস্তন্নিবগ্ৰাতি ভাবত ॥৮
সদ্বং স্ত্রাপ সত্তয়তি বজ্র কৰ্ম্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাতৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সত্তবভ্যুত ॥৯
এজমশ্চাতিভূষ সদ্বং ভবতি ভাবত ।
বজ্রঃ সদ্বং তমশ্চৈব তমঃ সদ্বং বজ্রসংগম ॥১০
সকলদেবেষু দেহেন্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদাতদা বিদ্বাদ্ভিবৃদ্ধং সবমিভ্যুত ॥১১
লোভ প্রসক্তিরাস্তঃ কৰ্ম্মণামশম স্মৃহ ।
বজ্রস্যোতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভবতর্ষভ ॥১২
অপ্রকাশোপ্রসক্তিঞ্চ প্রমাদো মোহএবচ ।
তমসোতানি জাবাস্ত বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩

সহ বজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারাই অব্যয় দেহীকে (চেতন আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সহগুণ প্রকাশক এবং অনাময়, নির্মলতা হেতু এই সহগুণ দেহীকে সূৰ্য্য সঙ্গে এবং জ্ঞান সঙ্গে বদ্ধ করে।

রজঃগুণ বাগায়ক এবং তুফা সঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, এই বজঃগুণ দেহীকে কণা সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমঃগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মগ্ন করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায আবদ্ধ করে।

সহ দেহীগণকে সূৰ্য্যে আসক্ত করে, বজঃ কর্ণে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমঃগুণ প্রমাদেয় বশীভূত করে। সহ-গুণ বজঃ ও তমকে, রজঃগুণ সহ ও তমকে এবং তমঃগুণ সহ ও বজকে অভিলুপ্ত করিয়া উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

যখন দেহেব সর্বদাবে জ্ঞানেব প্রকাশ উপাধিত হই তখন সহগুণ বুদ্ধি পাইবাছে বুদ্ধিও।

বজোঃগুণ বুদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি, কামাবৃত্তি স্পৃহাও অশাঃগুণ উদয় হয়, তমোঃগুণ বুদ্ধি পাঠিলে বিবেক নশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদও মোহ উপাধিত হয়।

গীতা হইতে যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে হুতা যুগ্ম যার যে সূৰ্য্য ও জ্ঞানপ্রদা শক্তিব নাম সহগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের 'চিত চকল হইবা তাঁহার কর্ণে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোঃগুণ এবং যে জ্ঞান মোহ উপাধিত হইয়া আলস্যেব উদয় হয় তাহারই নাম তমোঃগুণ। এই সহ, বজঃ ও তমোঃগুণ যে ক্ষেত্র সঙ্কত পদার্থ উহাই প্রকৃতি : সহ, বজঃ ও তমোঃগুণই প্রকৃতিব বস,

জীব দেহধারী হউযা এই ত্রিবিধ বস ভোগ করিয়া থাকেন । কিন্তু
প্রীতবে চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণব যখন সাম্যবস্থা উপস্থিত হয় তখন
ঠাঁহাব চিত্তের বিস্তার অসীম হইয়া পড়ে, ঠাঁহাব চিদাকাশ
তখন আর কোনও ভবজ থাকে না । চিত্তেব এই অবস্থার নাম
সমাধি অবস্থা, এই অবস্থায় তিনি অসীম এক । প্রকৃতির স্বামীত্ব
লাভ কবেন অর্থাৎ অক্ষব পুরুষ সাক্ষ্য লাভ কবেন । টাঁহাই
পূর্ণানন্দ অবস্থা । সেটী জ্ঞান পূর্ণানন্দকেই প্রকৃতির স্বরূপ বলা
হইয়া থাকে ।

প্রকৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমবা বুঝিলাম যে প্রকৃতি
সমাদিগম্যা আনন্দময়ী জগজ্জননী । টাঁন শিব জগদ্বাসিনী । যদি
কেহ প্রকৃতিকে খুঁজিতে চান তবে শিবের জগদেব দিকে অন্তর্দৃষ্টি
আনয়ন করুন তাহাই প্রকৃতিক বুঝিতে পারেন ।

ও নমঃ শিবায় ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

একটা প্রবন্ধ ।

একটা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে । একটা কিছু জিনিষ প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে উপাদান সংগ্রহ করা চাই, সেইজন্য আমার প্রবন্ধের উপাদান কি কি চাই, তাহাবই যোগাড় প্রথমে করিতে হইবে । লোকে বলে কালী কলম মন, লেখে তিন জন । আমি কালী প্রস্তুত করিয়াছি, হংস পুঙ্খ কাটিয়া কলম প্রস্তুত করিয়াছি, কালীতে কলম ডুবাইয়া টেবিলের উপর কাগজ ফেলিয়া চেযাবে বসিয়া দিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু লেখার প্রধান উপাদান মনটি যে আমার কোথায় বহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাঠাতছি না :

যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন একবার চেষ্টা করিয। দেখা উচিত যদি খুঁজিয়া মনেব তরাস পাওয়া যায়, ও লেখাটা সমাপ্ত করিতে পারি । আমি আমার মনের অন্তসন্ধানের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় কে যেন মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘তোমার মন কি কখনও ছিল’ কথাটা শুনিবাই ত চমকিয়া উঠিলাম । লোকটি কে, ঐ কথা বলিল তাহাকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না । কিন্তু স্বরটি বড় মিষ্ট, লাগিল সেইজন্য ঐ কথাটা একেবারে অগ্রাহ করিতে পারিলাম না । আমার ত বেশ মনে হচ্ছে যে আমার মন ছিল । সেই মনের ভিতর কত সুখের সংকল্প বাধিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আজি কে বলিল আমার মন কখনও ছিল না ।

আমাব মন ছিল এটা নিশ্চয় কথা কিন্তু আমার সেই মন কি বকম বস্তু তাত কখনও ভাবি নাই। মনটা আমার কেমন বস্তু ছিল, তাহা আমি একবার ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

আমি একজন চেতন মনুষ্য, আমার একটা দেহ আছে, ঐ দেহে একটি শক্তি আছে, যাহার নাম জীবনী শক্তি। ঐ দেহের উপর ঐ জীবনী শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, আমি সেই সব ক্রিয়ার ফলভোগ্য কবিতেছি। আমার মন যাহাকে বলি উভাও কি জীবনী শক্তির একটা ক্রিয়া ?

জীবনী শক্তি কি ? মন কি ? এই জিজ্ঞাসু হওয়াতে আমার মাথাটা যেন একটু ঘূবিয়া গেল, কালী কলম ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। একটু তন্দ্রাও আসিল। তন্দ্রাবস্থাতে দেখি যে একখানা বিপুল পরিধির চাকা আমার সামনে ঘূবিতেছে ও নাদস্বরে একটা ধ্বনি হইতেছে। ঐ চক্রটি সূর্য্যসম তেজোময়। চাকাখানি অবিরাম ঘূবিতেছে এবং নানাবর্ণের কতকগুলি তেজস্কুলিঙ্গ ঐ চাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবিরাম গতিতে কোথাও চলিতেছে ও কতকগুলো তেজোকনা চাপি দিক হইতে আসিয়া টপ্‌টপ্‌ ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ঐ চাকায় আসিয়া পড়িতেছে। ঐ সময় আমি দেখি যে আমি একটি ছোট তেজোকণা, ঐ চাকার পরিধিতে পড়িবার জন্য বেগে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছি, অবশেষে চাকার কাছে আসিয়া একটি নাম জোরে উচ্চারণ করিয়া ঝুপ করিয়া উহা পরিধিতে পড়িয়া গেলাম, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া মনে হইতেছে যে ঐ সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট চক্রটিই আমার জীবনীশক্তি, আমার মন একটি তেজোকণা যাহা ঐ চক্র হইতে বাহির হইয়া কোণায় চলিয়া যাব, এবং কখনও না ফিবিয়া

আসিয়া ঐ চাকার পরিধিতে মিশিয়া যায়। ঐ জ্যোতিষ্ময় চক্র-
টার মধ্যস্থলটিতে সুনীল আকাশ, সেই আকাশের রূপ দেখিলে আব
ভোলা যায় না, ঐ নীলিমাকে বড় ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

জীবনী শক্তি ও মনের কথা যাগ বলিলাম, আমার ঐ কথাতে
অনেকেই আপত্তি করিতে পাবেন, বলিতে পারেন যে “তুমি কি
বলিলে উহাব ত কোন অর্থ দেখিতেছি না”। উত্তবে আমি কেবল
এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা ঐ কথার অর্থ বুঝিলে না।
কিন্তু ঐ চাকাখানি যদি দেখিতেন তবে অর্থ বুঝিতে পারিতেন।
স্বপ্নের ভাষায় জীবনী শক্তি ও মন কি তাহাত এক বকর ঠিক
করিলাম, এখন আগ্রহ মানুষের ভাষাতে জীবনী শক্তিটা। ঠিক
তাহাও ত একবার ভাবিতে হইতেছে। জীবনীশক্তি কথাতে আমি
সোজামুজী এই বুঝি যে দেহের মধ্যে যে আগুন জ্বালাহা
বাধার জন্ত আমার প্রত্যহ ভোজন করিতে হয়, উহাব নাম
জীবনী শক্তি। সুতরাং তেজ যেমন সুতরাং শক্তি সেইরূপ আমার
দেহে একটা তেজ আছে, উহাই আমার জীবনী শক্তি। বসন্ত-
ঋতু কাঠ একজাষগাখ বাঁধিয়া আগুন ধরাইয়া চারিদিকের বাতাসে
সাহত কাঠের কণায় রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং কাঠ থেকে একটা
তেজ বাহির হইতে থাকে, উহাব নাম আগুন, জীবনীশক্তি ও
সেইরূপ একটা আগুন। কাঠ যেমন বায়ুসাপবে জ্বালা ধাক্কা
আলিতে থাকে আমার দেহ ও সেইরূপ এক মহাসাগরে জ্বালা
আছে, আমার দেহের অণুসকল কি এক আশ্চর্য আকর্ষণ বশে
স্থলভাব ছাড়িয়া ক্রমাগতই হ্রস্বভাবাপন্ন হইয়া শেষে সেই মহা-
সাগরে মিলিতেছে এবং উহাব ফলে একটা অনির্বচনীয় আত্যন্ত-
রিক আগুন জ্বলিতেছে। ঐ যে মহাসাগরের কথা বলিলাম উহার

কুল কিনারা নাই । আমার দেহের কথা সকল দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মহাসাগরের স্রোতে অনন্ত দূরে চলিতেছে আমার আমার দেহের কথা সমস্ত পূর্ণ কবিরাজ জ্ঞান আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ ইচ্ছা কখন ক্ষুধা, কখন তৃষ্ণা, কখন কাম, কখন জ্ঞান, কখন সংকল্প রূপে পবিণত হইতেছে । অন্তরের এই অগ্নির কথা যখন ভাবি এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐ মহাসাগরের কথা মনে হয় তখন দেখি যে আমার হৃদয়ের আগুনের জ্যোতিই অনন্তব্যাপী । দেহটা যেন ঐ আগুনের ঢাকনি, কিন্তু ঐ দীপশিখার তেজ দেহ ভেদ করিয়া অপার সমুদ্রের স্রোতে চলিতেছে । তখন আমার হৃদয়েও দীপ শিখা দেখি, সকলের হৃদয় মধ্যেই সেইরূপ এক একটি দীপশিখা দেখিতে পাই । এই অসংখ্য দীপশিখা কে জ্বালিল, কেন জ্বালিল ? কে বলিতে পাবে ? ইহা উক্ত দিবস জগৎ দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে । কিন্তু শাস্ত্রের কথা এখন কহিতে চাহি না ।

একদিন কাস্তিক মাসে বালিকারা নদীতে প্রদীপ তালাইয়া দীপান্তে দেখিয়াছিলাম, যে বাহাব প্রদীপটি তালাইয়া দিয়া একাগ্র-মনে সেই প্রদীপের দিকে চাহিয়া বহিয়াছে, শেষে ভাসিয়া ভাসিয়া প্রদীপ অদৃশ্য হইলে পব উচ্চাষা যবে কবিতা গেল । ঐ প্রদীপ ভাসনের দৃশ্য আমার মনে যে কি অপূর্ণ ভাবের উদয় করিয়া ছিল, তাহাত আমার বর্ণনার ক্ষমতা নাই । আমার এখন মনে হয় আমার হৃদয়—প্রদীপ তালাইয়া দিব বলিবার ঐ প্রদীপ তালাইয়া রাখিয়াছি । সাগরের কূলে পল্লভাবার পূর্বে বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া যাব, তাই দেহের ঢাকনে ঐ প্রদীপ ঢাকা দিয়া রাখিয়াছি ।

আমার মন কি ঐ দীপশিখা ? ঠিক তাহা নহে । আমার মন ঐ দীপশিখা—নিঃসৃত এক প্রকার জ্যোতি । ঐ জ্যোতিরূপ

পদার্থ কখন মাথা থেকে বাহির হয় কখন হৃদয় থেকে বাহির হইয়া থাকে। মনের সংজ্ঞাটা আমি এট করিতে ইচ্ছা করি, হৃদয়ের অন্তরস্থ জীবনী শক্তিরূপ অগ্নির তেজ যখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক রূপ ডোমের ভিতর দিয়া বাহির হয় তখন উহাকে মন নাম দেওয়া যায়। এইত মনটা পদার্থ কি এক রকম স্থিতি হইল। এখন মনটাকে খুঁজিবার জন্য দেখিতে হইবে যে আমার জীব-নাগ্নিব তেজ হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়া বাহির হইয়া এখন কোথায় ঘাইতেছে।

হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া বাহা দেখিলাম তাহা এখন বলিতে পারিলাম না। তথা হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে চলিয়া গিয়া এক মনো—পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনিই আমি, তিনি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী। অজ্ঞানী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মন কোথায় বলিয়া দিতে পাবেন ? জ্ঞানী আমি বলিলেন তোমার মন ত এখন ভিতরে নাহি মন যে তোমার বাহিরে। আমি তখন দেখিলাম মন আমার এট ক্ষুদ্র প্রবল্গতি উপর রহিয়াছে। জ্ঞানী আমি হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া, হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিলেন, “মন কাতার তোমাব না আমাব ? তোমার কি কখন মন ছিল ?” অজ্ঞানী আমি বলিলাম, “মন আপনার, আমার মন কখনও ছিল না।” জ্ঞানী আমি বলিলেন, “মন তোমাবও নহে আমারও নহে, মন বিশ্বরূপের অংশ।” বোম শব্দে আকাশটা কাটিয়া গেল। উহান পর কি হইল মনে নাহি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সোনার পাখী ।

আমরা কয় ভাটরে একটি অবণ্যে বাস করিতাম, সন্ধ্যাে বনে বনে বেড়াইতাম, আমরা যেমন স্নেহে সন্ধ্যাে বেড়াইতাম বনের সোনার পাখীগুলি ও সেইরূপ উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত, পাখী-গুলিকে খাবার দিতাম তাহা। আমাদেরিগকে গান শুনাইত, বড় আনন্দে ছিলাম, ছাড়া পাখী'ব মধুর গান নে কি মধুর তাহা হোমব। নু'কিবে না।

চির দিন স্নেহে কাটে না—কতকগুলো ব্যাধ সেট অবণ্যে প্রবেশ কবিশ। আমাদের সদানন্দ পাখীগুলিব বক্ত খাইবাব অভিলাধে ব্যাধ সকল নান। অল্প প্রহাবে পাখীগুলিব প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। জাল পাতিয়া ভাল ভাল খাবাবের প্রলোভন দেখাইয়া পাখী ধবিত্তে লাগিল। দেখিলাম, পাখীগুলি ব্যাধের প্রলোভনে ভুলিয়া তাহাদের জালে পড়িয়া প্রাণ হারাইতোছ, অজ্ঞান পাখী প্রলোভনে ভুলিয়া যায়।

আমরাও একটি সোনার বাঁচা নির্মাণ করিলাম, সেই বাঁচায় পাখী ভুলান ভাল ভাল খাবাব রাখিয়া দিলাম, পাখীগুলি তখন আবাব আমাদের বাঁচাব আরও ভাল ভাল খাবাব দেখিয়া আমাদের বাঁচাতই আসিত, ব্যাধের জালের দিক বড় একটা

যাইত না। আমরা কিন্তু খাঁচার দ্বার কখনও রুদ্ধ করিতাম না, খাঁচার বদ্ধ পাখী যথুর গান গাইতে ভুলিয়া যাব।

এই রকমে কিছুকাল কাটে, ক্রমে এমনি সময় আসিল যে আমরা দীর্ঘকাল ব্যাপী নিজার অভিজ্ঞত হইলাম। সেট সময়, সময় বুঝিবা ব্যাধেরা আমাদের খাঁচা অধিকৃত করিল, খাঁচার সহিত সোনার পাখী সকল ব্যাধের হাতে পড়িল, পাছে পাখীরা উড়িয়া যায় এই ভয়ে ব্যাধগুলি খাঁচার দ্বার বদ্ধ করিয়া দিল এবং একটি একটি করিয়া পাখীগুলিকে মারিয়া তাহাদের রক্ত খাইতে লাগিল।

এটি শেব হইয়াছে, হুই একজন তাইবের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ঘুম ভাঙ্গিয়াই তাহাদের আদরের পাখীগুলির দাকণ বন্ধনা দোখনা তাহারা চীৎকার করিতেছে। তাহাদের আর্ন্তনাদ আমাব কানে এবেশ করিতেছে, কিন্তু চোক হইতে পোড়া ঘুম আর ছাড়িতেছে না। তাই, আমার চোকে একটু জল দেবে এস, নহিলে ঘুম যে ভাগে না।

জীগণ আমাদের বনের পাখী, হালধর পরবশ পাষাণগণ ব্যাধ ইহার রমণীগণকে এলোভনে ভুলাইয়া তাহাদের রক্ত শোষণ করে, বিবাহ পদ্ধতি আমাদের সোণার খাঁচা। এই সোনার খাঁচা এখন ব্যাধের হাতে পড়িয়াছে তাই সকল, একবার জাগিয়া দেখ তোমাদের মনোহারিনী সচ্ছন্দে-বিহারিনী সুন্দরীগণেব কি দুর্দশা ঘটিয়াছে।

আমার হৃদয় শরীর একটি সোনার পাখী, আমার দেহ সোনারখাঁচা, কামাদি রিপু সকল ব্যাধ। এই ব্যাধ সকল আমার দেহ অধিকার করিয়া আমার খাঁচার দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমাব পাখী—আর আমাব মরুব গান শুনাব না, ব্যাধ সকল উহাকে
 নষ্ট কবিবার জন্য উদ্ভত বহিষাছে, ইহা দেখিবাও আমাব ঘুম
 ভাঙ্গিতেছে না কেন? বুঝিবাছি—আমি বাহাকে ঘুম বলিতেছি
 ইহা ঘুম নহে—ইহা ঐ পাষণ্ডের মোহিনীমায়া। তোমবা কে আছ
 আমাব চক্ষে একটু জল দাও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । নিরামিষ ভোজন ।

ছাত্র । মহাশয় মাংস ভোজন কবারটা ভাল না মন্দ ?

শিক্ষক । সিংহ ব্যাঘ্রের পক্ষে ভাল কিন্তু গরু ছাগলের পক্ষে ভাল নয় ।

ছাত্র । আমি পশুদের কথা কহিতেছি না, মানুষের পক্ষে উহা উপযোগী কি না ?

শি । যেমন পশুজাতির সকলের পক্ষে এক নিয়ম থাকে না । সেইরূপ মানুষদের সকলের জন্য এক নিয়ম থাকে না । মাংস ভোজন কাহারও পক্ষে ভাল আবার অন্যের পক্ষে মন্দ । যে সকল মানুষ এখনও অসত্যাবস্থায় আছে তাহারা মাংস ভোজনেই দিন পাত করে, কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জের উপর দিন পাত করিলে তাহাদের শরীর ধারণ করা কষ্টকর হয় সুতরাং মাংস ভোজন তাহাদের পক্ষে উপযোগী । কিন্তু মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে নিরামিষী হইয়াও স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যায় সে অবস্থায় মানুষ মাংস ভোজন করিয়া উদরকে কবচ-স্থান রূপে পরিণত করিলে ইহা আমি ভাল বিবেচনা করি না । বাঁহাও মাংস ভোজনে প্রয়োজন আছে তিনি মাংস ভক্ষণ কখন ক্ষতি নাই, কিন্তু বাঁহাও জীবন ধারণের জন্য মাংস ভোজন প্রয়োজনীয় নহে তিনি যদি রসনা তৃপ্তি করিবার জন্য আমিশাশী হন তবে তিনি তাহার উন্নতির পথে কষ্টকর দেন ।

ছা। আমি বিলাতী ডাক্তারদের নিকট হইতে জানিয়াছি যে, মাংসে পুষ্টিকর নাটট্রোজিন পদার্থ বেশী আছে, এবং সেই জন্য মাংস ভোজনে শরীর পুষ্ট ও সবল হয় সুতরাং শরীরে উপযুক্ত সামর্থ্য বন্ধাব জন্য উহা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়।

শি। নাটট্রোজিন পদার্থ শরীরে প্রবেশ করাইলেই যদি দেহের পুষ্টিসাধন হইত তবে আমত নাটট্রোজিন আর অক্লিকন যাহা লইয়া নাটট্রোজিন পদার্থ নির্গত, তাহা শরীরান্তঃস্থে প্রবেশ করাইতে পারিলেই শরীরে পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। অস্তিত্বে চূণ আছে, খানক চূণ খাইলেই কি অস্তিত্ব পুষ্টিসাধন হইতে পারে। শরীরের ভিতর যাদ এমন ক্ষমতা থাকিত যে তদ্বাযা ঐ চূণকে অস্তিত্ব-সুত্র পদার্থে পরিণত করিতে পারিত তবেই চূণ খাইলে অস্তিত্ব পুষ্টিসাধন হইতে পারিত। সেইরূপ মাংস ভোজন করা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে গেলে মাংসে কি কি “কেমিক্যাল এলিমেন্ট” আছে তাহাও অধ্যয়ন করিয়া দেখা যায় না। যিনি ভোজন করিবেন তাহাও ভিতরে বিকল্প শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্তব্য। পক্ষকে মাংস খাওয়াইল সে কখনও বলিষ্ট হইবে না। কেবল বসনা তৃপ্তি কল্পিত আহারের উদ্দেশ্য নহে। আহারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটুকু বাহার মাংস ভোজন প্রয়োজন তাহাও পক্ষে মাংস ভোজন বিধি আপ বাহার ঠিক প্রয়োজন নাট তাহার পক্ষে অবিধি।

১।, আহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

শি। মানুষ ও অন্যান্য জীব জন্ত শরীর সঞ্চালন বা যন চালনা দ্বারা শারীরিক বা মানসিক কর্ম করিয়া থাকে। এই কর্ম করিবাব ক্ষমতাই মানুষের জীবন। যেমন বাষ্পের তেজ-শক্তি কলের

গাড়ীর গতিরূপ কণ্ঠে পরিণত হয় সেইরূপ সঞ্জ্বর বা জীবজন্তু যে সকল কন্ঠ কবে তাহা দ্বারা আত্যন্তরিক শক্তির (Energy) ব্যয় হয়। এই ব্যয় পূরণ করিবার জন্য আহাৰেব প্রয়োজন। ভোজ্য দ্রব্য শরীর যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিবার নানা রূপ শারীরিক ক্রিয়াদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে অবশেষে প্রাপ্ত হয় পশে নিখাস দ্বারা গৃহীত অমজান বাস্পের সহিত রাসায়নিক সংযোগে এবং তড়িত, আকর্ষণ উত্থাদি শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত হয়। কাতের সহিত অমজানের রাসায়নিক সংযোগে কঠিন যখন পুণ্য অংশান্ত প্রাপ্ত হয় তখন যেমন তাহা হঠাৎ তেজস্বিত্ব নির্গত হয় তদ্রূপ দ্রব্যও সেইরূপ যখন নানান পদার্থের সংযোগে অবস্থায় প্রাপ্ত হয় তখন সেই ভূতদ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি (Potential energy) বাহ্যে (Kinetic energy) প্রকটিত হয়। ভূতদ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই শরীরের তাপ ম্যাগনেটিকম ইলেকট্রিসিটি উত্থাদি স্থূলজাতীয় শক্তি এবং উচ্ছাশক্তি, বল্লভা শক্তি ইত্যাদি শক্তি উদ্ভূত হইয়া থাকে। স্থূলজাতীয় শক্তির সাহায্যে আমল স্থূলজাতীয় বস্তু অর্থাৎ শরীর সঞ্চালনাদি কন্ঠ করিবার থাকি এবং স্থূলজাতীয় শক্তির সাহায্যে মানসিক কন্ঠ করিবার থাকি। বাহ্যকে যে রূপ কন্ঠ করিতে হয় সেই কন্ঠে যে শক্তির ব্যয় হয় যেদপ আহাৰ দ্বারা সে ব্যয় সহজেই পূরণ করা যায় তাহাই জীবের পক্ষে প্রাপ্ত আহাৰ।

ছাত্র। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষক। বহির্জগতে যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাও তাহা যেমন সকলই এক প্রকারের নয় অর্থাৎ কোন শক্তি তেজ-

রূপ, কোন শক্তি উদ্ভিতরূপ, কোন শক্তি ম্যাগ্নেটিকম্ রূপে কোন শক্তি বায়ান্তরিক আকর্ষণ রূপে প্রকাশ পায় আহার ভিতবে ও যে সকল শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় তাহাও এক বস্তুম্বে নহে । যে আহার শক্তির বাণ হাত নাড়া যায়, যে জাতীয় শক্তির বশে প্রাণ লহিতে থাকে, যে জাতীয় শক্তির বাণ উচ্ছ্বা জ্বলে, যাহাব সাহায্যে কল্লনা কবা যায় উহাণা সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবের । বহিঃপ্রগত বাসায়ানক শক্তি তহীত যেমন উদ্ভাপ জ্বলে আহার ভাপশক্তি চটতে আলোক শক্তি উদ্ভূত হয় কখন বা ভািত শক্তি উদ্ভূত হয় আহারগে তাতিত তহীত ম্যাগ্নেটিকম্ শক্তি জন্মিয়া থাকে । সেটরূপ দৈতব ভিতবে ও অল্পগত-অকর্মানিতও শক্তি চটতে অবস্থা তদ মান কণ শক্তি উদ্ভূত হয় এবং সেট এং এং জাতীয় বস্তু কবা যায় । যেমন যে জাতীয় শক্তির দ্বারা মস্তৃ সঞ্চালন তটোতত এং যে জাতীয় শক্তির দ্বারা মাসুমণ্ডলীয় কণা চটেতেছে উহাণা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় ।

মানবান প্ৰথম দ্বাব আনা/চৎ কালত বে ভাবেব তৎ শাবীরিক শক্তিমান দ্বাব । আনাদেন লাস্তি সে ভাবেব তৎ মা উহা সচেজই বুঝা যায় । ইহা বুঝিলে তুমি চোও বুঝিত পাবিবে যে মানসিক শমদ্বাব মনজাতীয় শক্তির বাদ হয় এবং শাবীরিক শমদ্বাবা মূলজাতীয় শক্তির বাণ হয় ।

এখন আহাৰের উল্লেখ জীবন ধারণ কবা, যে যেকপ কন্ম করিবে তাহাকে সেটরূপ শক্তি দান করা । স্ততরাং যে মন্তব্য যেকপ কন্ম দ্বারা যেকপ শক্তির ব্যয় কবিয়া থাকে যেকপ আহাৰ করিলে সেইরূপ শক্তি সচক্ষ্ট উদ্ভূত হইতে পারে সেইরূপ আহাৰই তাহার পক্ষে প্রশস্ত । সুতরা ভোজন সম্বন্ধে সকলের পক্ষে এক নিবন্ধ খাটা সম্ভব নয় ।

বড় স্থূলপদার্থ আর ধান শস্য, সূক্ষ্মপদার্থ । মাংস স্থূল পদার্থ আব
 দুই সূক্ষ্মপদার্থ । সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি সূক্ষ্মপদার্থ হইতে যত সহজে পাওয়া
 যায় স্থূলপদার্থ হইতে তত সহজে পাওয়া সম্ভব নহে । গরুকে সূক্ষ্ম
 জাতীয় কৰ্ম মানসিক চিন্তাদি কাজ করিতে হয় না; কিন্তু মানুষকে
 তাহা করিতে হয় এইজন্য মনুষ্য খুঁড় খাইবা থাকিতে পাবে না, চাল
 খাইতে হয় । ব্যাঘ্র কেবল মাংস ভোজন করিয়া দিনপাত করিতে
 পারে কিন্তু মানুষে তাহা পাবে না, কেননা কেবল মাংস ভোজন
 করিয়া থাকিলে মাংসের জীব স্থূলজাতীয় দ্রব্য হইতে মানসিক চিন্তার
 অমূলক সূক্ষ্মজাতীয় শক্তি উদ্ভাবন করা দুক্ল হইয়া পড়ে ।

তাহা । সকল ভোজ্যপদার্থেই ত অন্তর্নিহিত শক্তি আছে এবং
 সেই শক্তি ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে, তবে স্থূল-
 পদার্থ হইতে সূক্ষ্মশক্তির প্রকাশ হওয়া কি অসম্ভব ?

সম্ভব । অসম্ভব নহে, কিন্তু দুক্ল । চুষকেবল নিকট লোহা
 গ্রাণুলে তাহাও চৌম্বকীয় শক্তির প্রকাশ হয় কিন্তু কয়লা বাঁধিলে
 হয় না । কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি চৌম্বকীয় শক্তিতে পরিণত হইতে
 পারে না এমন নহে । সেইরূপ আমাদের দেহবাহুব অত্যন্ত প্রবেশ
 করিয়া চৌম্বক-শক্তি যত সহজে সূক্ষ্মশক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে
 মাংসস্থ-শক্তি তত সহজে সঞ্চারিত পাবে না ।

মাংস ভোজন স্বল্পকালে আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝা যায় যে
 মাংস ভোজনে স্থূলকণের অমূলক-শক্তির বেগ যেকপ বেশী হয়,
 নিম্ন-মিথ ভোজনে সেকপ হয় না । ব্যাঘ্রের শক্তির বেগ আব হস্তীর
 শক্তির বেগ ভুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে । ব্যাঘ্রের
 বল হস্তীর বল অপেক্ষা বেশী নহে, কিন্তু উহার বেগ বেশী ।
 ব্যাঘ্রের নিম্নাঙ্গ যেকপ খনন করবে তাহা ভূমি দেখিয়াছ । মাংস

ভোজনে নিখাসেব বেগ খবতব হয় । সুদ্ধাদি কৰ্মে শাবীৰিক সুন্দ
শক্তি বেগবান হওয়া প্রয়োজন, সুদ্ধাদি কার্যো-লিপ্ত-যোদ্ধাশ শাস-
ও খব বহিতে থাকে এই জন্ত ক্ষত্রিয়েব পক্ষে মাংস ভোজন ‘নযিক্ত’
নহে । কিন্তু বাঁহাবা সুলভাতীয় শক্তিব বেগ কমাইতে ইচ্ছুক,
বাঁহাবা তাহাদেব আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে সক্ষম
ভাবাপন্ন কবিয়া স্ফুৰ্ণভূতিব বিকাশে যত্নবান হইতে ইচ্ছুক
তাহাদেব পক্ষ মাংস ভোজন কৰা শ্রেয় নহে ।

দেখ কোন্ দ্রব্য ভোজন কৰা কাহার পক্ষে ভাল আৰু কাহার
পক্ষেই বা মন্দ তাহা স্থির কৰিবান্ন জন্ত আমবা প্রৱৰ্ত্তিদেবীৰ নিকট
হইতে একটি যত্ন পাইবাছিলান কিন্তু আমবা আপনাদেৱ দোষে সেই
যত্নটি এমান ধাবাপ বৰিবা ফেলিবাছি—যে তাহাব সাহায্যে তাহার
সম্বন্ধে ভাল মন্দ বড় ঠিক নিৰ্ণয় কৰা দুঃসাধ্য হইবা পড়িবাছে ।

ছাত্র । সে যত্নটি কি ?

শিক্ষক । সে যত্নটি আমাদেৱ রসনেন্দ্ৰিয় । দেখ পণ্ডেৱ
বসাবন-শাস্ত্রও নাই এবং তাহাদেব মণ্ডে এমন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত
কেহ নাই যে খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে রাসায়নিক পৰীক্ষা কৰিবা তাহাদিগকে
বুঝাইবা দেখ যে, কোন্ খাদ্য দ্রব্য তাহাদেৱ পক্ষে ভাল আৰু কোনটিই
বা মন্দ অথচ তাহাবা আপনাদেৱ রসনেন্দ্ৰিয়েব সাহায্যে খাদ্য সম্বন্ধে
যেকপ ভালমন্দ বিচাৰ কৰিবা লব সে বিচাবে ত ভুল হয় না । কিন্তু মনুষ্য
আপন দুৰ্দ্ধৃতি-বশতঃ সেই যত্নটিব কল বিকল কৰিয়া ফেলিতেছে ।
অনন্ত প্রকৃতি মনুষ্যকে ইন্দ্ৰিয় সকল যে কাৰণে দিয়াছেন মনুষ্য
সে কাৰণে তাহার ব্যবহার কৰে না বলিবা ই মানুষ্য এত গোলে
পড়িতেছে ।

বাহ্যজাতীয় পদার্থের অস্থঃস্থলস্থ শক্তিব সৌন্দর্য্য বিচার করিয়া
কিরূপ পদার্থ কাহার উপযোগী ইহা স্থির করিবার জন্যই আমাদের
জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রস্তুত হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্য্যকর মনুষ্য আপাত
সৌন্দর্য্যে, উপরের চাকচিক্যে এত মুগ্ধ হইয়াছে যে তাহাৰা স্বভাব
জাত-বাহ্যজাতীয় পদার্থ কুৎসিত হইলেও তাহার উপর অন্য একটা
শুন্দর আবরণ দিয়াই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে । কুৎসিত
প্রমত্তগণ অলক্ষ্যেব সাহায্যে ঘুমে পাউডার মাখিব, গাম্বুয়ের মন
এবণ করিতে সমর্থ হইতেছে, যে সকল স্বভাবজাত পদার্থ স্বভাবতঃ
মনুষ্য রসনাব উপাদেয় নহে তাহাই নানাবিধ মসলা প্রভৃতির সহ-
যোগে সুন্দর সুখান্ন চইয়া মানুষকে ভুলাইয়া রাখিতেছে । মনুষ্য
রসনা এইরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্য-রূত আপাত-ভূগ্নিদায়ক সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আশ্বাদন লইতে আর ব্যস্ত নহে তাই এখন
কেমিষ্ট্রির সাহায্যে মানুষকে বিচার করিতে হব কোন আহার ভাল
আর কোন আহার মন্দ । সে দিন একখানা ইংপাজী কাগজে
দেখিতেছিলাম যে একজন ডাক্তার অস্থির অভ্যন্তরত বেমিৰ্যাল
এলিমেন্ট সকল পরীক্ষা করিয়া সাধাবণকে জানাইতেছেন যে অস্থিতে
যে সকল পদার্থ আছে দেখা বাইতেছে তাহাতে অস্তিত্বভোক্তনে মনুষ্য-
দেহ বিশেষ পুষ্টি হইতে পাবে । কাগজখানি পড়িয়া আমার বড় হাসি
পাইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভাবিয়াছিলাম হায় কতদিনে এই
রকম ডাক্তারের হাত হইতে আমবা পরিত্রাণ পাইব ।

কোন খাদ্য দ্রব্য ষাওয়া উচিত আর কোনটিই বা উচিত নহ
তাহা বিচার করিতে গেলে কি কবা উচিত বলি শুন । স্বভাবজ যে
সকল খাদ্যদ্রব্য অতি সামান্য রকমে রন্ধন করিয়া রসনা তৃপ্তিকর হয়
তাহাই প্রশস্ত আহার জানিও । আর পঞ্চাশ বকম মসলা দিয়া নানা

রূপ কারখানা করিয়া হালেব পাকপ্রণালী নামক অপদার্থ সেই বই খানা হাতে করিয়া দাঁড়িপাল্লা ধবিয়া মুখরোচক আহাঃ প্রস্তুত করিলে তোমার বসনা তোমার খাচ্ছে গুণা গুণ বলিয়া দিবে না ।

এখন দেখ মাংসভোজন কখন ভাল । ব্যায়ের নিকট কাঁচা চাল রাখিয়া দাও ও মাংস রাখিয়া দাও ব্যায় তাহার রসনা ও ভ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহায্যে তাহার উপযুক্ত যে আহাব তাহাই বাঁজিয়া লইবে । কাঁচা মাংসে তাহার দুর্গন্ধ ঠেকে না সেই দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্ত সে মাংসে পেরোজের বস ঢালে না, ক্ষুধার চোটে অতি সুস্বাদু জানে সে সেই কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে । একজন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে কাঁচা চাল দাও আব কাঁচা মাংস দাও , সে কোনটা ধাষ দেখ । যদি সেই কাঁচা মাংস খাইতে তাহার অধিক প্রবৃত্তি দেখ তবেই জানিও যে তাহার পক্ষে মাংস চাউল অপেক্ষা উপযোগী । কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির যদি কাঁচা মাংসে বড়ই ঘৃণা হয় তবে নিশ্চয় জানিও যে, প্রকৃতি তখন এই উপদেশ দিতেছেন যে দেখ ক্ষুধার্ত, এই মাংসে যে শক্তি এখন বহিয়াছে সেই শক্তিকে তোমার শরীরাত্ম্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তোমার উপযোগী কার্য্যকারী-শক্তিতে পরিণত করা তোমার পক্ষে দুর্লভ ও ক্লেশদায়ক হইবে, কেন না ঐ উত্তরবিধ শক্তিতে সাম-গ্রস্ত নাই, সামগ্রস্ত থাকিলে তুমি উহাকে ঘৃণা করিতে না ।

আসল কথাটি এই যে যদি কাঁচা মাংস খাইতে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে অথবা শুদ্ধ সিদ্ধ করিয়া কোন মসলা না দিয়া মাংস খাইতে কাহারও ভাল লাগে তবে মাংস তাহার পক্ষে উপযোগী ।—

ছাত্র । শুদ্ধ সিদ্ধ মাংস মসলা না দিয়া আমি ত সাতজন্মে ও খাইতে পারি না ।

শিক্ষক । মাংস তবে তোমার খাওয়াই উচিত নহে । বিশেষতঃ মানসিক শক্তির জিয়ারাই বখন তোমাকে বেশী করিতে হব তখন তোমাকে আমি মাংস খাইতে নিষেধ করি ।

মাংস ভোজনের একটি মহৎ দোষ আছে সেইটি তোমায় বলি শুন । বেশী মিষ্ট খাইলে বেনন জল খাইতে ইচ্ছা করে বাহারা মাংস খাব তাহাদের সেইরূপ মস্ত সেবনে ইচ্ছা হয় । এটকল্প মাংস আর মদ্য এই দুইটি এক সঙ্গে বেড়ায় ইহাই দেখা যায় । মনুষ্যকে বেরূপ কর্ম করিতে হব মাংস ভোজনে তাহার অনুষঙ্গিক হস্ত শক্তির প্রকাশ চুক্র হওয়াতেই মদ্যেব সাহায্য লওয়া মনুষ্যের প্রবোজনীয় হইবা পড়ে । অতীতকালের মনুষ্যজাতি এবং বর্তমানের মনুষ্যজাতির মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে যে যেখানে মাংস, মদ্যও সেইখানে আছে । এমন অনেকে থাকিতে পাবেন যে বাহারা মাংসানী অথচ মদ্যপ নহেন কিন্তু মদ্য আব মাংসের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার এতদূর দৃঢ় প্রত্যাহ যে আমার বোধ হব বাহারা মাংসানী অথচ নিজেরা মদ্যপ নহেন তাহাদের সম্মান সম্বন্ধিত্ব অস্তরে মদ্যপানেব স্পৃহা প্রকাশ হইবে ।

আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি প্রায় দশ বৎসর কাল মদ্য ও মাংস সেবনে কাটাইয়াছিলেন । শরীর নানা প্রকার রোগে ক্লম হওয়ায় তিনি মদ্যসেবন ত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন । কিন্তু মাংস ভোজন ত্যাগ করিলেন না । ইহাতে এই ফল ফলিল যে তিনি মদ্যসেবনের স্পৃহা কোন ক্রমে ত্যাগ করিতে পারিলেন না তাহার প্রতিজ্ঞা বন্ধা করা হইল না । পরে এক দিন মস্ত

ও মাংস উভয়ই পবিত্যাগ করিবাব প্রতিজ্ঞা করিলেন । মাংস ভোজন না করায় মন্থসেবনেব স্পৃহা ক্রমে কমিয়া আসিল । এইভাবে তিনি প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হইলেন । আমি জানি মাংস ভোজন বন্ধ করিয়া অবধি তিনি এক ফোঁটা ও মন্থসেবন কবেন নাষ্ট । আজ প্রায় তিন বৎসর হইল তিনি বাক্স বাক্সসীকে জব্ব করিয়াছেন ।

মন্থ ও মাংস উভয়েই কামনার বেগ বৃদ্ধি কবে । মন্থ ও মাংস মন্থকে কামনার তীব্র বেগশালী শ্রোতে নিক্ষেপ করিয়া কখন কোন পথে লইয়া যায় তাহার স্থিতি নাই । মন্থ ও মাংসেব বশে মন্থ নিজের আয়তাবধীন থাকিতে পারে না । কামরূপী শক্তির অধীন হইয়া পড়ে । স্মৃতবাং বাঁহারা আপনাবাব হইতে ভয় কবেন তাঁহার। ঐ চুই শব্দেব নিকট হইতে দূরে থাকিবেন ।

ছাত্র । কিরূপ আহাব কর্তব্য তত্বাদি বিষয় বিচার করা বৈষ্ণব-শাস্ত্রেরই অঙ্গ, ধর্মের সহিত মন্থ সেবন ও মাংস ভোজনের সম্বন্ধ কি ?

শিক্ষক । নিষ্কাম ধর্ম কাহাকে বলে তুমি তাহা জান কি ? যেক্ষণ কর্ত্তে স্নানশক্তির বিকাশ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় কেবল সেইরূপ কর্ত্তাই নিষ্কাম-ধর্ম অমুমোদিত । বসনা তৃপ্তিব জন্ম যিনি আহার করেন তিনি নিষ্কাম-ধর্মের অধিকারী নহেন । স্মৃতবাং কিরূপ আহারে কিরূপ শক্তির প্রাপ্তি জন্মে তাহা বিচার করা নিষ্কাম-ধর্মের অঙ্গ । শ্রীকৃষ্ণ ভগবদঙ্গীতায় এইজন্য অধিকারী ভেদে আহাবের উপযোগীতা সম্বন্ধে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন মাংস মন্থ মন্থেব অন্তরে বজঃগুণ উত্তেজক । সেইজন্য সার্বিক কর্ত্তে মন্থ ও মাংস নির্বিচ্ছ ।

মাংস ভোজন-সম্বন্ধে বাঁহা বলিলাম তার সার বলি গুন। মস্ত মাংস উভয়েই মনুষ্যের কামনার বেগ বৃদ্ধি করে। মাংসেব সহিত মস্তের বড় নিকট সম্বন্ধ। সেইজন্য মাংস ভোজনে মস্ত সেবনের আকাজ্জা আসিয়া পড়ে। বাঁহা কাম জব করিতে চান তাঁহা এই উভয়কেই শত্রু জ্ঞান করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নিরামিষ ভোজন ।

(প্রতিবাদের উত্তর) ।

আমি ভাবতীতে নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম, সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ ভারতীতে বাহির হইয়াছে । মাংস ভোজন সম্বন্ধে আমার বাহা মত, তাহা বোধ হয় পরিষ্কার রূপে আমার পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে বুকান হয় নাই—কেন না দেখিতেছি প্রতিবাদ লেখক আমার লেখা হইতে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই । পাঠক-গণ আমায় মাপ করিবেন ।

মাংস ভোজন কর। যে. সকল মানুষের পক্ষে অন্ত্য, আমার মত একপ নহে । কিন্তু প্রতিবাদ লেখক আমার লেখা হইতে আমার মত সম্বন্ধে তাহাই বুঝিয়াছেন, মানুষ মাত্রেই পক্ষে যে মাংস ভোজন কন। দ্ব্য তাহা বোধ হয় পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে কোথাও বলি নাই ।

আমার প্রবন্ধে এইরূপ কথা ছিল যে “যিনি মাংস ভোজন করিবেন তাঁহার ভিতরে কিরূপ শক্তি আছে এবং আমিষ ভোজন সেই শক্তির উপযোগী কি না তাহাই দেখা কর্তব্য-গককে মাংস খাওয়াইলে সে কখন বলিষ্ঠ হইবে না । কেবল রসনা তৃপ্তি করাই আহাৰের উদ্দেশ্য নহে, আহাৰের বাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য সেই জন্ত যাহার মাংস ভোজন প্রযোজন, তাঁহাব পক্ষে মাংস ভোজন বিধি, আর

যাঁহার তাহার প্রয়োজন নাই—তঁাহার পক্ষে অবিধি।” প্রতিবাদ লেখক ঐটুকু উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে “এতদ্বাৰা বুঝা গেল যে লেখকের মতে গরুর পক্ষে যেমন মাংস ভোজনের আবশ্যিকতা নাই, মানুষ পক্ষেও সেইকপ। তাহাব পৰ অসত্য্যাবস্থায় মানুষ কাঁচা মাংস খাইত, এই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ মাত্রেই পক্ষে যে মাংস ভক্ষণ অবিধি, একথা তিনি উদ্ধৃত বাক্য হইতে কেমন করিয়া বুঝিলেন তাহা স্মৃতিতে পাবি না।

আমাব পূৰ্ণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে যাঁহারা কামনা জয় করিতে চান, তঁাহারা যেন মত্ত ও মাংসকে শত্রু জ্ঞান করেন, কল্পনা শক্তি ধীশক্তি ইত্যাদি স্পষ্ট শক্তির ব্যয় যাঁহাদের বেগী করিতে হয়, তঁাহাদের পক্ষে মাংস ভোজন শ্রেয় নহে। অসত্য্যাবস্থায় মানুষের মাংস ভোজন করা উচিত নহে, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, পাঁচ ইয়ারে বাঁসরা মত্তসেবন নৃত্যগীতাদি যাঁহারা করিতে চান, তঁাহাদিগের পক্ষে মাংস ভোজন অসুচিত একথা আমি বলি না।

প্রতিবাদ লেখক একস্থলে উপহাসস্বরে বলিয়াছেন যে “এস্থলে গুরুত্বক্ৰম রসিকতা কবিয়াছেন মন্দ নয়।” প্রতিবাদ লেখকের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবে সাধারণকে জানান কর্তব্য যে শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন অবলম্বনে আমি মাঝে মাঝে বাহা লিখি তাহাতে এমন যেন কেহ মনে না করেন যে আমি নিজেই সাধারণের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত মনে করি। আমার লেখায় আমি নিজেই শিক্ষক, আবার নিজেই ছাত্র। পাঠকগণকে আমার জানান কর্তব্য যে আমি বখন বাহা লিখি, তাহা লিখিবার জন্ত; এবং সাধারণের কাছে যে সেই লেখা প্রকাশ

কৰি, তাহাও শিখিবাব জন্ম। প্ৰতিবাদ লেখক মহাশয় আমাকে ছাত্ৰ বলিয়া জানিবেন।

প্ৰতিবাদ লেখক মহাশয় আমাব প্ৰবন্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিছাছেন এবং কথাগুলি বাস্তবিক সত্য কথা। আমি উক্ত প্ৰবন্ধ লিখিতে যে পথে পিৰ্বাছি তাহা না আধ্যাত্মিক, না ভৌতিক, না নৈতিক, না বৈজ্ঞানিক। কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকাৰ কৰি, কেন না আমি আধ্যাত্মিক বহুস্তেব কিছু জানি না, ভৌতিক বহুস্তেব কিছুই জানি না, নৈতিক বহুস্তেবও কিছুই জানি না, বৈজ্ঞানিক বহুস্তেব ত কথাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্ৰতিবাদ লেখক বেঠিক বৈজ্ঞানিক পথ অবলম্বনে তাহাব প্ৰতিবাদ লিখিছাছেন, তাহাও বলি না। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে আমি বিজ্ঞানের একটি ক্লান্ততম অংশ জ্ঞান কৰি। এই জগত্বে বাস্তব বে সমস্ত গুঢ়, গুঢ়তৰ, গুঢ়তম তৰ আছে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান সাহায্যে তাহাব বৰ্ণনাজেব আভাস পাওব, যাব এই পৰ্য্যন্ত। যিনি পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানেব চৰম অৱস্থা জ্ঞান কৰেন, তাহাক আমি দ্বাৰ জ্ঞান কৰি। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান আলোচন, কৰিবা আমিও এককালে উহাৰ বড় গৌড়া ছিলাম, কিন্তু সোভাগ্যক্ৰমে আমাব সে গৌড়ামী এখন আব নাট। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চৰম অৱস্থায় উঠিতে নে এখনও ঢেব বিলম্ব আছে, ইহা প্ৰবান প্ৰধান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনাবাট স্বীকাৰ কৰেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ডাক্তাৰি শাস্ত্ৰ আবার অত্যন্ত অপৰিপক্ব সূতবাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বা পাশ্চাত্য ডাক্তাৰি শাস্ত্ৰে বাহা লেখা আছে তাহাই অকাটা প্ৰমাণ, ইহা আমি স্বীকাৰ কৰিতে প্ৰস্তুত নহি।

আরও এক কথা আছে, লেখক যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন কৰিয়া মানসভাজন মন্ত্ৰেব পাশ্চ প্ৰযোজনীয় স্থিৰ কৰিছাছেন,

মাংস ভোজন সম্বন্ধে সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেই মতভেদ আছে । বিলাতের অনেকে আজকাল মাংস ভোজনের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । যাহারা মদ্য-সেবন-জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হন তাঁহাদিগকে মদ ছাড়াইবাব জন্য আমেবিকার বড় বড় ডাক্তারেরা প্রথমে মাংস ছাড়িবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন । পরাতে যাহারা মদ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মাংস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।

আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে অস্থিতে ১৭ খণ্ডে খনিজ চূর্ণ থাকিলেই কি অস্থি পুষ্টিসাধন হইতে পারে । উক্তর উক্তবে প্রতিবাদ লেখক বলিয়াছেন যে “এস্থলে ওকঠাকুর বসিকত; কবিবাছেন মন্দ নয়, কিন্তু তাহাব অনুমান করা উচিত ছিল যে চঃ অস্থিবোগে একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ, অস্থি পুষ্টিসাধনব জন্য চূর্ণণ তৎ ঔষধ ইংরাজীতে নাই” ইত্যাদি ।

যেদ্রুপ বোগে ডাক্তারেরা চূর্ণ ব্যবস্থা করেন, সেদ্রুপ বোগে সেই ব্যবস্থা দ্বারা শবীবের যে অনেক সময় উপকার হয়, উক্তা আমাের নিজেব দ্বারা পরীক্ষিত স্মৃতবাং প্রতিবাদ লেখকের কথ, আমি সম্পূর্ণ মাগ্ন কবিত্তে বাধ্য, কিন্তু একটি কথা বলিত্তে চাই যে ঔষধের সঠিত্ত যে চূর্ণ খাওযান হয় সেই চূর্ণেব কেমিক্যাল ইনগ্রিডিযাণ্ট সঙ্গল হাঃ জমা হইবা যে হাঃেব পুষ্টিসাধন হয় একথা আমি স্বীকার কবি না । না স্বীকার করিবাব একটি কারণ আছে—হাঃেব যেদ্রুপ বোগে ডাক্তারেরা চূর্ণেব জল কিম্বা চূর্ণঘটিত অল্প কোন ঔষধ ব্যবস্থা করেন সেই সেই অনুৰূপে হোমিওপ্যাথী চূর্ণঘটিত ঔষধ (Calcarea Carbonica, Calcium Phosphite ইত্যাদি) সেবন করাইয়া বেশী উপকার হইতে দেখিয়াছি । হোমিওপ্যাথী চূর্ণঘটিত ঔষধেব এক কৌট্য চূর্ণেব

কেমিক্যাল এলিমেন্টের কথাব কণামাত্র থাকে, সূত্রাং চূণ ঘটিত ঔষধ সেবন দ্বারা সেই চূণের কেমিক্যাল এলিমেন্ট হাডে গিয়া জমা হয় বলিয়া যে হাডের পুষ্টি সাধন হয় সে কাজের কথা নয়। আনি বিজ্ঞানের বড় পক্ষপাতী, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ পরিষ ‘মাংসের বাসাবনিক বিশেষণ ববত’ শরীর পোষণ করে উহার অনিষ্ট বর্জিত, প্রতিপাদনের চেষ্টা করি নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড় এলিমেন্ট ছাড়া অন্য অন্য পদার্থ খাদ্য দ্রব্যের ভিত্তি তৎকাল কিং সেই পদার্থ যে কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার বড় বর্জিত, না।

প্রতিবাদ লেখক ভাবতী ১৫২ পৃষ্ঠার একস্থলে বলিয়াছেন যে ‘এমনও প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত ডায়া সকলের মধ্যে কোন কোনাটতে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে যে সেই সকল ডায়া আশ্বিন দিবস একাদিক্রমে ব্যবহার করিলে নান, প্রকার রুশি (১২৫) পীড়ান উৎপত্তি হয়।’ কিন্তু এই বিষাক্ত দ্রব্য যে কি তাহা কোন চর্য প্রতিবাদ লেখক জানেন না, কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ ডায়া হইতে কেহ বাহির করিয়া আনেন নাই এবং কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা এই ডালের ভিত্তি যে বিষাক্ত দ্রব্য আছে, সেই দ্রব্য কি জাতীয় তাহা বধন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্থির করিতে পারিবে তখন মাংসের ভিত্তিও কি বিষাক্ত পদার্থ আছে তাহাও স্থিবিদ্ধ হইবে।

কেবল মূল কেমিক্যাল এলিমেন্টের বিশ্লেষণ দ্বাবাই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে তাহা ঠিক করা যায় না। চিনি একটি খাদ্য দ্রব্য, উহার কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা কবলা

আর জল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে কয়লা আর জল বই কিছুই নাই কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞান মতে চিনিতে স্থল কয়লা ও জল ছাড়া এমন পদার্থ আছে যাহা পাশ্চাত্য বাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু বিজ্ঞানের কথায় চিনিতে স্থল কয়লা এবং জল ভিন্ন এমন একটি পদার্থ আছে যাহা রস তত্ত্বাত্ত্বের এক প্রকার পরিণাম এবং যাহাকে চিনির “স্বরূপ” বলা যাইতে পারে। এই পদার্থটি কি তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলে স্বাদ্য সম্বন্ধে চিনির উপযোগীতা অনুপযোগীতা “বস্তু বৈজ্ঞানিক” নির্ণয় কখনও ঠিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে কর পম একটি খাতি দ্রব্য। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল যে উহাতে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ইত্যাদি পদার্থ আছে। একটি পূর্ণ বস্তু ব্যক্তিগত দৈনিক খাদ্যেব যথ্য কত অক্সিজেন, কত হাইড্রোজেন ইত্যাদি পাকে তাহা নির্ণয় করিয়া খাতি সম্বন্ধে পমের গুণাগুণ বিচার করা যায় না। প্রতিবাদ লেখক “প্রটিড” ইত্যাদি পদার্থে কি কি কেমিক্যাল এলিমেন্ট আছে তাহা বলিয়া পবে বলিয়াছেন যে ‘নিস্ত তাই বলিয়া অমিশ্র বা আদত এই দ্রব্যগুলি খাইলে কি আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে’ বিস্তু কেন হইতে পারে না প্রতিবাদ লেখক সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। প্রশস্ত বিজ্ঞানের পণ অবলম্বনে তিনি যখন প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন সেটা বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য ছিল।

অমিশ্র বা আদত খাইলে কেন যে শরীর রক্ষা হইতে পারে না; তাহাব একটি বিজ্ঞান সম্বন্ধে উত্তর আমি দিতে চাই এবং বোধ হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব অল্প উত্তর থাকিতে পারে না। বাসায়-

য়নিক আকর্ষণে এলিমেন্ট সকল যখন মিশ্রিত হইয়া যে নূতন পদার্থ জন্মে, তাহাব গুণ সেই সেই তিন তিন এলিমেন্টের গুণ হইতে সম্পূর্ণ রূপভিন্ন হইয়া পড়ে। কাকন অর্থাৎ কখনা আর অক্সিজেন অর্থাৎ বায়ুস্থিত পদার্থ বাহা প্রাতি নিশ্বাসে শরীরের, মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই দুই পদার্থ মিশ্রিয়া একটি বিষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রটিডের গুণে প্রাণ দাবণ সম্ভব বলিয়া কার্বন হাইড্রোজেন ইত্যাদি খাদ্যে প্রাণ দাবণ হইবে একপ অসুখান কবা অন্যায্য।

এইভাবে একটি কং। বালতে চাই—মাংসে ১৮ ভাগ মাংস-বিষয়ী পদার্থ আছে, ১৪ ভাগ উচ্চজনক পদার্থ আছে, ১ ভাগ খনিজ পদার্থ এবং ৬০ ভাগ জলীয় ও মেদসিক পদার্থ আছে, কিন্তু এত পদার্থ গুলি যে মাংসে মিশ্রিয়া আছে তাহা ভাল ও চালেব বিচুড়িব ন্যায় মিশ্রণ কি কোন বাসাবানক সম্বন্ধে মিশ্রিত। যদি বিচুড়িব ন্যায় মিশ্রণ হয়, তাব উদ্ভিদ জগৎ হইতে পূরোক্ত পদার্থ সকল পূরোক্ত পরিমাণে লইবা বিচুড়ি বানাইলেই মাংস তৈয়ারি হইতে পারিত, মাংস খাইবার জন্ত আর প্রাণী হত্যা করিতে হইত না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পূরোক্ত যে পদার্থ মাংস আছে, তাহার পবম্পব আধাব এক প্রকার বাসাবানক আকর্ষণে বদ্ধ। এবং সেই জন্তই মূল জড পদার্থের গুণ জানিলেই মিশ্রণাৎপন্ন পদার্থের গুণ জানা যায় না। প্রটিড অ্যামেলঘেডের গুণ জানিলেই মাংসের গুণ জানা সম্ভব নহে। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যের গুণ গুণ নির্ণয় জন্ত বাঁহাবা কেবল কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ কল্পে উহার ইষ্টানিষ্টকারিতার প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, আমার বিবেচনায় তাহারা ভুল পথে চলিতেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়ের সহিত জড়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু খাচ্চ ত্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিতে গেলে ডালের সঙ্গে চালের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার পূর্বে ডালের সঙ্গে চেতন পদার্থ আমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহাই দেখিতে হইবে। হিন্দু বিজ্ঞান যে পথ অবলম্বন করিয়া ত্রব্য, তত্ত্ব নির্ণয় করিতেন, সেই পথ অবলম্বনে খাচ্চ ত্রব্যের গুণাগুণ ঠিক বুঝিতে পারা যায়। কোন পদার্থের সহিত চেতন পদার্থ-আমার কি সম্বন্ধ তাহাই আলোচনা দ্বারা ঋষিগণ ত্রব্যস্থ পদার্থ সকলকে তিন তিনরূপে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

একটি চুড়ক আছে আব একখানি লোহা আছে। কেমিক্যাল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম যে দুইই এক পদার্থ, কিন্তু বাস্তবিক চুড়কও যা আছে লোহাখানিতেও কি তাই আছে? একজন নব্য বিজ্ঞানীদ হগত বলিবেন যে matter সম্বন্ধে দুইই এক, তবে চুড়ক খানিতে এমন একটি শক্তি আছে যাহা লোহা খানিতে নাই। কিন্তু যাহা ঋষিদের বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বনে ত্রব্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতে শিখিয়াছেন, তাহা জানেন যে অযকাস্তমণিতে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা লোহা খানিতে নাই এই পদার্থ সাধারণের উদ্ভ্রাণ গ্রাহ্য নহে কিন্তু অমুভূতি শক্তির স্বল্প বিকাশে এই পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। প্রতিবাদ লেখকের কাছে আমার একটি নিবেদন এই যে আমার এই সকল কথা একে-বারে বিজ্ঞান বহির্ভূত কিনা সে বিষয়ে মত প্রকাশের পূর্বে রিসনব্যাঙ্ক রিসার্চস্ এবং বিলাতের সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির প্রেসিডেন্সগুলি যেন পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাট-বন যে অমুভূতি শক্তির স্বল্প বিকাশের সাহায্যে চুড়ক হইতে

দীপশিখার দ্বারা এক প্রকার আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায়। যেমন দীপশিখার ঈঁদিলে দীপশিখা চঞ্চল হয়, ঈঁদিলে এই শিখাও সেইরূপ চঞ্চল হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চুষ্মকে এমন এক প্রকার পদার্থ আছে যাহা লোহাষ নাই। বিসনব্যাক এই পদার্থকে ওড (Od) নাম দিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই পদার্থকে তেজ বলা যাইতে পারে।

যোগী পতঞ্জলি বলেন যে পঞ্চভূতের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, অক্ষর ও অর্ষতৎ এই পাঁচ অবস্থা আছে, এই পাঁচ অবস্থা বিধে 'চতুঃ সংঘম ক্রান্তে নিখিলে ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য সকল অষ্টবে প্রকাশ পায়। ভৌতিক জগৎ সকলের গুণাগুণ তখনই ঠিক বুঝিতে পারা যায়।

পোপে অল্প বয়সে মুন্ডী চালভাড়া খাওয়া ভাল কি পোপের ভাত খাওয়া ভাল এইটি নির্দ্ধাঙ্গ ব্যবধান করা প্রতিবাদ লেখক কোন ণ্ড অবস্থান করেন তাহা জানিতে বড় টক্কর হইয়াছে। তিনি যদি বিজ্ঞানে প্রগতি পথ বেগে উক্ত পদার্থ দ্বয়ের বাসায়নিক বিশ্লেষণ করতঃ শরীর পোষণ করে উদ্ভাটন ষ্টানিষ্ট-কারিতা বুঝিতে যান, তবে বোধ হয় মুন্ডীতে এবং পোপের ভাতের মধ্যে কোন প্রভেদ খুঁজিয়া পাইবেন না। প্রগতি বিজ্ঞান পথ অবলম্বনে তিনি যাহা স্থির করিবেন তাহাত মিথ্যা হইবার নহে সুতরাং যদি কেহ বলে যে পেটের অন্তর্গত মুন্ডী চালভাড়া খাইতে নাই, তাহা হইলে প্রতিবাদ লেখক যে তাঁহার কথায় হাস্ত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ লিখিতে গিয়া প্রতিবাদ লেখক মধ্যে মধ্যে এইরূপ হাসি হাসি-রাছেন ইহা পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। পেটের অন্তর্গত

সময় মুড়ী চালভাজা খাইতে নাই—এ কথাটি যদি সত্য হয় তবে এ সত্য কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? কেমিক্যাল বিশ্লেষণ দ্বারা ঠিক করা যায় না। নিজের জঠরাত্ত্যন্তরস্থ শক্তির সহিত মুড়ীর সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা মুড়ী তোজন কোন সময়ে ভাল এবং কোন সময়ে মন্দ তাহা ঠিক কবিত্তে হয়। কিম্বা পূর্বাগামী লোকেরা মুড়ী খাইয়া মুড়ীর গুণাগুণ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহা (সেই Experience) অবলম্বনে উহার উপযোগীতা অমুপযোগীতা স্থির করিতে হয়। প্রতিবাদ লেখক একস্থলে বলিয়াছেন “কেন? যদি মাংসের কেমিক্যাল এলিমেন্ট কি দেখিবার প্রয়োজন না থাকিল তাহা হইলে তিনি আমিত্ত তৎকণের উপযোগীতা অমুপযোগীতা কি প্রকারে স্থির করিলেন?” প্রতিবাদ লেখক আমাব অনেক কথাই হাসিয়াছেন কিন্তু আমি তাঁহার হাসি দেখিয়া ইহা নিবিষাছি যে হাসি আসিলেও হাসি সম্বরণ করা ভাল, সেটী জন্ত তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যটি পড়িয়া যে একটু হাসি আসিয়াছিল তাহা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রতিবাদ লেখকের মতে কেমিক্যাল বিশ্লেষণ ভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের উপযোগীতা অমুপযোগীতা কখনই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এই চই শত বৎসরের পূর্বে যখন কেমিক্যাল বিশ্লেষণ পদ্ধতি বাহির হয় নাই তখন লোকে খাদ্য সম্বন্ধে উপযোগীতা অমুপযোগীতা কিছুই বুঝিতে পারিত না। প্রতিবাদ লেখকের কথার অর্থটি এইরূপ বোধ হইতেছে। খাদ্য দ্রব্যে কি কি এলিমেন্ট আছে তাহা ঠিক করিয়া কি গরু ছাগলে তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য করিঁহা নয়? গরু ছাগলে আপনাদের তীক্ষ্ণ রসনা ও স্নায়ুশ্রিয়ের সাহায্যে যে পদ্ধতি অবলম্বনে উপযোগী অমুপযোগী খাদ্য বাছিয়া

লয়, তাহাই যে ঠিক পদ্ধতি পাঠকগণ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন ।

৩৪৮ পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ লেখক একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সেই সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব । আমি লিখিয়াছিলাম “নিরামিষ ভোজন দ্বারা মানসিক সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ যত শীঘ্র হয়, আমিষ (মাংস) ভোজন দ্বারা তত শীঘ্র তৎক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া না । যেমন চুন্ধ দ্বারা যত সহজ সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ হয় মাংসে তাহার বিপরীত ।” প্রতিবাদ লেখক ইহার উত্তরে বলিতেছেন “আচ্ছা স্বীকার করিলাম তাহাই ঠিক । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এট যে, সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপাদনের মূল কি ? কোথা হইতে সেই সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ? মানুষের মূল শক্তি না হইলে সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না । মূল হইতেই সূক্ষ্ম আইসে, সূক্ষ্ম শক্তির মূল চিন্তা সেই চিন্তার আধার মস্তিষ্ক (Brain) চিন্তা করিতে হইলে মস্তিষ্কের সরলতা আবশ্যক । সেই সরলতার উপায় সুস্থ শরীর । শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইলে মানসিক সূক্ষ্ম চিন্তার ক্ষমতা থাকে না ইত্যাদি । মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল এবং তাহাই রাখিবার নিমিত্ত পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক ।” লেখক পরে দেখাইবেন যে পুষ্টিকর খাদ্যেব’ মধ্যে মাংসই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

লেখক যখন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রতিবাদ লিখিতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার পূর্বকথিত কথাগুলি অর্থাৎ “মস্তিষ্কের শক্তি অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় শারীরিক স্বাস্থ্য

ও শারীরিক বল” এই সমস্ত কথা সন্দেহে তাঁহার কিছু যুক্তি দেখান উচিত ছিল।

লেখকের অভিপ্রায় যদি এরূপ হয় যে মনের জোব বা চিন্তা করিবার শক্তি গায়ের জোয়ের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে তিনি বড় ভুলিয়াছেন। এমন লোক চের আছে বাঁহাদের শরীর বেশ সবল ও সুস্থ কিন্তু মনের ক্ষমতা কিছুমান্ন না—অর্থাৎ মনের স্বভাব বড় ভীক, এমন লোকও চের দেখা যায় বাঁহাদের শরীরে বেশী জোব নাই—কিন্তু চিন্তাশীলতা ক্ষমতায় অধীতীয়, সুতরাং শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক ক্ষমতা থাকিবে, তাহাব ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না। বরং অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায় যে বাঁহাবা চিন্তাশীলতায় অধীতীয় তাঁহারা প্রায়ই দুর্বল। (দুর্বল কথায় রুধ অর্থ কেহ না বুঝেন) আমি অনেককে দেখি—রাছি বাঁহারা শারীরিক বল বৃদ্ধি করিতে গিয়া নানাবিধ জিম-জাটিক আদি ব্যাবাস করিষা থাকেন ও খুব মাংসাদি দেহের পুষ্টিকর পদার্থ সেবনের দেহের পুষ্টিসাধনে যত্ববান থাকেন, তাঁহাদের বুদ্ধি প্রায়ই পূর্বাংগে মোটা হইয়া পড়ে। এই সব কারণে প্রতিবাদ লেখকের কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

মাংসভোজনে যে শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়, ইহা আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে এক রকম বলিয়াছি এবং শারীরিক বল থাকিলেই মানসিক বল জন্মিবে ইহা যদি সত্য হয় তবে মানসিক তেজ লাভের জন্যও যে মাংস ভোজন কর্তব্য, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শারীরিক বল থাকিলেই যে মানসিক বল থাকিবে, শারীরিক বল যত বাড়িবে, মানসিক বল ও যে সেই-রূপ বাড়িবে—এ কথাটি আমি মানিতে প্রস্তুত নহি।

তবে শরীর রুগ হইলে মনের ক্ষমতা কমিয়া যায়, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে মাংস ভোজন না করুক শরীর রুগ হয়, এরূপ প্রমাণ কি কোন বিলাতী শাস্ত্রে আছে ?

আমি পূর্ক প্রবন্ধে মাংস ভোজন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আর একটু পরিষ্কার কবিয়া বলিব। মাংস ভোজনে স্থূল কর্ণেব অল্পকূল শক্তির বেগ যেতপ বেশী হয়, নিবামিষ ভোজনে সেতপ হয় না । য়াহারা স্থূলজাতীয় শক্তির বেগ কমাটেতে ইচ্ছুক, য়াহারা তাঁহাদেব অভ্যন্তরিক শক্তি ক্রমাগত স্তম্ভ হইতে স্তম্ভতম ভাবাপন্ন কবিয়া স্তম্ভাঙ্কুভূতির বিকাশে যত্ববান হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে মাংস ভোজন কবা প্রের নহে । মনুষ্য মাংসেই বে মাংস ভোজন করা কর্তব্য নহে একথা আমি পূর্ক প্রবন্ধে বলি নাই । আমি পূর্ক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত কোন যুক্তি দিতে পারি নাই—কেন না পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এখন যে অবস্থা, তাহাতে এসকল বিষয়ক সত্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । আৰ্য্য বিজ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বন য়ারা ভোজ্য দ্রব্যের উপযোগীতা অল্পপযোগীতা কিরূপে স্থির করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাই, কিন্তু তাহা সাধারণের কাছে কিরূপ লাগিবে, তাহা বলিতে পারি না ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নাম Experimental Science—আমি বে আৰ্য্য বিজ্ঞানের কথা বলিব, তাহাও Experimental Science পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই আৰ্য্যবিজ্ঞান পদ্ধতির প্রভেদ এই বে পাশ্চাত্যগণ নানাবিধ জড় ইনষ্ট্রুমেন্ট নির্মাণ করিয়া সেই সেই ইনষ্ট্রুমেন্টের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া থাকেন ।

কিছু ঋষিগণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যত্ন চেষ্টান মনুষ্য। বিজ্ঞানের যত্ন সকল যত্ন সূক্ষ্ম (Sensitive) হইবে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তত সূক্ষ্ম হইবে, পাশ্চাত্যগণ জড় পদার্থ নির্মিত যত্ন সকলকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম করিতে ব্যস্ত আছেন, ঋষিগণ অমুভূতি শক্তির সম্পাদন দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম তত্ব সকল আলোচনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনার জন্য কোন পথ অবলম্বনে প্রকৃত সত্য জানা যায়, তাহা পাঠকগণ আপনারা বিচার করিয়া লইবেন। সেকালের বৈদ্যরা অমুভূতির শক্তির সাহায্যে বোগীর নাড়ী টীপিয়া রোগের অবস্থা সম্যক নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু হালের বিজ্ঞানে নাড়ী পরীক্ষার জন্য Sphygmograph যত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি যে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে অনেকে মনে করেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বাহা নাই, তাহা বুদ্ধি আর সত্যই নহে। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসটি বড়ই ভ্রান্তি মূলক।

আর্য্য বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া মাংস ভোজন ভাল কি মন্দ ইহা কিরূপে বিচার করিতে হয়, তাহা বলিতে চাই। মানুষ যে জাতীয় কর্ম করবে, সেই কর্ম অনুযায়ী তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদ, দীর্ঘতা বা সূক্ষ্মতার মধ্যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ কথাটি ইংরাজী কথায় rhythm of respiration বলা যাইতে পারে। যখন খুব দৌড়ানো করা যায়, তখন শ্বাস যে ভাবে বহিতে থাকে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে শ্বাস সে ভাবে পড়ে না। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনার সময় শ্বাস যেরূপ স্থূল ভাবে বহিতে থাকে, প্রগাঢ় চিন্তার সময় শ্বাস সে ভাবে বহে না, চিন্তাকালে শ্বাসের গতি বড় সূক্ষ্ম হয়। ভিন্ন ভিন্ন রূপ কুর্প করিবার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের তাল এবং সুর ভিন্ন

রূপ ধারণ করে। আহারের সহিত আবার এই তাল এবং সূরের সম্বন্ধ আছে। লঘু আহাব কর, আর গুরু আহার কর, এই উভয় অবস্থার স্বাসের গতির যে বৈলক্ষণ্য ঘটে, ইহা অনেকে জানেন, আবার ভোজ্য পদার্থের বিভিন্নতা জন্য এই স্বাস প্রস্থাসের সূর ও তালের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবনে স্বাস প্রস্থাসের যে পবিত্তন হয় তাহাও অনেকে জানেন।

যে রূপ কণ্ঠে স্বাস প্রস্থাসের গতি ঘেঁরপ তালে এবং ঘেঁরপে আহাবের সহিত উহাদেব একতানতা আছে, ইহাই লক্ষ্য কবিষা কাহার পক্ষে কি আহার উপযোগী এবং কোন আহাব অল্প-যোগী, তাহাই স্থির করা যায়। মাংস ভোজন জন্য স্বাস ঘেঁরপ ধরতাবে বহিতে থাকে, তাংগ সহিত চিন্তা কণ্ঠের স্বাসের সূরের সহিত একতানতা নাই।

স্বাস প্রস্থাসের গতিবিচ্ছেদ আলোচনা করিয়া আমি ইহা বুঝি-রাছি যে দুঃস্থ শক্তির সহিত মাংসস্থ শক্তিব, এমন কি মৎস্ত নিহিত শক্তির সহিত একতানতা নাই, এবং ভক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে ইহার পরস্পর বিরোধী বস্তু।

চিন্তার একাগ্রতা সাধন পক্ষে আমিষ ভোজন ব্যাঘাত স্বরূপ। মাংস ভোজনের সহিত চিন্তা শক্তির বেশী চালনার মাংস ভাল-রূপ হয় না।

কেবল দুঃস্থের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটান সাধারণের পক্ষে চলে না। কিন্তু সুল কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া মানসিক শক্তির তীব্র চালনার দিন কাটাইলে কেবল দুঃস্থের উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়, কোন কষ্ট হয় না।

লঘু আহার বুদ্ধিবৃত্তি চালনার বড় অল্পকূল।

মাংস আহার করিয়া নিজে গেলেন যে সকল স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা নিগের মধ্যে ভয় এবং কামনা যে পরিমাণে থাকে, নিরামিষ ভোজনে দিন কাটাতেইলে স্বপ্নে তত ভয় এবং কামনা আসিতে পারে না।

কোন সত্য অনুসন্ধান করিতে গেলে মনকে সেই বিষয়ে স্থির রাখিতে হয়, কিন্তু মাংস ভোজনে মনের চাক্ষু্য বৃদ্ধি হয়।

মাংস ভোজনে শুল ইন্দ্রিয় সকল সঞ্চালনের ইচ্ছা বলবতী হয়, এবং সেই জন্য মাংস ভোজন ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু জনের পরম শত্রু।

আমার এই সকল কথা সত্য কি না তাহা যিনি পরীক্ষা করিতে চান, তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছু হইয়া আমিষ ভোজন ত্যাগ করুন, কিছুকাল (১ বৎসর ২ বৎসর) আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া পরে পরীক্ষা করিবার জন্য দিনকতক আমিষ ভোজন করিয়া দেখুন তাহা হইলেই আমিষ ভোজনেব এবং নিরামিষ ভোজনের দোষ গুণ বুঝিতে পারিবেন। ইন্দ্রিয় সংযমের ইচ্ছা বাহাদের নাই, তাঁহারা মাংস ভোজনের দোষ হেথিতে পাইবেন না।

ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার। এক উর্দ্ধশ্রোতস্থিনী এবং অর্ধমুখী, অপর প্রকার অধঃশ্রোতস্থিনী এবং বহিমুখী। আমাদের জ্ঞান সাধারণ জনের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল অধঃশ্রোতস্থিনী এবং বহিমুখী। অভ্যাস নিবন্ধন শরীরের শক্তি যে শ্রোত পথে চলিতে নিষিদ্ধাছে, উহা সর্বদাই সেই শ্রোত পথে চলিতে যায়, অধঃশ্রোতস্থিনী শক্তিকে উর্দ্ধশ্রোতস্থিনী করিতে পারাই প্রকৃত মনুষ্য। কিন্তু ইহা যে কতদূর দূর তাহা যিনি ইন্দ্রিয় সংযম করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন । মাংস মজ্জাদি সেবনে ইন্দ্রিয় বৃদ্ধির বেগ বড় বেশী হয়, ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি সকল বড়ই বল-
বান হয়, তখন তাহাদেব সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে জয় লাভের
সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযমেচ্ছা ব্যক্তি কামরূপী শক্র-
দিগকে মজ্জ মাংসাদি সেবন করাহবা বলশালী করিতে চেষ্টা করেন
না । আমার এট কথা গুলির অর্থ সকলেই যে বুঝিবেন, ইহা
আমি প্রত্যাশা কবি না, যিনি বুঝিতে পারিবেন, একথা গুলি
তাহাব জন্তই শিখিলাম ।

প্রতিবাদ লেখক মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদেব শেষভাগে পাঠক-
গণকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন যে স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন
মাংস ভোজন করিতেন না বলিধাই অকালে কাল গ্রাসে পতিত
হইয়াছেন । কিন্তু মাংস ভোজন না করাই যে কেশব বাবুর
মৃত্যুর কাবণ, ইহা প্রতিবাদ লেখক কেমন করিয়া জানিলেন, তাহা
বুঝিতে পারিলাম না, কেশব বাবু প্রথমে নিরামিষ ভোজন
করিতেন, পরে হালেব ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে মাংসের স্কন্ধরা
খাইতে হইয়াছিল, এট বুদ্ধির উপর নির্ভব করিয়া লেখক বুঝাইতে
চান যে কেশব বাবু মাংস ভোজন করিতেন না বলিধাই অকালে
কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধিটি বড় অসার বোধ হইতেছে ।
মজ্জ মাংস ভক্ত ডাক্তারেরা কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহার জন্ত মাংস
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া নিরামিষ ভোজনই যে কেশব বাবুর অকাল
মৃত্যুর কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় না, যদি কোন নিরামিষ ভোজনের
পক্ষপাতী বৈজ্ঞ কেশব বাবুর শেষ দশায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন,
তবে তিনি হয়ত তাঁহার জন্ত মাংসের স্কন্ধরার বন্দোবস্ত করিতেন না ।
প্রতিবাদ লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—স্বর্গীয় দারিকা

নাথ যিহ ত নিরামিষ ভোজী ছিলেন না, তবে তাঁহার কেন অকাল মৃত্যু ঘটিল?

নিরামিষ ভোজনে অকাল মৃত্যু ঘটে না, দীর্ঘ জীবীদের সংখ্যা যদি গণনা করা যায়, তবে ইহা দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী। চিত্তাশীল ব্যক্তি যদি দীর্ঘজীবী হইতে চান, তবে নিরামিষ ভোজনই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত। আমার এই কথাটি আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। খাস প্রখাস যত শীঘ্র শীঘ্র পড়ে, মল্লস্যের পরমায়ু তত শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় পায়, খাস প্রখাস যত ধীরে ধীরে পড়িতে থাকে, মল্লস্য তত দীর্ঘজীবী হয়। বাংস ভোজনে খাস প্রখাসের বেগ বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বাংস ভোজন আয়ু ক্ষয় করে।

চিত্তাশীল ব্যক্তিগণ বাংস ভোজন ব্যতিরেকে যে সুস্থ থাকেন না, একথা মানিতে প্রস্তুত নহি। বরং অধিকাংশ স্থলেই এই-রূপ দেখা যায় যে, যে সকল চিত্তাশীল ব্যক্তি বাংসভোজী তাঁহারা প্রায়ই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। টিঙল হারবার্ট স্পেলের প্রকৃতি বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অধিকাংশই অজীর্ণ রোগাক্রান্ত। আমার একজন বন্ধু যিনি চিন্তা কার্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটান, তাঁহার সম্বন্ধে আমি বাহা দেখিয়াছি তাহা বলিতে চাই। তিনি একজন বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর ভাষা আমিবাশী ছিলেন, প্রায় আট বৎসর ধরিয়া অজীর্ণ রোগে কষ্ট পান, এট আট বৎসরের মধ্যে অ্যালোপ্যাথী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী কোন রকম চিকিৎসারই ব্যক্তি রাখেন নাই। ইনি পূর্বে বাঙ্গালীর ভাষা মন্ত্রজীবী আমিবাশী ছিলেন। কালে কখন বাংস খাইতেন। কিন্তু প্রকৃত্তারী চিকিৎসার প্রত্যাহ বাংস সেবনের ব্যবস্থা হয়,—কেন না

ডাক্তারের যত্নে মাংস যত শীঘ্র হজম হয়, এত শীঘ্র কিছুই হজম হয় না । এই চিকিৎসার ফলে তাঁহার অজীর্ণ রোগ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাঁহার জীবন তাঁর বোধ হইতছিল, ইংবাকীতে বাহকে Hypochondria বলে, তাঁহার সেই Hypochondria ভয়ে । ক্রমে মাংস ভোজনের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া নিরামিষাণী হন । তিনি যতদিন আমিষাণী ছিলেন দুধ সেবন করিলেই তাঁহার উদ্যময হইত । কিন্তু নিরামিষাণী হইয়া অবশি দুধ ক্রমে ক্রমে সহিতে লাগিল, তিন মাসের মধ্যে তিনি বোগ মুক্ত হন । তিন বৎসরের অধিক হইল তিনি আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া অজীর্ণ রোগের হস্ত হইতে মুক্ত পাইয়াছেন । মধ্যে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি দিনকত মাংস ভোজন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে মাংস ভোজন করিলেই তাঁহার অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয় এবং চাকল্য উপস্থিত হয় । এই সব দেখিয়া আমার ইহা ধারণা হইয়াছে যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বক্ষণ জন্য যে আমিষ ভোজন বড়ই প্রয়োজনীয়, একথাটি বড় ভুল ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আমার মালা গাঁথা ।

(বঙ্গদর্শন—১২৮৪ সাল, আষাঢ় হইতে উদ্ধৃত) ।

এক ছড়া মালা গাঁথিতে বড়ট সাধ হ'লো । সূর্য্যমুখী এতক্ষণ
মুখ তুলিয়া আকাশ পানে চাটুশাছিল, সন্ধ্যা হইল দোখা আস্তে
আস্তে মস্তক অবনত করিল, আমি ও মালা গাঁথিবার জন্য এক-
গাছি তুতা লইয়া মুক্ত দ্বার দিয়া বাননে প্রবেশ করিলাম । এই
কানন ভ্রমণে কাহাবও নিবেশ নাট, সাধাবশেষ জুড়াই বাগানটি
প্রদত্ত হইয়াছে । সন্ধ্যার মন্দ সমীপে উত্তানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতু-
র্দিকে বিকিষ্ট হইতে লাগিল, গাছেব পাতাগুলি অল্পে অল্পে
ছুলিতে লাগিল, ঝিল্লিগণের ঝাঁঝ বন মধ্যে বোধ হইল, আর
সেই সঙ্গে আমার ও হৃদযন্ত্র বাজিয়া উঠিল । আমি খেন কি
অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন দ্রব্য হারায়েছি কিম্বা কি
যে সে দ্রব্য তাহা স্মরণ করিতে পাবিলাম না । অনেক প্রকার
অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল । ভাবিলাম কিংতুকে যদি গন্ধ থাকিত,
জুপক ফল যদি না পচিত, বিদ্যাতের আলোক যদি মননশিদ্ধকর
হইত, আর আমার যদি এই সকল পুষ্পের ন্যায় ভুবনমোহিনী
শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত । এইরূপ ভাবিতেছি
এমন সময় দেখি কতকগুলি শুক ফুল ভূপতিত হইল । পতন-

কালীন সরসর শব্দে যেন বলিতে লাগিল—*Memento hora novissime* (Remember the last lover) এই উপদেশবাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন অরণ্য করিলাম, তখন বুঝিলাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি হউক—কালি হউক—হৃদয়ন পরে হউক, এই যত্নচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। পতনকালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল, স্বতঃক্ৰমে বৃক্ষে ছিল ততঃক্ৰমে বৃক্ষেব শোভা বর্জন করিয়াছে, সঙ্গন্ধ দানে কত লোকের চিত্তসংগ্ৰাম করিয়াছে, আপনার কর্তব্য কর্ম সাধন করিয়া ধ্বংস হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি—আমি সঙ্গন্ধ বিতরণে কর জনেব চিত্ত সংগ্ৰাম করিয়াছি, কাহাব শোভা বর্জি করিয়াছি ? কাহাবও নব। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম ? যখন আমার এই জীবন বৃষ্টি কালশ্রোণে মিশাইবে তখন কি হাসিতে পাঠিব না ? যাঁজ হউক আব ভাবব না, মিছা ভাবনায় সব ভুলিয়া গিয়াছি। হাতেব স্তম্ভ হাতেই বহিয়াছে, মালা ত গাঁথা হয় নাই।

মালায় লজ্জা ফুল তুলিতে চলিলাম। দেখিলাম অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছে, আব কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়া চলিয়া ফোটে ফোটে হইয়াছে। মল্লিকান্সন্দবী দেখিল যে ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধ-কারায়িত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন ? এষ্ট ভাবিয়া বীরে বীরে অবগুষ্ঠনমোচন করিল—আপনার গছে আপনি ঢলিয়া পড়িল। ঐ চলে পড়া ভাব আমি বড় ভালবাসি। নিজের গুণ মনে মনে মেনে যে নম্র ভাব ধরে, তারে বড় ভালবাসি। মল্লিকে। ক্ষুদ্র বৃক্ষে তোমার জন্ম, ঐ বিদেশী আরোকেদিয়া, উহার পাতার ছায় তোমার পাতার সৌন্দর্য্য নাই—ক্ষুদ্র পলাশের ছায় বর্ণও

নাই, কিন্তু তবু আমি তোমারে বড় ভালবাসি—তোমার ঐ সাদা রং ও সঙ্গন্ধ আর ঐ চলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। শুনিতে পাই সরল মনের সহিত সবল মনের বিনিময় সহজেই হয়—তোমার নিজের মন আমি চিনিতে পাবিলাম না—জানি না সরল কি পরলময়, কিন্তু বোধ হয় তোমার উপর ঘেরূপ সাদা অন্তর ও সেইরূপ নহিলে তোমার ঐ চলে পড়া ভাব থাকিত না। তুমি গর্বিতা হলে তোমার সহিত আলাপ কবিতাম না, তোমার নিকট এতক্ষণ ঠাঁড়াইয়া থাকিতাম না, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেই-রূপ নও, সেইজন্যই তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি। মল্লিকে! আজি আমার কোতুল নিবারণ করিতে হইবে। মল্লিকে! বল দেখি, জগজ্জন মনোহর ঐ সঙ্গন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? ঐ গন্ধে বিস্তার হইয়া মানবগণ নন্দন কাননের স্নুখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে এই ভক্তই কি তুমি তোমার গন্ধ ইত্যন্তঃ বিক্ষেপ কবিতোছ? কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? স্বার্থ স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া পবেব স্নুখ বর্জন কবাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মনে তাবিলাম যধুর হাসি হাসিয়া মল্লিকা বলিল—আমার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপর নহে। গন্ধ বিতরণে আমার নিজের লাভ কি? তবে বলি শুন—এ সংসারে তুমি একা—সংসার বন্ধনে বদ্ধ না হয়ে উদাসীনের ভায় বিচরণ করিতেছ। তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ভায় কার্মিনীগনের মনের ভাব তোমাধ কিরূপে বুঝাইব? আমরা চাই অগতঃ সকলে আমাদের ভাল বাসিবে, মানবগণ নিজ নিজ জন্ম কাননে আমাদের যত সহকারে বোপন করিবে, আমাদের জল সেচনে পরিবর্দ্ধিত করিবে; এখন বল দেখি আমার ঐ

গছটুকু না থাকিলে কে আমার ভাল বাসিত ? সকলে ভাল বাসিবে—এই সুখের আশা যদি না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই এরূপ গছ বিতরণ করিতাম ? আমার অভিপ্রায় বার্ষ-শূভ নহে । বার্ষশূভ একগতে কেহই নহে ।

বার্ষশূভ কি কেহই নাই—হতেও পারে । গ্রামের মধ্যে বড় লোক—বড় পরোপকারী শশীবাবু অতিথি প্রতিপালন করিতেছেন—কেন ? নিজে প্রেংসা পাবেন বলে, আর নিজের মনের সুখ সাধনের জন্য । এই বে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অগ্নের গ্রাসটি আদর করিয়া মুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু সুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয় । যদি অন্যরূপে হাতের পুষ্টিসাধন হইতে পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের সহিত সূচিক্ত দস্তাবলী পরিবেষ্টিত সুখের প্রণয় থাকিত কি না বলিতে পারি না ।

যেখানে যাই সেইখানে বেধি সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত আমিও নিজের ভুটি সাধনেব জন্য মালাটি গাঁথিয়া শেব করিলাম । এখন মালাটি গাঁথিয়া শেব করিলাম । এখন মালাটি নিজে পরিব অথবা অন্য কাহাকে ও পরাইব চাহাই তাবিতে লাগিলাম । নিজের গাঁথা মালা নিজে পরিতে ইচ্ছা হইল না । আমার গাঁথা মালা আর এক জনের গলে দিয়া নরন তরিয়া তাহার শোভা দেখিব—মনে মনে এই বাসনাই প্রবল হইল । কিন্তু এ মালা কার গলে পরাইব এ মালা গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে ? অন্ধকারে বসিয়া মোটা স্তম্ভ, কি ফুল ভুলিতে কি ফুল ভুলিয়া, এই বে মালা গাঁথিলাম এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না । তবে পরের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে ? আর পরেই বা আদর করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে ? আদর—আদর এই

কথাটি বড় মিষ্ট, আমি যে আদর বড় ভাল বাসি। যে আদর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বাবের গলা জড়াইয়া কুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়—আর মুখে মধুর হাসি দেখা দেয়—বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর মাখাম তিরস্কার করিয়া থাকে।—সেই আদর ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটি লইবে? সেট আদর মাখা বচনে কে আমার বলিবে ও ফুলটির বদলে আর একটি ফুল বসাত—ওফুলটী ছিঁড়িয়া ফেল—এই স্থানটি বেশ হইয়াছে—ওখানটি ভাল হয় নাই, কে ঐরূপ আদর করিয়া আমার পরিশ্রম সকল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি কেহই নাই? থাকিতেও পারে যখন তেমন লোক পাটব, তখন তাহাকে মনের মত মালা গাঁথিয়া পরাইব—এখন এই স্ত্রী নিবদ্ধ কানন কুশুম নিচরণে মাতা বসুমতীর করে সমর্পণ করিব। ফুলগুলি থুলিয়া মাটিতে ছড়াইলাম।

২৬ বৎসর পূর্বে এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটি আমার প্রথম লেখা, উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া পদ্ম পত্রিকাতে পুনরায় প্রকাশ করিলাম।

এই সংসার কাননে; কর্ণস্রুত হাতে করিয়া কর্ণের মালা গাঁথিতে আসিয়াছি কিন্তু এই কর্ণের মালা নিজে পরিবাব সাধ নাই। আমার গাঁথা মালা আর একজনের গলে দিব, তিনি উহা আদর করিয়া লইবেন তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইব; এষ্ট টুকুই আমার মালা গাঁথার স্বার্থ। বাঁহার গলে আমি আমার কর্ণের মালা পরাইতে চাই, তিনি আমার ইষ্টদেবতা তিনি আমার আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা। তিনি আমার অন্তরে বাস করিতেছেন কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনি না। তাঁহাকে বুঝিয়া

মালা পরাট্টিব উহাই এবারে সংকল্প করিয়াছি, মালা আর ছিঁড়িব না, ছিঁড়িতে গেলে ও ছিঁড়িতে পাবিব না। এবারে যে মালার কথা লিখিতেছি এমালা যে একবার গাঁথিলে আর ছেঁড়া যায় না। বুদ্ধি স্বরূপ ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিবা, কর্ণের মালা ইষ্টদেবতার হাতে সমর্পণ করিয়া, সেই দ্যুতিময়ের দ্যুতি দর্শনে সাধকের যে আনন্দ উহাই সাধকের প্রকৃত স্বার্থ। এট স্বার্থসাধনাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সংসার চক্র ।

পূর্ণিমাতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করার আমার এক বন্ধু বলিলেন “সংসার চক্র” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ। আমি তাহাষ্ট স্বীকার করিয়া “সংসার চক্র” নাম দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি ।

আমার বাসাতে একটি কদম্ব গাছ আছে, কি লিখিব তাট ভাবিতে ভাবিতে ঐ কদম্ব গাছটির দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকায় আমার মন তিনটি কথা লইয়া কল্পনার রাজ্যে চলিয়া গেল। ১ম কথা পূর্ণিমা, ২য় কথা সংসারচক্র, ৩য় কথা কদম্ব বৃক্ষ ।

পঞ্চশত শতাব্দী গত হইয়াছে, একদিন পূর্ণিমার নিশিতে কদম্ব তরুণুলে সংসারের বীজগ্রন্থ পিতা গোপীগণ সহ রাসচক্রে যে বিহার করিয়াছিলেন সেট কথা মনে আসিল । শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়্যা অবলম্বন করিয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রকারগণ এইকথা বলেন যে ভগবান যোগমায়া অবলম্বন করিয়া এই সংসার-চক্র ঘুরাইতেছেন—অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য করিতেছেন । যোগমায়্যা সংসার চক্রের মূলশক্তি এবং এই যোগমায়্যাই রাসলীলার মূলশক্তি, এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইয়াছে যে রাসলীলার মূঢ় রহস্ত বুঝিতে পারিলেই সংসার চক্রের রহস্ত বুঝিতে পারা যাইবে । কিন্তু

সেই রহস্য যে কি তাহা আমি সম্যক বুঝিতে পারি নাই, সুতরাং পাঠকগণকেও বুঝাইতে পারিব না, তবে রাসলীলা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যে গুটিকত কথা অব্যাহত মনে আনিয়াছে তাহাই বলিতে ইচ্ছা করিতেছি ।

সুন্ন জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমার নিশিতে ভগবান ঐক্লব্ধ যোগমায়া আশ্রয় করিয়া কামবীজ পূরিত মধুর গীতিধ্বনি করিলেন, ঐ গীতিধ্বনি ব্রজবাসিনী গোপীগণের মন হরণ করিল । সেই স্বর—

‘কাণের ভিতর দিবা মরমে পশিলো গো,
আকুল করিল যোর প্রাণ ।’

গোপীগণ সেই স্বরের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, ধর্ম বিসর্জন দিয়া, অশ্রান্ত যৌবন নন্দনকাননের সমীপে রতিপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন, ঐক্লব্ধ তাঁহাদিগকে ধর্ম উপদেশ দিলেন, পতি সেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম ইহা বুঝাইলেন, গোপীগণ কিন্তু তাহা বুঝিলেন না । লোহ যেমন অরক্তান্ত মণির আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ যোগমায়া অবলম্বনে নন্দন কাননের শরীর এখন এক বৈদ্যুতী শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার আকর্ষণ ছাড়াইয়া যাইতে গোপীগণের সাধ্য নাই, তাঁহার সকল দৃষ্টিতে সুহৃৎ সেট কিশোর কুমারের বদন মঞ্চল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে চন্দ্রপ্রভবরি, সেট গোপাল বালকের হৃদয়স্থ সূর্য্যপ্রভ প্রাণের সহিত যিশাহবার জন্ত বার বার ঐহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, এট ছুই হৃদয়ের প্রেমের তরঙ্গ একত্র মিলিয়া যমুনার চন্দ্রকিরণে সিক্ত বারিধ কল্লোলের মধুর ধ্বনি করিতে করিতে, গ্রহ নক্ষত্র ঘোচিত আকাশ ভেদ করিয়া কোথায় কোথায় কোথায়—কিসের দিকে বাবিত হইল । তাহার পর গোপীগণ মনে

করিলেন যে কৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি অহুরক্ত এবং ইহা হইতেই তাঁহাদের মনে অহংকার জন্মিল, ভগবান অন্তর্দ্বান হইলেন । গোপীগণ বিরহ কাতর হইয়া বনে বনে তাঁহার আবেশণ করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহারা অস্ত্র এক নাগিকার পদচিহ্ন মাত্র দেখিয়া বুঝিলেন যে সেই সৌভাগ্যশালীনি নাগিকাই কৃষ্ণের পরমাপ্রেমসী । গোপীগণ বিরহ যাতনা ভোগ করিয়া অহংকার শূন্য হইলে ভগবান পুনরায় তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাদের রতিকামনা পূর্ণ করিলেন ।

বোগমারা খেলা দেখ । শ্রীকৃষ্ণ পরজীবী হৃদয়ের রতি কামনা পূর্ণ করিলেন কিন্তু যেকোন শ্রীকৃষ্ণের এই কাম লীলার নিরুত্তি হইল তাহা অপার্বিব । ভগবান, নন্দ-নন্দনের স্বচ্ছ দেহ ছাড়িয়া, যতগুলি গোপী ততগুলি অমল ক্রাম সুন্দর সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া একই সময়ে সমস্ত ব্রজগোপীগণের মনস্কামনা পূরণ করিয়াছিলেন ।

কৃষ্ণা তাবন্তমাস্থানং স্বাবতীর্গোপ বোবিতঃ

বরাম ভগবাংস্তাভিরাষ্ট্রায়াশপালীলয়া ।

ভাগবত । ১০ । ৩৩ । ২০

ভগবানের সহিত ব্রজ গোপীগণের রমণ স্থূল শরীরের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের সন্মিলন । এই সন্মিলন স্থলেই রাসলীলাব পূর্ণ রস এবং পূর্ণ-পবিত্রতা । এই রমণ গোপীগণের মত্তদীক্ষা এবং ইষ্ট দেবতা সস্ত্রয়োগ ।

স্থূল শরীর মনুষ্যের সহিত, সূক্ষ্ম শরীরী দেবতার মিলন হইলে সাধক দিবা শ্রবণ লাভ করিয়া এক অপূর্ণ ধ্বনি তাহার হৃদয়াকাশে শুনিতে পায় । সাধারণতঃ বুকের মাঝে বে লপ্ ডপ্ শব্দ হইতেছে

এবং বাস প্রার্থনের যে হাঁস কঁাস শব্দ হইতেছে, তখন সেই শব্দ আর থাকে না, সাধকের কানে তখন শব্দ বস্টাখনি বাজিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যিনি যে তাবের সাধক সেই ভাবানুযায়ী বীজযন্ত্র তিনি শুনিতে পান। এই বীজযন্ত্র হৃদয়ে ধরিয়া রাখাই এই অপার্থিব দিব্য রক্তির আত্মসঙ্গিক গর্ভধারণ। কি পুরুষ হৃদয় কি রমণী হৃদয় উভয়ঃ এই বীজ ধারণাপযোগী ক্ষেত্র এবং জৈবের কাছ সকলের হৃদয়ই জ্বী। এই মন্ত্র বীজ ধারণ করিতে পারিলেই প্রকৃতি অন্তঃস্বৰা হইতে পারা যায়, কেন না তাহা হইলেই স্ব স্ব গুণ অন্তরে উদ্ভিত হয় এবং উপাসক অন্তরের জ্যোতি মর্শন করিয়া থাকেন।

গোপীগণ কাম তাবের সাধক ছিলেন, আমার মনে হয় যে বৃন্দাবনের রাসলীলার কল গোপীগণের কামবীজ মন্ত্র লাভ।

গর্ভধারণেই রমণীর কাম নিবৃত্তি হয়। গোপীগণ রাসলীলার যে বীজ পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহারা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া কামের পরানিবৃত্তি লাভ করিয়া সংসার চক্র হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সকল জীবের উদ্ধার জন্য কালের ক্ষেত্রে তাঁহাদের পদ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

প্রশ্ন ও উত্তর ।

প্রশ্ন ।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন হিঃ--

আপনার সম্পাদিত ‘পদ্মা’ পাঠে অনেক তথ্যের তাৎপর্য উপলব্ধি হইয়াছে, কিন্তু তাৎপর্য উপলব্ধি যাত্রেই হৃদয়ের আকাজকা মিটে না। কার্যতঃ তাহা জীবনগত করিতে না পারিলে স্থায়ী ফল লাভ হয় না। যদি মহোদয়ের পরিচিত কোন মহাত্মার কৃপায় এই অভিলাষ পূর্ণ হয়, অসুগ্রহ পুঙ্ক কোথায় কিরূপে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতে পাবে জানাইলে চির বাধিত হইব। নিবেদন ইতি—

উত্তর ।

মহাজন সাক্ষাৎ জন্ম আপনার আগ্রহ দেখিয়া আশ্বাসিত হইয়াছি; এই আগ্রহ যতই তীব্র হইবে ততই আপনি মহাজন সাক্ষাতের পথে অগ্রসর হইবেন। মহাজন সাক্ষাতের ঐ একমাত্র পথ। আমি এখন যদি আপনাকে কোন মহাজনের নাম ধাম বলিয়া দিই, তবে তাঁহার উপর আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা না হইতে পারে, কিন্তু আপনার আগ্রহ তীব্র হইলে যিনি আপনার গুরু তিনি মুক্ত শরীর ধারণে আপনার ললাটদেশে দেখা দিবেন।

মন, হৃদয়ে বিরাজ করে কে রে ;
 মন, ধুঁজে নেনা তারে ।
 মন, হৃদয়ে বিরাজ করে বে রে ।
 দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু, পথের পরিচয় রে,
 যে গুরু সেই কল্পতরু লগাটের ভিতরে ।
 মন, ধুঁজে নেনা তারে ।

আগনি বৈষ্ণব অথবা শাক্ত কোন সম্প্রদায় ভুক্ত কিনা? যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়া বাঁহার উপর ভক্তি হয়, এরূপ কোন লোকের নিকট হইতে যন্ত্র গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবিধিযুক্ত সাধনা করুন। কাম ও ক্রোধ জয় করাই যেন সাধনার উদ্দেশ্য হয়। সাতবৎসর এইরূপ সাধনার পর ঈশ্বর বশীভূত হইলে গুরু দেব সাক্ষাৎ দিবেন।

যদি হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত কোন লোকের উপর বিশেষ ভ্রাতা না থাকে, তবে পরাবিদ্বার্মী সমিতিতে প্রবেশ করুন। যন্ত্র সাধনার পথ দেখাইবার উপযুক্ত লোক এই সমিতির মধ্যে আছেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চভূত ।

(হিন্দু্যত সমর্থন) ।

এই জড় জগৎ যে সামান্য উপাদানে গঠিত, তাহা স্থির করিতে গিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ক্রিতি অপ্তেজ বরুৎ এবং ব্যোমকে পাঁচটি সামান্য উপাদান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও সেই সামান্য উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে ৬৮টি সামান্য উপকরণে এই জড় জগৎ রচিত । এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাহা বলিতেছেন, তাহাতে ত তাঁহাদের ভ্রম দেখিতেছি না, সুতরাং আধুনিকের বিশ্বাস যে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে পাঁচ ভূতের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের জড় জগতের উপাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায় । তাঁহারা যে ক্রিতিকে একটি সামান্য উপাদান বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা ৬৮টি এলিমেন্ট গঠিত । অপ্ অক্সিজেন হাইড্রোজনের সমষ্টিতে প্রস্তুত তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই । তেজ ত পদার্থই নহে ; এই সব নানা কারণে প্রাচীন পণ্ডিতদের উপর লোকের প্রত্যা হীন হইতেছে ।

তাঁহারা পুরোক্ত রূপ তর্ক করেন, তাঁহাদের এই কথা বলিতে চাই যে, কপিলাদি যে সমস্ত ঋষিগণ পঞ্চ ভূতের বাহ্য্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা চিন্তাশীল-লভ্য উন্নত বই অবনত ছিলেন না । তাঁহারা কিরূপ চিন্তা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্চ ভূতকে জড় জগতের সামান্য উপকরণ স্বরূপ স্থির

করিয়াছিলেন, যে বিষয়ে অল্পসন্ধান না করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের কথার আপাতবৈষম্য দেখিবার তাঁহাদিগকে দুৰ্ব্ব স্থির করা সুক্টি সম্ভব হয় না ।

যে একখানি গালিচা বিছান রহিয়াছে । আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম বল দেখি কত রকম সূতার এই গালিচা খানি নির্মিত ? সে দেখিল পশষের সূতা, পাটের সূতা এবং তুলার সূতা এই তিন রূপ সূতার গালিচা নির্মিত, সুতরাং সে উত্তর দিল যে, তিন রকম সূতার এই গালিচা নির্মিত । কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, রাঙ্গা কাল হলিঙ্গা ইত্যাদি দশ রকম সূতার গালিচা নির্মিত । সুতরাং যে বলিয়াছে যে তিন প্রকার সূতার নির্মিত, তাহাকে যদি একেবারেই ব্রাহ্ম বলিয়া স্থির করি, তবে বাস্তবিক দুৰ্ব্বকে ।

বাস্তবিক যে রূপ বিভাগ প্রণালী অবলম্বনে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ভেদ জগতের কারণ অনুসন্ধানে রত ছিলেন এবং যে রূপ প্রণালী অবলম্বনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, উভয় পথ সম্পূর্ণ পৃথক । বহিজগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরস্পরের সহিত যে রাসায়নিক আকর্ষণ আদি সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাকেই বিভাগ প্রণালীর মূল (Foundamentum Divisions) ধরিয়া অনুসন্ধান করা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথ, কিন্তু বহিজগতের পদার্থ সমূহের অন্তর্জগতের সহিত যে সম্বন্ধ থাকিতে আহার পক্ষে প্রতীক্সমান হয়, তাহাকে বিভাগ-প্রণালীর মূল ধরিয়া অন্বেষণ করা প্রাচীন পণ্ডিতগণের অবলম্বনীয় পথ । সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতগণ বাহ্য বলিয়াছেন, এবং আধুনিক বিজ্ঞানে বাহ্য বলিতেছে, তাহাতে আপাতপ্রতীক্সমান বৈষম্য দেখিয়াই প্রাচীন কথার অগ্রাহ করা একেবারে উচিত নহে ।

একশ্রেণী প্রাচীন মুনিগণ কি অর্থে কিত্যপ্তভোমরুদ্ব্যোম শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখা বাউক। আমরা আজ কাল যাহাকে মাটি বল তেজ বায়ু বা আকাশ বলি, পক্ষ মহাত্মত অর্থে তাহা বুঝার না। আমরা যাহাকে মাটি বলিয়া বুঝি, তাহা ও কিত্তি অপ্ তেজ্ মরুৎ ব্যোম্ এই পক্ষ মহাত্মতের সমষ্টিতে গঠিত। যা কিছু স্থূল জড়পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, সকলেই এই পাঁচ মহাত্মতের মিশ্রিত অবস্থা। হিন্দুশাস্ত্রমাত্রেয়ই পক্ষভূত সম্বন্ধে এই কথা পাওয়া যায়। যদি সকল জড়পদার্থই পক্ষভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন, তবে অবিমিশ্র কিত্যপ্তভোমরুদ্ব্যোম্ কাহাকে বলে ?

সাংখ্যশাস্ত্রমতে শব্দশ্রবণ সমন্বিত আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই বায়ুর গুণ স্পর্শ, বায়ুর বিকারে তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজের গুণ রূপ, তেজের বিকারে অপ্ উৎপন্ন হয়, সেই অপের গুণ রস এবং সেই অপের বিকারে কিত্তি উৎপন্ন হয়। সেই কিত্তির গুণ গন্ধ।

ইহা দ্বারা এট বুঝায় যে, হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতে প্রত্যেক স্থূল জড় পদার্থই যাহা রূপ রসাদি পঞ্চগুণ ভ্রূত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, এরূপ পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত। একের গুণ,—গন্ধ, শাস্ত্রকারগণের মতে ইহারই নাম কিত্তি। অতের গুণ—রস, ইহারই নাম অপ্। অপরের গুণ—রূপ, ইহারই নাম তেজ। আর একটি গুণ—স্পর্শ, ইহারই নাম বায়ু এবং শেষ উপাদানটির গুণ—শব্দ, ইহারই নাম আকাশ।

হিন্দুশাস্ত্র সমূহ মতে প্রত্যেক স্থূল পদার্থই এই পক্ষ মহাত্মতের মিশ্রণে গঠিত। অবিমিশ্র কিত্তি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম্ একটি পক্ষভূত পৃথকরূপে প্রত্যেক অস্তিত্ব করা কেবল যোগযুক্তত্বা যোগী

জন্মেরই আরম্ভাবীন । এই কথাটি গ্রহমান জন্ত যেভাবেইরোপনিধং
নিয়মিত ম্লোক উদ্ধৃত করিলাম ।

“কিত্যপ্তেজোনিধে সমুখিতে ।

পঞ্চানকে যোগগুণে প্রবৃত্তে ।

ন তন্ত রোগো ন জরা ন দুঃখং ।

প্রাপ্তস্ত যোগামিবয়ং শরীরং ॥”

তত্ত্ব যে সমস্ত যোগের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে
ও দেখা যায় যে যোগী প্রথমে কিত্তি তত্ত্বের উদ্ভাবন করিবেন । পরে
সেই গন্ধগুণাত্মক কিত্তিতত্ত্ব অপত্যে লীন করিবেন । সেই অপত্যতত্ত্ব
তেজ এবং তেজস্তত্ত্ব বায়ুতে এবং বায়ুতত্ত্ব শব্দগুণাত্মক আকাশতত্ত্ব
লীন করিয়া শব্দ-ব্রহ্মে-যুক্তত্বা হইবেন ।

শাস্ত্রোক্ত কিত্ত্যপ্তেজোনিধির অর্থ যাটি জল আশ্রয় ব্যতীত যদি
আর কিছু না হয়, তবে শাস্ত্রসমূহের পূর্বোক্ত বাক্য সকলের অর্থই
নাই । এবং এরূপ অর্থশূন্য বাক্য শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া
মূর্থতার পরিচয় দেওয়া শাস্ত্রকারগণের কখনই উদ্দেশ্য নহে ।
পরিদৃষ্টমান জগতের সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের বা কিছু জ্ঞান আছে,
তাহা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জন্মিয়াছে । এক একটি
ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মের রূপ রসাদি গুণসকল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়
এবং সেই সমস্ত গুণের আধার বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানটিই
ব্রহ্মজ্ঞান । প্রাচীন পণ্ডিতগণ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই ভিন্ন
ভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধার আছে বলেন, যথা গন্ধ গুণের আধার
কিত্তি, রস গুণের আধার অপ্, রূপ গুণের আধার তেজ, স্পর্শ গুণের
আধার বায়ু এবং শব্দ গুণের আধার আকাশ । সমস্ত স্থল জড়
পদার্থই এই পাঁচ প্রকার ব্রহ্মের সমষ্টিতে গঠিত, তবে কোন, পদার্থে

একের আধিক্য এবং কোনটিতে বা অপরের আধিক্য দেখা যায়। যথা উদ্ভিদ এবং জীব শরীরের তুল্য অংশ বাহ্যে অল্পমাত্র বিকৃত হইলেই গন্ধ উদ্ভূত হয়, তাহাতে ক্রিতির ভাগ অধিক আছে। জল এবং উদ্ভিদের রস ইত্যাদি বাহ্যে রসনার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়াই বিকৃত হয়ত আমাদের রসানুভব করায়, তাহাতে অল্প পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে। বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের গন্ধ গুণ থাকে না, তাহারই নাম ক্রিতি, ক্রিতি অর্থে বাটি নহে। বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের রস গুণ থাকে না, তাহার নাম অল্প, বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের রূপ গুণ থাকে না, তাহার নাম তেজ; বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের স্পর্শ গুণ থাকে না, তাহার নাম বায়ু। (সাধারণতঃ আমরা বায়ু অর্থে বাহ্যে বুকি, তাহার সহিত পঞ্চভূতের যুক্তিতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক আছে যে, বাতাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা তাহার গন্ধ বস বা রূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাহার স্পর্শের উপর নির্ভর করে)। এবং বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের শব্দ জ্ঞান গণ্যে না, তাহারই নাম আকাশ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথাবার্তা বাহ্যে গুনিয়াছেন, তাহারাই হয়ত বলিলেন যে, একট ত্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নিবন্ধনই ত্রব্যের রূপ রসাদি ভিন্ন ভিন্ন গুণ, সুতরাং ক্রিতির অর্থ এরূপ হয় যে—বাহ্যে না থাকিলে ত্রব্যের গন্ধজ্ঞান জন্মায় না, তাহার নাম ক্রিতি,—তবে ক্রিতিকে স্বতন্ত্র এক ত্রব্য না বলিয়া শক্তিবিশেষ বলাই যুক্তি সঙ্গত হয়।

ইহার উত্তর দিতে গেলে ত্রব্য (Matter) ও শক্তি এই দুই কথাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন এবং প্রাচ্য বিজ্ঞানই বা কি বুঝেন, তাহার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে এবং সে অনেক কথা, সুতরাং সে কথা এখন থাক।

ক্ষিতিকে যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শক্তি বলিতে চান বলুন, তাহাতে বেশী কতি নাই, কিন্তু এই শক্তি কিরূপ তাহাও ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রাচীন বৌদ্ধগণের প্রথম আলোচ্য পদার্থই এই পঞ্চভূত। যে যে শক্তি বা যে যে পদার্থ জন্য জীবের গন্ধাদি ভুগ, সেই সেই শক্তির বিবরণ বিশেষ অবগত হওয়াই সাংখ্য বৌদ্ধীর প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ইলেকট্রিটি সিটি নামক পদার্থ বা শক্তি জড় মেঘে বিদ্যুৎ খেলে, এই কথা বলিলেই তাড়িৎ শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ যে শক্তিবশতঃ জীবের গন্ধ, তাহার নাম ক্ষিত্ব এই কথা বলিলেই ক্ষিত্বতত্ত্ব সম্বন্ধে সব বুঝা হইয়াছে, এ কথা বলা সম্ভব হয় না।

ইটগার্ডের ডাক্তার ইয়গার সাহেব গন্ধের হেতু যে পদার্থ, তৎসম্বন্ধে কতক পর্যালোচনা করিয়া দ্বিধা কবিবাহেন যে উদ্ভিদ এবং জীব জন্তুর জীবনে উক্ত পদার্থ সাংখ্যরূপ। ডাক্তার ইয়গার ওডোরিলেন নাম দিয়াছেন। আমরা ক্ষিত্বশব্দে বাহা বুঝা যায় বলিয়াছি, এই ওডোরিলেন শব্দে ও তাহাই বুঝায়। ডাক্তার ইয়গারের মতে প্রত্যেক জাতীয় জীব শরীরে এক রকম গন্ধদ্রব্য আছে, বাহা অল্প জাতীয় জীব শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। মানুষের শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য অত্যন্ত পণ্ড শরীরস্থ গন্ধদ্রব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু একজন মানুষের শরীরের গন্ধ হইতে অন্য মানুষের শরীরের গন্ধ হইতে পৃথক হইলে ও এক রকম। মানুষের রক্তে কোন জীবক দিলে বেরূপ গন্ধ পাওয়া যায়, অন্য জীবের রক্তে জীবক ঢালিলে সে রকম গন্ধ পাওয়া যায় না। খানিকটা রক্ত লইয়া তাহাতে কোন জীবক ঢালিয়া দিয়া কেবলমাত্র গন্ধ আত্মা দ্বারা কোন জন্তুর রক্ত তাহা

ঠিক করিতে পারা যায়। কেবল রক্ত কেন শরীরস্থ যে কোন অংশ লইয়া এবং তাহাতে কোন জীবক চালিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে, সব স্থলেই একই রকমের গন্ধ পাওয়া যায় এবং তদ্বারা কোন্ জন্তুর শরীরের অংশ পরীক্ষা করা যাইতেছে, তাহা বুঝা যায়। এই সব দেখিয়া ডাক্তার ইয়গার বলেন যে, যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য জীব শরীরে দেখা যায়, তাহাই জীবের জীবনের প্রধান কারণ। জীব শরীরে যে বিশেষ গন্ধদ্রব্য আছে, তাহা অন্ন আদি যে সকল দ্রব্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতেছে, তাহার গন্ধ হইতে পৃথক। যে জীব এক রকম আহারে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আহার দ্বারা পরিবৰ্দ্ধিত করিলে তাহার শরীরের সেই বিশেষ গন্ধ যেমন তেমনই থাকে। সুতরাং এই গন্ধ অন্নপানীয়াদির গন্ধ জনিত নহে। জীব জন্মকাল হইতেই সেই বিশেষ গন্ধ দ্রব্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং সেই গন্ধের সহিত যে সকল পদার্থের গন্ধের মিল আছে, তাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জীবন বাত্যা নির্বাহ করে। ইতর জন্তুগণ গন্ধদ্বারা কোন্ দ্রব্য তাহাদের প্রাণধারণের উপযোগী এবং কোন দ্রব্য নয়, তাহা বুঝিবা নয়।

বাইও-লজিষ্ট্রা বলেন যে, জীব শরীরে প্রোটোপ্লাজম নামে যে পদার্থ আছে, তাহাই আমাদের জীবনের কারণ, কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম উদ্ভিদ শরীরে ও বেরূপ, জন্তুগণের শরীরেও সেইরূপ এবং মনুষ্য শরীরে ও ঠিক সেই রকম, অর্থাৎ রাসায়নিক এলিমেন্ট সব প্রোটোপ্লাজমে সমান আছে, এবং তাহাদের আকৃতি আদিও সমান। তবে এক রকম প্রোটোপ্লাজম হইতে গাছ আর এক রকম হইতে মানুষ জন্মে কিরূপে? এ সম্বন্ধে বাইও-লজিষ্ট্রা—কিছুই স্থির করিতে পারেন না। ডাক্তার ইয়গার বলেন যে প্রোটো-

প্লাজম স্ফুলিঙ্গ রাসায়নিক এলিমেন্ট সম্বন্ধে এবং আকৃতি আদিত্তে পরস্পর বিভিন্ন না হইলে ও এক জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম অন্য জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম হইতে বিভিন্ন । এক জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম যে গন্ধ দ্রব্য-সম্বন্ধিত, অন্য জাতীয় জীবের প্রোটোপ্লাজম সে গন্ধ দ্রব্য-সম্বন্ধিত নয় । এবং এই জন্যই একটি হইতে একরূপ জীব এবং অন্যটি হইতে অন্যরূপ জীব জন্মিয়া থাকে । এই সব কারণে তিনি দেখাইতে চান যে, তিনি বাহাকে (Odoigen) বলেন এবং প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বাহাকে ক্ষিত্তি বলিয়াছেন, জীব জীবনের সার ভাগ ।

জাণেশ্বির ক্ষুরণ দ্বারা এক জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত অন্য জাতীয় গন্ধ দ্রব্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ কাহার সহিত কাহার মিল আছে এবং কাহার সহিত কাহার মিল নাই, এই সমস্ত অল্পগন্ধান করিলে যে জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সামান্য সামান্য পণ্ড সকল রোগ উপস্থিত হইলে গন্ধের সাহায্যে ঔষধ বাছিয়া লয়, কিন্তু আজকালকার উনবিংশ শতাব্দীর সভ্য হস্তশাস্ত্রগণ ঔষধের গুণ জানিবার জন্য জন্তুগণের শরীরে তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া অকাতরে কত শত জন্তুর প্রাণ সংহার করিতেছেন । দিক এমন সভ্যতার ।

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্ষিত্তিতত্ত্বকে জীবের জীবনের সার স্বরূপ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ উৎকৃষ্ট আদির সার ভাগ স্বরূপও বলেন । তিনি বলেন যে, প্রত্যেক প্রত্যেক বাতুর যে এক বিশেষ বিশেষ গন্ধ আছে, সেই জন্তুই এক প্রকার বাতু সর্বদাই একই আকারে দানা বাঁধে এবং অন্য প্রকার বাতু অন্যরূপ আকারে দানা বাঁধিয়া থাকে ।

ডাক্তার ইয়গার যেমন ক্রিতিতত্ত্বকে পদার্থ সমূহের সংবাদ স্বরূপ হিঁস করিয়াছেন, আর্থা শাস্ত্রকারগণ ও সেইরূপ ক্রিতি, অথ তেজ, মন্ত্রণ এবং ব্যোম এই পাঁচটিকেই অভ জগতের সারাংশ স্বরূপ হিঁস করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা আজ কাল ত্রব্য ও ত্রব্যের গুণ লব্ধে এই রূপ বুঝিয়াছি যে ত্রব্যের গুণ ত্রব্যের অভ্যন্তরস্থ কোন না কোন গতি ক্রিয়া মাত্র। ত্রব্যের রূপ রসাদি গুণ বাহ্য আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয় তাহা কোন না কোন শক্তি ক্রিয়া জনিত জ্ঞান মাত্র। এই গতি ক্রিয়ার আধারের নাম বস্তু বা ত্রব্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই অভজগতের সমস্ত ঘটনাই যে কোন এক মাত্র আধারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া (motion), চাহাই প্রমাণ করিবাব পথে অগ্রসর হইতেছেন।

বাহ্যকে আমরা আলোক বলি তাহা ইধর নামক ত্রব্যের অল্প সকলের কম্পন জনিত, ইধর সমুদ্রে উখিত তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ ইধর সমূহের তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর দ্বারা আঘাত করাতে যে মানবীর কম্পন জন্মে তাহাতেই আমাদের আলোক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আলোক বিজ্ঞান লব্ধে সম্যক পর্যালোচনা করিয়া পাশ্চাত্যগণকে ইধর নামক এক প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। ত্রব্যের অভ্যন্তরস্থ ইধরের কম্পন জন্ত ত্রব্যের বর্ণ বিধরক গুণ জন্মিয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন রূপ গুণ বিশিষ্ট ত্রব্যের মধ্যে ভেজ নামক এক প্রকার বস্তু আছে, এই তাহা থাকাতেই ত্রব্যের রূপ গুণ জন্মিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা আর হিন্দু শাস্ত্রকারগণের কথা মিলাইয়া দেখিলে

একজন্মের ইধর আর একজন্মের তেজ দুটি যে একই অর্থবোধক ইহা বোধ হয়।

জ্যোতির বর্ণ বিষয়ক জ্ঞান যেমন আমাদের দ্বায়ুর কল্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ক জ্ঞান ও দ্বায়ুর কল্পন বশতঃ জন্মিয়া থাকে। যে প্রকার অম্লুর কল্পনে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বায়ুর কল্পন আছে, তাহার নাম যেমন ইধর বা তেজ, সেইরূপ অম্লুব কল্পনে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বায়ুর কল্পন আছে তাহার নাম শ্রুতি। যেরূপ অম্লুর কল্পনে রসেন্দ্রিয়ের দ্বায়ুর কল্পন আছে তাহার নাম রস, এবং অস্ত্রান্ত ভূত সৰ্ব্বক্ষে ও এইরূপ।

হিন্দু ঋষিগণের মতে এই পাঁচ প্রকার ভূতের অম্ল লইয়া বাহ্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দুদের এইমত দ্রাষ্টব্য কি অদ্রাষ্টব্য তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা, এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মে নাই। হিন্দু ঋষিগণ হুঙ্কারভূতি শক্তির সম্যক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা বাহ্যজগৎ সৃষ্ট হইবে যেমন যেমন অম্লভব করিয়াছিলেন তাহাই শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং যদি কেহ তাঁহাদের মতকে দ্রাষ্টব্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তবে জ্যোতির পরমাণু সৃষ্ট হইবে তিনি যে বিশেষ তথ্য অবগত আছেন, তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে। আজকাল পাশ্চাত্যগণ স্পষ্টই স্বীকার করেন যে যদিও তাঁহারা জ্যোতির পরমাণু সৃষ্ট হইবে মধ্য মধ্য হু এক কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের হুঙ্কার পরমাণু সৃষ্ট হইবে স্বর্বার্জ জ্ঞান (Knowledge of the ultimate nature of atoms) কিছুই নাই।

হিন্দু ঋষিগণের পঞ্চভূত সৃষ্ট হইবে মতকে যখন দ্রাষ্টব্য বলিতে পারি না, তখন তাঁহারা বাহ্য-বলিয়া গিয়াছেন তাহার অর্থ পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানের সাহায্যে বতদূর বৃষ্টিতে পারা যায় ততদূর বৃষ্টিবার চেষ্টা করা উচিত।

এই জড় জগতে ঋষি কিছু পাই সকলই একই প্রকার বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতিক্রিয়া যাত্র, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ বাহ্য আকর্ষণ ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, কত শত কাল পূর্বে সাংখ্যকার তাহাই অশ্রান্ত জ্ঞানে শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যে একমাত্র আকাশভূত হইতেই বায়ু তেজ, অগ্নি ও ক্রিতিভূত উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রকার পরমাণু লইয়াই এই বাহ্য জগৎ দৃষ্ট হইয়াছে। আকাশ মহাভূতের বিকারে বায়ু, বায়ুর বিকারে তেজ এবং তেজের বিকারে অগ্নি ও অপের বিকারে ক্রিতির উৎপত্তি হইয়াছে।

এই বিকার কথটির অর্থ প্রথমে বুঝিতে হইবে। সূক্তিকাব রাশি হইতে কিয়দংশ সূক্তিকা লইয়া তাহাতে একটি বিশেষ আকার দিয়া একটি ঘট নির্মাণ করিলাম। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐ ঘটকে সূক্তিকার বিকার বলিয়া থাকেন। সমুদ্রের জল রাশির মধ্যে কিয়দংশে জল আবর্তাকারে পরিণত হইলে ঐ বিশেষ আকার প্রাপ্ত আবর্তকে সমুদ্রের বিকার বলা যায়। সেইরূপ ঋষিগণ যখন বলেন যে আকাশের বিকারে বায়ু উৎপন্ন হয়, তখন উহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে আকাশের অণু সকল হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়, কিন্তু বায়ুর একটি পরমাণু কোন বিশেষ আকার পাওয়াতে আকাশ হইতে ভিন্নরূপ প্রতীয়মান হয়।

যে পরমাণু শব্দটি ব্যবহার করিলাম তাহা কি অর্থে ব্যবহার করিলাম তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। ধানিকটী বায়ুকে ক্রমা-

পত ভাগ করিতে করিতে এমন যে স্থল অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে পুনরায় ভাগ করিতে গেলে তাহার বায়ুর ভগ্ন আর থাকিবে না, তাহাকে বায়ুর পরমাণু বলা যায়। ইংরাজি Atom শব্দের অর্থ যাহাকে ভাগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু যতটুকু স্থল অংশ হউক না ইহা কল্পনা করিতে পারি না। ইংরাজি Atom কথাটির আর আমাদের পরমাণু কথাটির অর্থের পার্থক্য জানিয়া রাখা কর্তব্য। বায়ুর একটি পরমাণুকে ভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাগ করিলেই উহাতে বায়ুর ভগ্ন থাকিবে না, আকাশের অংশ রূপ পরিগণিত হইবে।

আকাশের কিয়দংশ কিরূপ বিশেষ আকার পাইয়া বায়ুর অণুরূপে পরিগণিত হয়, তাহা সর উইলিয়ম টমসনের থিওরি অফ্ অ্যাটমস্ (Theory of atoms) বুঝিলে একরকম ধারণা করিতে পারা যায়।

আজ কালকার কেমিস্ট্রী শাস্ত্র হইতে এই পাওয়া য,য যে যে জড় জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন জব্দা দেখা যায় তাহা অগ্নিজন হাইড্রোজেন আদি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলিমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেন্ট সকলের পরমাণু সকল কোন একই জ্ববোর বিকার মাত্র, কিম্বা উহারা জগতের আরম্ভ হইতেই ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আছে—এই চিন্তা অবিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মনে উদয় হয়। সেই বিভিন্নতার পশ্চাতে একটি অভিন্ন ভাব আছে, এইটি তাঁহাদের মনে যেন কোথা হইতে আসিয়া উদয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন এলিমেন্ট সকল যে কোন এক এলিমেন্ট হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, পাশ্চাত্যগণ ইহা অনুমান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে সৰ্ব্ উইলিয়ম টমলস বলেন যে এলিমেন্ট সকলের এক একটি পরমাণু কেবল একবার স্থান পরিবর্তে ব্যাপ্ত দেশে উৎপত্ত এক একটি আবর্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমাণুকে এইরূপ ঘূর্ণিতগতিবিশিষ্ট (Vertex motion) আবর্ত স্বরূপ মনে করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণাদি গুণ কিরূপ সম্ভব হয়, তাহা তিনি গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহা ও দেখাইয়াছেন যে ঐরূপ আবর্ত সমূহের মধ্যে কোন একটি আবর্ত অন্তর্ভুক্ত হইতে সর্বদাই স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত থাকে। তামাক ধাইতে ধাইতে তামাকের ধূঁয়া গোল গোল করিয়া ছাড়িয়া দিয়া ইহা দেখা যায় যে, কোন একটি আবর্ত বাতাসে উড়িতে উড়িতে অন্যটির নিকটবর্তী হইয়া উহাকে স্পর্শ ছুটিতে মিলিয়া এক হইয়া যায় না। দুটি আবর্ত এরূপ কাছাকাছি হইলেই আবার সরিয়া পড়িয়া উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন থাকে। ঐরূপ স্বতন্ত্র ভাব পরমাণুর একটি বিশেষ ধর্ম। এবং ঘূর্ণিত গতি বিশিষ্ট আবর্তের এইরূপ ভাব দেখিয়া ও ঘূর্ণিত গতি সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে স্থির করিয়া সৰ্ব্ উইলিয়ম টমলস ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পরমাণু সকল কোন এক রূপ বস্তু দ্বারা ব্যাপ্ত সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত মাত্র।

হিন্দুদার্শনিকগণ ও বলেন যে এই যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকল দেখিতেছি, ইহারা একই সত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত বই আর কিছুই নহে। সেই জন্য সাংখ্যকার যখন বলেন যে বায়ু ভূত আকাশের বিকার মাত্র, তখন আমরা এইরূপ বুঝি যে আকাশ নামক দ্রব্যে ব্যাপ্ত একটি মহাসমুদ্রে উদ্ভূত আবর্ত সকলই বায়ুর

পরমাণু। এই বায়ুর অণুর কম্পন জনিত আমাদের যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাহার নাম স্পর্শ।

যেমন আকাশ নামক বস্তুর পরমাণু সকল দ্বারা ব্যাপ্ত দেশে উৎখিত আবর্তকে বায়ুর পরমাণু বলিয়া বুঝিলাম, সেইরূপ এই বায়ুর পরমাণু লইয়া উৎখিত আবর্তকে তেজের পরমাণু বলে। আবার তেজের কতকগুলি পরমাণু ঘূর্ণিত গতি বিশিষ্ট হইয়া যে আবর্ত হয়, তাহার নাম অপ্ এবং অপ্ দ্বারা ব্যাপ্ত দেশের আবর্তকে ক্ষতি কহে।

হিন্দু শাস্ত্রমতে এষ্ট পঞ্চভূতে দেহ নির্মিত। বাহিরের তেজের কম্পন দেহস্থ তেজে গঠিত দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত করে, তাহাতে দর্শন জ্ঞান জন্মে। বাহিরের আকাশের কম্পন অন্য দেহের আকাশ গঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়ার কম্পন জন্মে তাহাতে শব্দ জ্ঞান জন্মায়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ঐরূপ।

অনেকে বলিবেন যে বাতাসের তরঙ্গ আমাদের কর্ণে আঘাত করিতেই শব্দ জ্ঞান হয়, ইহাই ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে। তবে আকাশের অণুর কম্পন হইতে শব্দ উৎখিত হয় একথা বলি কেন? হিন্দু ইহার উত্তর এই দিবেন, যে ভূমি দ্বাধাকে বাতাস বলিতেছে, তাহাতে আকাশের তাপ আছে, এই জন্য বাতাসে শব্দ গুণ আছে। জলের মধ্যে ডুব দিয়া জলের ভিতরকার শব্দ শুনা যায়, তখন ত বাতাসের তরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ার দ্বারা আঘাত করে না, তবে বাতাসের তরঙ্গকে কেমন করিয়া শব্দ বলিতে পার। জলে ও আকাশ আছে সেটী জন্য জলের ভিতর শব্দ শুনা যায়।

যেহেতু হৃদয় পদার্থে আমাদের যে ইন্দ্রিয় গঠিত, সেইরূপ হৃদয় পদার্থের কম্পনে আমাদের সেই ইন্দ্রিয় কম্পিত হয়, এই কথাটি

একটু তাবিলেই বুঝা যায়। স্থূল পদার্থের গতিতে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় কল্পিত হয় এবং সূক্ষ্ম পদার্থের গতি ক্রিয়ার আমাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় কল্পিত হয়। একটি তন্তু লোহার গোলার গতি দ্বারা আমাদের স্থূল দেহ গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ লোহার অভ্যন্তরস্থ আণবিক গতিক্রিয়া অর্থাৎ তাপ আমাদের দ্রাব্য গতি উৎপাদন করিয়া উষ্ণতার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এইরূপ সূক্ষ্মের ক্রিয়া সূক্ষ্মের উপর এবং স্থূলের ক্রিয়া স্থূলের উপর হইয়া থাকে।

পূর্বে বাহ্য বলিলাম তাহা যদি মানা যায়, তবে ইহা বুঝিতে পারা যায়, যে যে রূপ অণুর কল্পনে এক জাতীয় জ্ঞান আছে সেইরূপ অণুর কল্পনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞতির জ্ঞান জন্মান সম্ভব নহে। সুতরাং যে রূপ অণুর কল্পনে প্রবণজ্ঞান জন্মায় এবং যে রূপ অণুর কল্পনে দর্শন জন্মায়, তাহা ভিন্ন জাতীয় হওয়া সম্ভব। হিন্দুগণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে যে পঞ্চ প্রকার দ্রব্যের গুণ বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়।

এখন একটি কথা আছে তাহা এই যে, বাহার গুণ শব্দ অর্থাৎ বাহার অণুর কল্পনে শব্দ জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে আকাশ বলা হইল কেন? বাহার গুণ স্পর্শ তাহার নাম বায়ু দেওয়া হইল কেন? বাহার গুণ গন্ধ তাহাকে ক্রিতি বলা যায় কেন। বায়ু অর্থে বাতাস ক্রিতি অর্থে ঘাটি, এই ত সাধারণত বুঝা যায়।

ইহার কারণ এই, সাধারণতঃ আমরা বাহাকে বায়ু বলি, তাহাতে স্পর্শগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, বাহাকে জল বলি তাহাতে রসগুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে, বাহাকে ক্রিতি বলি তাহাতে গন্ধ গুণাত্মক ভূতের ভাগ বেশী আছে। অতীত ভূত সম্বন্ধে এইরূপ।

ক্রিতি আদি পঞ্চভূতে, গন্ধ আদি পাঁচটি গুণ ক্রমান্বয়ে আছে,

এই কথাটি ঠিক হইলে ও সাংখ্যকার বলেন যে বায়ু ভূত আকাশ ভূত হইতে উদ্ভূত হওয়াতে উহাতে আকাশের ও গুণ আছে বায়ুর ও গুণ আছে, অর্থাৎ উহার শব্দ স্পর্শ দুটি গুণই আছে । তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ আছে এবং ক্ষিত্রের পাঁচটি গুণই আছে ।

এখন দেখ যাহাকে আমরা সচরাচর বায়ু বলিয়া থাকি, তাহা যদিও ও পাঁচটি ভূতেরই মিশ্রণে গঠিত বটে কিন্তু উহার শব্দ ও স্পর্শ গুণই প্রধান । অর্থাৎ বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা বায়ু অস্তিত্ব অণুভব করিয়া থাকি । উহার রূপ, রস ও গন্ধ গুণ আমরা বুঝিতে পারি না । এই জন্য স্পর্শ গুণাত্মক ভূত বাহ্য আকাশের বিকার বলিয়া শব্দ গুণাত্মক ও হইয়া থাকে, তাহাকে, যক্ষ্ম বলা হইয়াছে । ঐরূপ অগ্নি শিখার রূপ আছে, স্পর্শ আছে • কিন্তু রস বা গন্ধ গুণ নাই এই জন্য রূপ গুণাত্মক ভূতের নাম তেজ । জলে রস আছে, স্পর্শ আছে, শব্দ আছে, কিন্তু গন্ধ গুণ নাই, এই জন্য রস গুণাত্মক ভূতকে অণু কহে এবং মাটির সকল গুণই আছে, তাই উহা হইতে ক্ষিতি ভূতের নাম করণ । কেবল মাত্র শব্দ গুণ আছে, এরূপ দ্রব্য সাধারণের জানা নাট কিন্তু যোগীশ্বর ঐ বস্তুর সত্তা অনুভব করিতে পারিতেন । ঐ পদার্থ জানা শুনা কোন বস্তুর স্তায় নহে, সেই জন্য উহার নাম আকাশ ।

*—শব্দ গুণ আছে কিনা বুঝিতে পারা যায় না ।

- ইহঁদের তত্ত্বজ্ঞান লাগনার হিন্দু বৌদ্ধগণ নিজের আত্মার সহিত
 বিশ্বের আত্মার যোগ করিবার জন্য যে যোগ মার্গ অবলম্বন করিতেন,
 তুঁত শুদ্ধি তাহার প্রথম সোপান। তাই পঞ্চভূত সম্বন্ধে গুটিকত
 কথা বলিলাম।
-

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

আর আখখানা কোথায় ?

এই পৃথিবীতে আসিয়া যেন কি হারাইয়াছি, সদাই যেন সেই হারান ঘনের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সদাই যেন কাহাকে খুঁজিতেছি কিন্তু কি যে হারাইয়াছি আর কাহাকেই বা খুঁজিতেছি তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না । ঘনের এই ব্যাকুলতা ঘুচাইবার জন্ত—অন্তরের শান্তিলাভের জন্ত সংসার সাগরে কতই ডুব দিতেছি কিন্তু অন্তরের সেই আলা কিছুতেই ধামে না । এক একবার কাতর ভাবে রোদন কর, কিন্তু যাহাকে ডাকিতেছি আমার কাণ্ড তাহার কাছে পৌঁছে না । আমি কাহার জন্ত বা কিসের জন্ত এত ব্যাকুল তোমরা কেহ বুকাইয়া দিতে পার ?

কমলাকান্ত চক্রবর্তী একদিন বলিয়াছেন যে এ জগতে তিনি একা, জগতের কোন পদার্থে তিনি তাঁহার মন বাঁধেন নাই—তাই তাঁহার মন সদাই উড়িয়া যায়, তাই তিনি কখন স্তব্ধ হন নাই, তাঁর কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম এক জায়গার মন বাঁধিয়া রাখিব, তাহা হইলেই বাহা খুঁজি তাহা পাইব, কিন্তু মন আমার কিছুতেই বাঁধা থাকিতে চায় না, আমিও জোর করে ঘনের স্বাধীনতা হরণ করিতে বড় রাজী নহি । মন যখন পাখিব কোন পদার্থেই বাঁধা থাকিতে চায় না, তবে আমার মন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় এই একটি আমার প্রধান ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে ।

কমলাকান্ত বলিয়াছেন যে তিনি একা, আমি ভাবি আমি একা নই। আমি আশখানা। আমার একটা আদং দেহ আছে বটে, কিন্তু মনটা আমার আশখানা। এই জনতে আমার মনের অপরাধ কোথাও না কোথাও আছে, আমার এই আশখানা মন অপব আশখানা মনের সহিত মিশিতে চায়, বতদিন না এই দুই আশখানায় মিশিয়া পূরা হইবে ততদিন অন্তরের ব্যাকুলতা কিছুতেই ঘুঁচবে না। আমার অসম্পূর্ণ মন পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে, সুতরাং আমি যদি উহাকে রূপ-রসাদি পার্থিব বিষয়ে উহাকে বাধিয়া রাখিতে চাই তবে সে বাধনে মন ত কখনই সন্তুষ্ট হইবে না, আমি আর আমার মনকে কোথাও বাধিয়া রাখিতে চাই না। যাও মন তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, যেখানে তোমার অভিযত পদার্থ আছে তুমি সেখানে চলিয়া যাও, একবার খুঁজিয়া বলিয়া দাও যে, সেই অপরাধ কোথায় এবং কি ভাবে থাকে—একবার তাহাকে চিনাইয়া দাও। আর আমি তোমার নিকট হইতে কিছুই চাহিব না। আমার মন, মন চায়, অন্য পদার্থে বাধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও বাধা থাকিতে চায় না। মনের স্রোত মনের সমুদ্রে মিশিতে চায়, আমার ভিতরকার মন বাহিরের মনের সহিত মিশিতে চায়। কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে তাহাদের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, তাই আমার ভিতরে এত গোলমাল, এত কল কল নাদ। আমি এত দিন না বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলাম এই বার হইতে মনের পক্ষ অবলম্বন করিব মনস্থ করিলাম।

আমার ভিতরকার মন আশখানা, বাহিরে উহার অপরাধ রহিয়াছে, তাই তাহার সহিত মিশিবার জন্য সদাই বাহিরে আসিতে চায়। কিন্তু একটি বড় গোল উপস্থিত হইয়াছে। বাহ্য অসম্পূর্ণ

তাহাই কুৎসিৎ, যাহা কুৎসিৎ তাহাকে আমার বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কোচ হয়। সেই জন্য যদি বা কখন মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মনকে বাহিরে ছাড়িয়া দিতে চাই, তখন উহাতে এমনি একটি আবরণ দিয়া বাহির করিতে বাই যে লোকে উহাকে কুৎসিৎ বলিয়া আমাকে ঘৃণা না করে। এই লোকলজ্জার খাতিরে পড়িয়া, পরনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া, আমার আধখানা মনকে যথাবৎ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার বাহিরের মন, ভিতরকার মনের ঐ আবরণে ঠেকিয়া ভিতরকার মনের সহিত মিশিতে পারিল না, আমিও অন্তরের শান্তি পাইলাম না।

তোমাদের পৃথিবীতে সত্যের আদর নাই, তাই তোমাদের পৃথিবীর সঙ্গে আমাব বড় বনে না। আমি যদি আমার ভিতরকার মনকে উলঙ্গ অবস্থায় বাহিরে প্রকাশ করিতে বাই তবেই আমি তোমাদের কাছে হাত্তান্দ্র হটব, তোমরা আমাকে হরত যন্ত্রস্ত সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে—তোমরা সত্যের আদর জান না, তাই আমি সত্যাচারী হইতে পারি নাই। তোমরা সকলেই কপটাচারী হইয়া আমাকেও কপটাচারী করিয়াছ। সেইজন্যই আমার ভিতরকার মন আমার বাহিরের মনের সহিত মিশিতে পারিতেছে না—তাই আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হইতেছে না। জনগণের দ্বার একেবারে উন্মোচন করিবা অন্তরের ভাব যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া সত্যের সহায় লইয়া পূর্ণ হইবে, এই অভिलाষটি বড়ই প্রবল হইয়াছে—কিন্তু আমার এ অভिलाষ কি পূর্ণ হইবে? সত্যের আদর জানে এমন লোক কি তোমাদের পৃথিবীতে কেহই নাই? অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ এর মধ্যে যতদিন আবরণ রাখিবে ততদিন শান্তি মিলিবে না। বাঁহার প্রেমে মত্ত হইলে এই আবরণটি ঘুচিয়া যার তাহাকেই

আমি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝি। যিনি সত্যের উপাসক তাঁহাকেই আমি কৃষ্ণোপাসক বলিয়া বুঝি। গোপীগণের বস্ত্রহরণে যিনি যন্দকৃতি দেখেন দেখুন, কিন্তু আমি উহার ভিতর একটি বড় সুন্দর কান দেখিতে পাই। অন্তরকে আবরণ শূন্য না করিলে কৃষ্ণের সহিত মিশা যায় না।

যতদিন আমার ভিতরের এই আবেশনা মন বাহিরের অপরাধের সহিত না মিশিবে ততদিন আমি অসম্পূর্ণ, ততদিন আমি কুৎসিৎ, ততদিন আমি সকাষ, আমার এষ্ট সকাষ মনকে যিনি নিভাম করিতে সক্ষম তিনিই আমার হৃদয়ের সখা—তিনিই আমার শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথায় তোমরা কি অর্থ বুঝ আমি জানি না, কিন্তু আমি এটমাত্র বুঝি যে যিনি নিভামধর্মের গুরু তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সত্যের পক্ষপাতী, সত্যব্রতাবলম্বী বোর পাপী বাঁহার ভালবাসার পাত্র, বাঁহার কাছে সত্যই ধর্ম, লোকনিষ্ঠা লোকলজ্জার যিনি কখন ব্যথিত নহেন, আমার মন হাজার কুৎসিৎ হটলেও যিনি আমার উদ্ধৃত্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, বাঁহাকে আমি অকাতরে আমাব উলঙ্গ মন সমর্পণ করিতে পারি এবং যিনি আমার সেই মন লইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিয়া কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারেন। তিনিই আমার হৃদয়-বন্ধু। কোথায়—আমার সেই হৃদয়-বন্ধু কোথায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ভালবাসা ।

শি । এই জগতের পদার্থ সমূহ হুই তাগে বিভক্ত , চেতন জীব এবং জড় পদার্থ । যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বলে জগৎ চক্র ঘুরিতেছে তাহাদিগকে প্রধান তিন তাগে ভাগ করিতে পারা যায় ; যে শক্তি হুত্রে একটি জড় পদার্থ অল্প জড় পদার্থের সহিত বাধা থাকে তাহার নাম শক্তি , যে শক্তি নিবন্ধন চেতন জীব জড় বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিব্রাসক্তি এবং জীবের সহিত জীবের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহার নাম ভালবাসা ।

যে ভাব নিবন্ধন আমার সুখ দুঃখ বুদ্ধিতে পারি তাহাট চেতন-বা অর্থাৎ জীবভাব । আমার দেহ আছে, রক্ত আছে, অস্থি আছে, রূপ আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু ইহারা চেতন পদার্থ নহে । যে পদার্থের অস্তিত্ব নিবন্ধন আমি সুখ দুঃখ বুদ্ধিতে পারি সেই টুকুই আমার চেতনত্বের কারণ, হিন্দু দার্শনিকগণ এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন । আমার রক্তের সহিত আর একজনের রক্তের যে আকর্ষণ সম্বন্ধ তাহা জড় সম্বন্ধ , একজনের রূপ শব্দ প্রকৃতির সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ বুদ্ধি, যে অস্থিরাগ তাহার নাম বিব্রাস-কৃষ্ণ ; এক জনের সুখ দুঃখের সহিত আমার সুখ দুঃখের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ বুদ্ধি আকর্ষণের নাম ভালবাসা বা প্রণয় । যিনি অপর একজনের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী তিনি স্বার্থ প্রণয়ী । সাংখ্য-

কার বলেন, যে প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; এই গুণ কণাটির অর্থ বহন-রক্ষা—টীকাকারগণ এইরূপ অর্থ করেন। এই তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব রজ ও তম গুণ। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ তাহা সাত্বিক সম্বন্ধ, চেতন জীবের সহিত জড় পদার্থের যে সম্বন্ধ তাহা রাজসিক সম্বন্ধ এবং জড়ের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা তামসিক সম্বন্ধ।

শক্তি-তত্ত্ব আলোচনা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিৎগণ কেবল জড়জাতীয় শক্তিতত্ত্বই আলোচনা করিতেছেন এবং আর্য্য বিজ্ঞানে কেবল চেতন জাতীয় শক্তিতত্ত্বই সমালোচনা করা আছে। ইহাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। সাত্বিক ও রাজসিক শক্তিকে চেতন জাতীয় শক্তি বলিতেছি।

জড় জগতে শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার লক্ষিত হয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। রাজসিক শক্তির ক্রিয়াও প্রধানতঃ দুই প্রকার দেখা যায়, রাগ ও ঘেব। এষ্ট রাগের অপর নাম কাম। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার বলিয়াছেন “কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।” রজোগুণ সমুদ্ভূত, বিবরাসক্তির নাম কাম এবং সত্ত্বগুণ সমুদ্ভূত আসন্ন লিপ্সাকেষ্ট প্রকৃতভালবাসা বলা যায়।

এইবারে সকাম কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং নিষ্কাম-কর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বলি গুন। চিন্তে রজোভাব অর্থাৎ বিবর সূখ-ভোগেচ্ছা প্রবল হইলে যখন সেই সূখ প্রাপ্তি জড় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে সকাম কর্ম্ম বলা যায়, কিন্তু সাত্বিক ভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন সেই কর্ম্মকে নিষ্কাম-কর্ম্ম বলে।

চিন্তের সাধ্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব কিরূপ তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি গুন। চিন্তের যে অবস্থায় মনুষ্য একজনের সুখ অথেষ্টেই ব্যস্ত, যাহাতে সেই অন্য ব্যক্তি সুখী হয়, সেই কার্য্য করিতেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার অন্তরে সাধ্বিকভাব উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যদার্থ যাহাকে ভালবাসা বলা যায় সেই ভালবাসার ভাব বাহার চিন্তে বিরাজমান তাঁহার চিন্তের অবস্থাকে সাধ্বিকভাব বলা যায়। আকর্ষণের চরম কল্য হুটিতে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া ভালবাসার ও চরম উদ্দেশ্য হুটি মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া অর্থাৎ দুজনের সুখ দুঃখ মিশিয়া যাওয়া। সাধ্বিকভাব প্রবল হইলে মনুষ্য এমন একজনকে খুঁজিতে থাকে যাহার সুখ দুঃখের সহিত তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিশাইতে পারেন, যাহার সুখ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে গিয়াই, যাহার সুখ সাধনোদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিয়াই তিনি সুখী হইতে পারেন। রাজসিকভাব প্রবল হইলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই অবস্থায় যে বিষয় ভোগেচ্ছা জন্মে তাহার নাম কাম; যদি কেহ কাম্য বস্তু লাভের প্রতিকূলতাচরণ করে তবে তাহার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়।

চিন্তের যে অবস্থায় মনুষ্য অড়ভাব প্রাপ্ত হয় (যেমন আলস্য নিদ্রা অবস্থা) তাহাই চিন্তের তামসিক অবস্থা।

এইবার ভূমি কাম ও প্রেম এই দুইটি কথার অর্থ বোধ হয় অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছ, এই দুই এর প্রত্যেকটি ঠিক বুঝিতে পারা বড় প্রয়োজনীয় কেন না মনুষ্য জীবনে অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, যাহা প্রকৃত পক্ষে রাজসিক ভাব বাহা কাম

ভাষাকেই আমরা বিত্তহীন প্রেম বলিয়া বুঝিয়া প্রকৃত প্রেমের
মুসাব্বতনে ঐকিত হইয়া পড়ি।

প্রকৃত প্রেমের সাহায্যে কাম দমন করিতে হয়, নচেৎ জোর
জবরদস্তি করিয়া বাঁহারা কাম দমন করিতে চান তাঁহারা তুল
পথে চলিয়া থাকেন। সম্বন্ধের আধিক্য উপস্থিত না হইলে রজো-
গুণের প্রাচুর্য্য কমে না। যদি নিষ্কার-কর্ম, কি তা বুঝিতে চাও
তবে প্রকৃত ভালবাসা অভ্যাস করিতে শিখ। ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা
দ্বারা নিজের কর্ম সকলের মধ্যে কোনগুলি রজোগুণ সমৃদ্ধ আর
কোন গুলিই বা সম্বন্ধ সমৃদ্ধ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে এবং সম্ব-
ন্ধের প্রাবল্য উপস্থিত হইলে চিন্তে যে তাব উন্নয়ন হয়, স্বত্তিবৃত্তির
সাহায্যে সেই তাব চিন্তে সন্তত আগ্রহ রাখিবার চেষ্টা করিবে,
এইরূপ ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা ব্রাহ্মসিক বৃত্তি সমূহ ক্রীণ হইয়া যায়।
ঈশ্বরভক্ত যে সময় ঈশ্বরের উপাসনা করেন সাধিকভাবে প্রাধাত্য
উপস্থিত করাই সেই উপাসনার উদ্দেশ্য।

ভালবাসা তব সম্যক্ আলোচনা করিয়া ভালবাসিতে শিখিয়া
জগৎজুড়ে সকলকে ভালবাসিতে শিখ তবেই ক্রমে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভ
করিতে সমর্থ হইবে। প্রথমে একজনকে ভালবাসিতে শিখ তাহার
পর পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্য সমষ্টিকে তোমার ভালবাসা ব্রত করিতে
শিখ।

যে ভাবে জগতকে ভালবাসিবে সেই ভাবটি সম্যক্ না বুঝিয়া
যদি “আত্মবৎ সর্বং ভূতেষু” দেখিতে যাও তবে প্রচারের “গ্রাম্য
কথার” সেই যে বালকের বিজ্ঞা পরিচয় দেওয়া আছে তোমার
বিজ্ঞা ও সেই ধরনের হইয়া পড়াইবে।

ভালবাসা রহস্ত আলোচনা করিয়া সেখানে ইহা কল্পিত পাবিবে যে কোর অবরুদ্ধ করিয়া ভালবাসা করে না। ২। তাহাকে সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহারই সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখ নির্ণয়ইছে। প্রবৃত্তি আছে। যে চিত্ত উন্নত তাহাই সুন্দর; বাহ্য বখার্ব সুন্দর নহে। মোহবশতঃ তাহাকেই সুন্দর জান করিয়া আপনহারা হইও না, তাহা হইলে তোমার ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না বাহ্যকে আজি ত্রয় বশতঃ সুন্দর বলিয়া বুঝিয়াছ, কিছুকাল মিলনের পর সেই মোহ ভাঙিয়া যাইবে তখন নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া দারুণ দুঃখে পতিত হইতে হইবে। মোহবশতঃ যে ভালবাসা তাহা চিরস্থায়ী হয় না।

জানালোকে মোহ দূর হয় সুতরাং জানালোকের সাহায্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ভালবাসিতে শিখিবে। ভালবাসা রহস্ত লব্ধে আমার কোন উপদেষ্টা * এইরূপ বলেন যে “প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক”। কি ভাল, কি মন্দ, কি সুন্দর, কি সুন্দর নয় ইহা সম্যক্ বিচার করা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। কিন্তু মহত্ত্বগণ দ্বারা বশে থাকায় জানের আলোক সম্যক্ প্রস্ফুট হইয়া না এবং সেই জন্যই এই পৃথিবীতে এত গোলমাল, যে সৌন্দর্য্যপূত্রে জীব সকল গাঁধা রাহিয়াছে সেই স্তম্ভাগাছটিতে যেন ছোট পড়িয়া রহিয়াছে, হতাশির কুঁড় খুঁজে পাওয়া দার হইয়া উঠিয়াছে।

‘The distance lends enchantment to the view’ ইংরাজী এই enchantment কথাটি আর আমাদের “বারার মোহ” কথাটি একার্থবোধক বলিয়া বুঝি। এই বারার মোহ বশে বাহ্যকে আর সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিছুদিন মিলনের পর আর সেখানে সে সৌন্দর্য্য

* পূর্ববার আমার পিতৃস্বামীর বক্তব্যমতঃ।

দেখিতে পাই না, এইজন্যই পৃথিবীতে নুতনের আদর, পুরাতনের আদর নাই। কিন্তু যিনি স্বার্থ প্রেমিক তাঁহার কাছে নুতন পুরাতন হুইই সমান। কেন না ভালবাসার আধারে কোন্ অংশটুকু প্রকৃত স্নান্দর এবং কোন্ অংশ স্নান্দর নয়, সেই সত্য পূর্বে সম্যক বুঝিয়াই তিনি ভালবাসিয়া থাকেন। পূর্বে বলিয়াছি যে দুটি চিত্ত মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসার চরমফল কিন্তু মনের মতন সৌন্দর্য্য এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া বেলা ভার, সেইজন্য যিনি প্রকৃত ভালবাসা কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনি মনের মতন সৌন্দর্য্য গড়িয়া সেই ভবিষ্যৎ স্নান্দরের চিত্তে চিত্ত অর্পণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ স্নান্দর চিত্তের সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখে মিশাইবার অভিপ্রায়ে যিনি কোন এক আধার অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্য গঠন কার্য্যে তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহার কর্মকেই নিষ্কাশ-কর্ম বলি।

যিনি ভালবাসা অভ্যাস করিতে চান তাঁহাকে কি কি অভ্যাস করিতে হইবে তাহা বলি শুন।

প্রথম। চিত্তে সাধিক ভাবের আধিক্য বাহাতে জগ্গে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, ক্রমে চিত্তের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যে অন্ত একটি চেতন জীবের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখে মিশাইবার জন্য অন্তরে একটা ব্যগ্রতা উপস্থিত হইবে।

দ্বিতীয়। বুদ্ধি বৃত্তির সাহায্যে প্রকৃত স্নান্দর ও উন্নত চিত্তের ভাব কল্পন, ক্রমাগত চিন্তার দ্বারা তাহা স্বয়ংক্রিয় করিতে শিখিতে হইবে।

তৃতীয়। “নিজের চিত্তে চিত্তিত স্নান্দরের সৌন্দর্য্যে অপর এক জনকে তৃপ্ত করিবার জন্য কর্মে নিযুক্ত হইতে হইবে।

চতুর্থ। এইরূপ কর্ণে ব্যাপৃত থাকার সময় কোন কর্ণের
কিরূপ ফল ফলে তাহা সবিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবে।

পঞ্চম। এই সুন্দর গঠন কার্যে ব্যাপৃত হইয়া অল্প দিনের
মধ্যেই যে উদ্দেশ্য সফল হইবে এরূপ প্রত্যাশা করিও না। যদি
ও এই এক-জন্মে তোমার উদ্দেশ্য সফল না হয়, এই সুন্দর
গঠন কার্যে তোমার চিত্ত যে উন্নত হইয়া প্রাপ্ত হইবে পরজন্মে সেই
উন্নত চিত্ত লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেজন্মে তোমার উদ্দেশ্য
সফল হওয়া সুকর হইয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ। যদি তোমার মনের মানুষ্য গড়িয়া লইতে সক্ষম হও তবে
তাহার সুখ দুঃখে নিজের সুখ দুঃখ মিলাইয়া নিজের অহংজ্ঞান
যুটাইতে শিখিবে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে তোমার ভালবাসার
শিক্ষা সমাপ্ত হইল।

সপ্তম। তাহার পর যেমন একজনকে সুন্দর করিয়াছ, সেইরূপ
এই সমস্ত পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার আধার বুঝিয়া মনুষ্য
সমষ্টিকে সুন্দর ও উন্নত করিতে যত্নবান হইবে। যিনি এইরূপ কার্যে
ব্রতী ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে আবিস্কৃত হইবে।

৮। কি উপায় অবলম্বনে চিন্তে সাম্বিকভাবে আধিক্য জন্মে
সে বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করি মনে করুন একজন রূপের
সৌন্দর্য্যপ্রার্থী, যেখানে তিনি সেই রূপের সৌন্দর্য্য দেখেন তাঁহার
ভালবাসা সেইখানেই গিয়া পড়ে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে
রূপভূক্তা দূর হইয়া অন্তরে সাম্বিকভাবে আধিক্য জন্মিতে পারে ?

শি। সুন্দরকে ভালবাসা আর সৌন্দর্য্যভূক্তা এ দুটি কথার
বড় প্রভেদ সেটি স্মরণ রাখিও। ধাঁহার রূপ ভূক্তা প্রবল তিনি
রূপ উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু যিনি স্বার্থ সুন্দর

রূপ' ভালবাসেন তিনি সেই সৌন্দর্য্যগ্রাহী হইয়াও রূপ উপভোগের কামনা করেন না। উপভোগে স্নানরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃতি সৌন্দর্য্যগ্রাহী স্নানরের সৌন্দর্য্য বাহাতে চিরস্থায়ী করা বাটতে পারে তিনি সেই বিষয়ে সচেতন থাকেন।

“সোনার বিগ্রহ করি পূজ একদিন
সেওরে পরশদোষে হররে মলিন।”

হেমচন্দ্র।

উপভোগে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় সুতরাং যিনি বর্ষারূপের সৌন্দর্য্য ভাল বাসেন তিনি কখনও সেইরূপ উপভোগ করিতে রূপবান বা রূপবতীর রূপ নষ্ট করিতে চান না। যিনি রূপতৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি যেন রূপ রস ভাল বাসিতে শিখেন। যিনি রূপ তৃষ্ণা দূর করিতে চান তিনি রূপবান বা রূপবতীকে রূপের আভার উজ্জলতর করিতে যত্নবান হউন, যেখানে কেবল রূপের সৌন্দর্য্য আছে সেইখানে বাহাতে গুণের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। মুখকান্তি অধিকতর দীপ্তিশালী হইতে পারে সেই বিষয়ে সচেতন থাকুন এবং এইরূপ কর্শেই তৃপ্তি লাভ করিতে শিখুন তবেই তাঁহার রূপ ভোগ তৃষ্ণা ক্রমেই কমিয়া যাইবে।

চেতন জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত পুরুষ ও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক না বুঝিয়া পুরুষ, স্ত্রী উপভোগের জন্য তৃষ্ণাতুর হইয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা হইতে পৃথিবীতে ঘেব, ঈর্ষা, ক্রোধ বিবাদ বিসম্বাদ প্রকৃতি বস্তু কিছু অসুখের কারণ জন্মিয়াছে। পুরুষ যবে স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক যবে পুরুষকে বর্ষার ভালবাসিবে সেই দিন এই পৃথিবী রম্যস্থান হইয়া উঠিবে। যে পুরুষ স্ত্রীকে উন্নত করিতে

পারিলেই আপনাকে সুখী' জ্ঞান করেন তিনিই বখাৰ্হ জীকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন । কিন্তু জীলোককে উন্নত করিবার প্রতিপ্রেরণা, অস্তরে কখনও স্থান পায় না অথচ তিনি জীসক কামনা করেন তিনি কায়ুক, তাঁহার ভালবাসা এবং ব্যাঘ্রের হরিণ শিক্তকে ভালবাসা অনেকটা এক রকম ।

মাহুঘ নিজে আপনার মুখ দেখিতে পার না, সেই জন্য নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন হয়, মাহুঘ তাহার নিজের মন সুন্দর কি কুৎসিৎ সেইটাই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু সেটি না বুঝিয়া ও স্থির থাকিতে পারে না ; যত দিন সেইটি বুঝিতে না পারে ততদিন একখানি দর্পণের প্রয়োজন হয় । জী চিত্ত পুরুষের চিত্ত জীর পক্ষে সেই দর্পণ ।

দর্পণ নির্মল না হইলে তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সত্যের অনুরূপ হয় না, যে চিত্তে একেবারে কপটতা নাই তাহাই নির্মল কিন্তু এরূপ নির্মল দর্পণ সহজে খুঁজিয়া মেলে না । হীরক সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য রত্ন যখন মাটির তিতর থাকে তখন তাহারা সমল থাকে, পরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাহাকে বা আশুপে পুডাইয়া নির্মল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ পুরুষরত্ন বা জীরত্ন হৃদয়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে উহাদিগকে ঘসিয়া, মাজিয়া প্রয়োজনমতে আশুপে পুডাইয়া নির্মল করিয়া লইতে হয় ।

সমল চিত্তকে নির্মল করিবার কুৎসিৎকে সুন্দর করিবার আগ্রহকে প্রেম প্রণয় ভালবাসা ভক্তি বা মেহ নাম দেওয়া যায় । সমলকে নির্মল করিবার প্রতিপ্রেরণা যদি না থাকে তবে পুরুষ ও জীর পরস্পর যে সঙ্গ লাগনা তাহাকে ভালবাসা বলিতে চাই না ।

ভালবাসাও তিন প্রকার,—ভক্তিভাব, প্রেমভাব, মেহভাব।
 যিনি আমাকে উন্নত করিতে পারিলেই আনন্দিত হন তাঁহার প্রতি
 আমার যে ভাব তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি নিবন্ধন ভক্ত
 ভক্তির পাত্রের আত্মাহুতপালনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।
 সম্পাদ্র বুকিয়া বাহাকে উন্নত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি
 তাহার প্রতি আমার যে ভাব তাঁহার তাহার নাম মেহ। বেখানে
 পরস্পর পরস্পরকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট সেইখানকার ভাবের
 নাম প্রেম।

ভক্তির পাত্র ভক্তি, মেহের পাত্র মেহ এবং প্রেমের পাত্র
 প্রেম লাভ করিয়া আনন্দের উদ্দেশ্যে সতত অগ্রসর হইতে শিখ।

উপসংহার

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে উপরের লিখিত প্রবন্ধটি ‘প্রচার’ পত্রিকায়
 প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ভালবাসা সম্বন্ধে বাহা বুঝিয়াছিলাম
 তাহাই লিখিয়াছিলাম; এখন আমার চৌদ্দ বৎসর পরে ভালবাসা
 সম্বন্ধে বাহা বুঝিয়াছি তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতে চাই। এখন
 বুঝি যে ভালবাসাই আত্মশক্তি, এই ভালবাসাই কর্মের প্রবোধিকা-
 শক্তি। অগতে বড় কিছু তিন্ন তিন্ন শক্তি আছে সবই এই এক
 ভালবাসা শক্তির রূপান্তর মাত্র। অগতে অচেতন পদার্থ কিছুই নাই,
 এক চিন্ময়ের সীমা নিবন্ধন অনন্তের প্রত্যেক অণু পর্যন্ত সজীব পদার্থ।

পৃথিবী সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রকে আয়ত্তা এখন জড় পদার্থ বুদ্ধি, কিন্তু জানী বোঙ্গীগণ দেখেন যে উহার সকলেই এক একটি সজীব দেহ ; সকলেরই এক একজন চেতন অধিষ্ঠাতা আছেন । আমি যেমন আমার দেহের সহিত স্ব স্বামীভাবে যুক্ত অর্থাৎ আমার এট দেহের সহিত ‘মমত্ব’ সম্বন্ধে যুক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক দেহেরই অধিষ্ঠাতা দেহী এক একজন আছেন । সুতরাং অচেতন পদার্থ জগতে নাই । সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া, নদী সমুদ্রে মিলিতে যায় ভালবাসে বলিয়া, অগ্নিজন্মের অণু হাইড্রোজনের অণু মিলিয়া জল হইয়া থাকে উহাদের মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া । তোমরা যদি বেশ মন দিয়া কান পেতে বিধের সঙ্গীত শুন, তবে শুনিতে পাইবে বিশ্ব গাইতেছেন “আমার স্বভাব এই ভালবাসা বই আর জানি না” । স্বভাব অর্থে প্রকৃতি । ভালবাসাই জগজ্জননীর স্বরূপ । বিধের এই ভালবাসা স্বভাব যিনি বুঝিয়াছেন যিনি এই আত্মশক্তির রহস্য বুঝিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভালবাসা কি তাহাই বুঝিয়াছেন, আর সকলেই কাম্য । বিধের এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসা যিনি রূপে অনুভব করিতে পারেন তিনি বুঝেন যে এই আত্মশক্তিই পূর্ণা, ইনিই পরাপ্রীতি স্বরূপিনী ভক্তি, অথ বা কিছু শক্তি সমস্তই ইহারই অংশ মাত্র, সেইজন্য তাহার সমস্ত অপূর্ণা । এই বিশ্বব্যাপী ভালবাসাকে যিনি নিজের ভালবাসা বলিয়া বুঝেন তাহার ভালবাসাই নিছাম, আর সকলের ভালবাসাই স্কায । “তারা আমার নিরাকার” । বাহার সীমা আছে তাহাই স্কায, বাহা কোন সীমাবদ্ধ নহে তাহাই নিরাকার । এই আত্মশক্তি ভালবাসার কোন সীমা নাট, ইহা অসীম ও অনন্ত । বাহার ভালবাসার সীমা নাই, বাহার ভালবাসা কোন সীমাবদ্ধ নহে, তিনিই

আত্মশক্তিকে জানিয়াছেন, তিনিই ভক্ত ও তিনিই মুক্ত । বাঁহাৱ ভালবাসা সীমাৱ বদ্ধ তিনিই বদ্ধ জীব, এই বদ্ধজীবের ভালবাসাই কাৰ্য । বাঁহাৱ ভালবাসাৱ সীমা মুছিয়া গিয়াছে, যিনি অসীম ভালবাসাকে হৃদয়ে ধৰিয়া আছেন তিনিই মুক্তপুৰুষ, তিনিই আত্মশক্তিকে হৃদয়ে ধৰিয়া শিবত্ব পাইয়াছেন । এইবাৱে প্রেম ও কাৰ্যের পাৰ্থক্য আমৱা বুঝিতে পাৰি, শিবের ভালবাসা অৰ্বাৎ শিবের হৃদয়ের শক্তিই ভালবাসা এবং বদ্ধজীবের সসীম ভালবাসাই কাৰ্য ।

এখন জিজ্ঞাস্ত এট বে এট কাৰ্যকে কিৰূপে জগ কৰিতে হইবে । জীবের হৃদয়ের শক্তি শিবের হৃদয়ের শক্তিৰ সহিত মিলানট কাৰ্যজয়ের একমাত্র পথ, ইহাৱট নাম সাধনা ।

শিবহৃদয়বাসিনী জগজ্জননী মা তোমাকে নমস্কাৰ ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

সতীতেজ ।

হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী স্তম্ভরী সতীত্বের আদর্শ ; এই আদর্শ সম্বন্ধে রাধারা হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্মই বল আর কষ্টই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকেব সব । অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্ত সাবিত্রী স্তম্ভরী মৃত স্বামীকে অন্ধ স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঘমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে ঝাঁকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আশ্রুত হয় ।

“লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সমাগরা পৃথিবীতে ধারণ করিতেছেন ।” মহাত্ম্যরূপে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে । বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায় । সমাজের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে । রামায়ণ এবং মহাত্ম্যরূপের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জল বর্ণে বিচিত্র করা আছে । পাপাত্মা দুঃশাসন কর্তৃক অপমানিত সতী দ্রৌপদীর ক্রোধান্বিত প্রেচ্ছলিত হইয়া পাপনিরত দুর্ব্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু মহাত্ম্যরূপে বর্ণালোচনার সার, মহা

পরাজাত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর বর্ণ সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদর নাই সেইখানেই নানারূপ অধর্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননার অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুভ নিশুভ নব বেক্রপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে, যেদিন পাপিষ্ঠরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্ভত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌলা সতীর উপর অত্যাচাৰ আরম্ভ করেন সেইদিন হইতেই মুসলমান রাজত্ব বাঙ্গালা হইতে, ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

বাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, বাঁহারা সতীর অবমাননার আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় কাবরা থাকে। বাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ধুঁকেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ বাহাতে দেশে পুনরাভির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেতন থাকেন, আমাদের দেশে আজ কাল কার সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমনীগণের সতীতেজ নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছে, হেঁসরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শব্দ তবেই স্বতীতেজে তোমাংদের রমনীগণ উজ্জল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে,

তবেই ধর্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিবে বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পাশ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

সাবিত্রী একটি আদর্শ। এইরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গভিরা লগরার নামই দেব আরাধনা। আদর্শ চিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কণ্ঠে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর “তৎস্বমসি” বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ত্তে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ধরে আবির্ভূতা হইবেন।

“তৎ স্বম্ অসি” অর্থাৎ তুমিই সেই, এট, কথাটি ভালবাসা শিকার মূল মন্ত্র বলিয়া বুক। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় স্নানর বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা স্তম্ভ করিতে শিখার নাম ভালবাসা শিকা। কর্মমূর্ত্ত্রে বাহার সহিত বন্ধ থাকার বাহাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সন্তানী সতীভেদে ভেদ-স্থিনী করিয়া লগরায় তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম। “তৎস্বমসি” অর্থাৎ “তুমিই সেই সাবিত্রী” সহবস্ত্রিনীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তি-ভাবে স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। বাহার সঙ্গে একত্রে থাকা ধরে

তাঁহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া গাড়ার, তাঁহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া গাড়ার ।

তোমার সহধর্ম্মীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে দিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অঙ্কুরপ হইয়া উঠিবে । যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার ফলাফল নাই বুদ্ধিও । তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থার বৈরূপ ভালবাসা মাথা কধা করিতে, বৈরূপ ভালবাসা মাথা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থার সেইরূপ কথাবার্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসাব গুণেও তোমার কথাবার্তার গুণে বৃদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিনী তোমাতে একরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকেই সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে ।

এখন একটা কথা আছে । বাহাকে মন্দ বলিয়া বুদ্ধিতেছি তাঁহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্তা কহাটা কপটাচার কি না ? যেখানে সত্য সেইখানে ধর্ম্ম, যেখানে মিথ্যা সেইখানে অধর্ম্ম । সুতরাং যদি মন্দকে ভাল ভাবা মিথ্যা হয়, তবে সেরূপ কাজে অধর্ম্ম আছে । ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভালবাসা কখনই কর্তব্য নহে মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুদ্ধিতে হইবে ; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয় । মানুষে বধন বাহা মন্দ দেখিতে পাই তাঁহা মলা মাত্র, সেই মলা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায় । তুমি বাহাকে মন্দ বলিয়া বুদ্ধিতেছ ঐতিহাসিক সেই মানুষ বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে

তাহার মলা ধোঁত করিয়া হইলেই দেখিতে পাটবে যে ভিতরকার বাহুব বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা কিছুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা কিছুকেরও আদর বুঝেন। বাহুবের বাহিরে মলা দেখিয়াই বাহুবকে ঘৃণা করিও না, পাগকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাত্মারতে এইরূপ কথা আছে যে ত্রীলোক যাহেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষ যাহেই অনঙ্গ—বিজয়ী উর্জল মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম বুঝিয়া ‘তত্ত্বমসি’ মহামন্ত্র সাধনা করিতে শিখ। তাহা হইলেই ভালবাসার সাহায্য বৃদ্ধিতে পারিবে।

ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবতা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে ত্রী সতী সেইখানে স্বামী সত্যবান হইতে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান সেইখানে ত্রী সতীভেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি ত্রীকে সতীভেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্রে গঠন করিতে সচাই সচেতন থাকেন। ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের বলে শিষ্যা ত্রীকে উন্নত করিতে হইবে এবং ‘সোহমং’ অর্থাৎ “সেই আদর্শ পুরুষই আমি” এই ভাবিয়া নিজের ক্ষমতাকরণকে সেই আদর্শ পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের তাব সমূহ বধাবৎ প্রকাশ করিতে আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার চিন্তা করঙ্গও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্বতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের তাব অকপটে বধাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই স্বার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই ত্রীর জ্বরে সতীত্ব বর্ণ প্রকাশ পায়; স্বামী

সত্যের সাহায্যে এই বিধান উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সত্যের এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। বেদানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্মতাব সকল সেই ক্ষেত্রে আপনাপনি ছুটিতে থাকে। অর্দ্ধনারীখর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাক্ষতাপিনী পার্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত ঋষ্যপুত্র হুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্মতাব ছুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাত্মারতের নিকট ধর্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সত্য কাহাকে বলে ? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত ; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সত্য সত্যে এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। ‘সত্য-বাক্য’ কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে, বাহ্য যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্বে সত্য কথাটির যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেটী বুঝ্য অর্থ হইতেই ‘সত্য’ কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ পাড়াইয়াছে। আমি বাহ্য যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি অন্তরে তাহা না বলিয়া যদি অন্তরঙ্গ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা পূর্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেন না সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা যত কার্য না করি তখন সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না, কেন না কর্ম ও কর্ম-ফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও একদিন না একদিন ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে, সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে, তবেই ক্রমশঃ স্মৃতির হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কথা কহিতে দোষ কি ? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইবে, তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি ? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই—

সত্য কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়, চিন্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই, যে অসত্য ব্যবহার যেন আসিলেই বেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বাহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইয়াছে তান ছোট খাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মাজন তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য হইতে তাঁহাকে প্রতি নিবৃত্ত করে। সুতরাং ‘সত্য’ এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সত্য তাহারই দিকে আগ্রহ হইতে শিখা কর্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ পায় সেই আলোকটির নাম সৎ। এই আলোক বহাৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টা

নাথ সত্য্যচাঁদ। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের জ্ঞানিক সত্য। এটি সত্যের ভাবকে সত্য বলে।

যিনি সামান্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সত্য বা সত্য কাহাবও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। তিনি যাহুবেব ভিতর-কাব ছিন্ন সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগেব ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাকল্য উপস্থিত হয় সেই চাকল্য নিবন্ধন প্রেরিত সৌন্দর্য্য কি তাহা যাহুবে বুঝিতে পারে না, বাহ্যিক অনুলব বিষয়ে আকৃষ্ট হয় হয়, পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ব'ও স্বামীকে চিনিতে পারে না তম গুণ না থাকিলে কেহই সত্য বা সত্যবান হহতে সক্ষম হন না। হরপার্কতীব মিলমেব পুঙ্কে মদন ভয়ীকৃত হইয়াছিল, পাকতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্যবর চাই না, তিনি সেই কামনার যোবতর তপস্যা নিযুক্ত হইয়া তপ' প্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবশীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সত্য ও সত্য স্বর্গে আমাদের বাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই বলা হইল না। সত্য ও সত্য এই দুটি কথা আদব যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই ত্রিবৃদ্ধি। এই সত্যটি এত গভীর বলিবা বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা বেন নাই। এস তাই সব আশ্রা লোক মাতা সত্য জীপকে নমস্কার কবিত্তে করিতে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' সেই পরম পুরুষেব দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে দিবি।'

উপসংহার।

উপরের লিখিত প্রবন্ধটি প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে প্রচার পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ লেখাটি আমার বটে কিন্তু প্রবন্ধটির অবিকার

কথা সতীভেদে দীপ্তা কোন রমণীর । পতিব্রতা সেই সতী সতীভেদে
সম্বন্ধে ইহাও বিধাইয়া গিয়াছেন যে সতী স্ত্রী তাঁহার স্বামীর মধ্যে
নীলাবর্ণের একটি আঙুল দেখিতে পান । সতীর কোষ হইলে এই
অগ্নি ঘোর কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সতী যখন ভালবাসা বিতরণ
করেন তখন এট অগ্নি স্তম্ভস্বরূপ ধারণ করেন এবং যখন সতী
জ্ঞান দান করেন তখন ইহা স্তম্ভ কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন । জ্ঞান-
দায়িনী কালীর দুই হাতে বাঁশী এক হাতে মুণ্ড এক হাতে অসি । আর
যেনী কোন কথা এখন লিখিতে পারিলাম না ।

নমো সতীস্বরায় ।

—•••—

সম্পূর্ণ ।

উপনিষৎ ।

সম্পাদক পণ্ডিত ঐযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অঙ্কিত ।

—৫০৫—

১০৮ বামি উপনিষৎ প্রকাশিত হইতেছে । অগ্রিম ১ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক হউন । প্রতি মাসে যে কর্ম প্রকাশিত হইতেছে গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৫ তিন পয়সা কর্ম হিসাবে সর্বত্র বিঃ, পিঃ, তে পাঠাইতেছি ।

— — —

বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের—

স্বামী রামানুজাচার্য্য কৃত ভিত্ত্য প্রকাশিত হইতেছে
সম্পাদক ঐযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অঙ্কিত
বয়েল ৮ পেজী সুন্দর কাগজে ছাপা হইতেছে

১০৮ ভাগ ও আনন্দপির ১০৮ টাকা সহ

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত ঐযুক্ত প্রমথ নাথ কর্তৃক অঙ্কিত ।

— — —

লোটাস লাইব্রেরী ।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

